~ www.amarboi.com ~

ঘুমের দরজা ঠেলে

চিন্ময় গুহ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিন্ময় গুহ-র জন্ম ১৯৫৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায়। প্রাবন্ধিক, ফরাসিবিদ ও অনুবাদক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। ফরাসি শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রক তাঁকে আলাদাভাবে দু'বার 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন ২০১০ এবং ২০১৩ সালে।

শিক্ষা জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পিএইচ ডি। দিল্লির ফরাসি দূতাবাসের প্রাক্তন প্রকাশনা-উপদেষ্টা। 'দেশ' পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন এক দশক। গবেষণা করেছেন প্যারিস, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে। বক্তৃতা ও সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন সরবন, অক্সফোর্ড, এডিনবরা সহ নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর ফরাসির ভক্ত স্বয়ং দেরিদা।

চারটি ভাষায় কুড়িটির বেশি বই। শখ: ফরাসি অভিধান পড়া, প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানো।

.....

প্রচ্ছদ দেবাশিস সাহা
লেখকের আলোকচিত্র অরিন্দম ঘোষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঘুমের দরজা ঠেলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘুমের দরজা ঠেলে

চিন্ময় গুহ

সিগনেট প্রেস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১৬
তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৮

© চিন্ময় গুহ

একটি আনন্দ প্রকাশনা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-686-1

সিগনেট প্রেস
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

GHUMER DARJA THELE
[Essay]
by
Chinmoy Guha

Signet Press
Published by
Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘুমের দেশে

জ্যোতিভূষণ চাকীকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

'ঘুমের দরজা ঠেলে' নামটি এসেছে আমার প্রিয় কবি অরুণ মিত্রের একটি অসাধারণ কবিতার শিরোনাম থেকে ('ঘনিষ্ঠ তাপ', ১৯৬৩), যা তানপুরার মতো এই অন্য ধরনের রচনাগুলির মূল সুর বেঁধে দিয়েছে। দর্শন আর সাহিত্যের সমুদ্রবেলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি এক জলকল্লোলকে ছুঁতে চেয়েছি যা কবিতার মতো গদ্যের শরীরে মিশে গেছে। সেদিক থেকে এগুলিকে পরীক্ষামূলক গদ্য বলা যায়।

এই গদ্যাংশগুলি রচিত হয়েছিল 'রোববার' পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১৬-র ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রায় একটা ঘোরের ভেতর।

প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ, নবনীতা দেবসেন, পবিত্র সরকার, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, জয় গোস্বামী, মনসিজ মজুমদার, কুণাল বসু, শ্রীজাত, বিশ্বজ্যোতি দাশগুপ্ত, শিলাদিত্য সেন, গৌতম মিত্র, বিলাস চট্টোপাধ্যায়, হিমালয় জানা, অরিত্র সান্যাল, সায়ন দাশ, সাত্যকি পাল, গৌতম চক্রবর্তী, মুকুন্দ গায়েন, হিমাংশু দাস ও প্রয়াত বাদল বসু। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের কয়েকজন দেবোপম ছাত্রছাত্রী, রাজর্ষি গুপ্ত, পৌলোমী মণ্ডল, পুষ্পেন সাহা, বিশেষত অরিন্দম ঘোষ ও শরণ্য দত্ত, যে দুজন আমায় প্রযুক্তিগত সাহায্য করেছেন এবং বইয়ের নির্দেশিকা নির্মাণ করে দিয়েছেন। আমার অন্যান্য রচনার মতো এগুলিরও প্রথম পাঠক আমার স্ত্রী অনসূয়া।

আমার বিশেষ ঋণ প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষ এবং অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও ভাস্কর লেটের কাছে, যাঁদের ছাড়া এই লেখাগুলির জন্ম হত না।

১ মার্চ ২০১৬ **চিন্ময় গুহ**

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১

এক অনন্ত নক্ষত্রবীথির সামনে আমি দাঁড়িয়ে। শূন্যে কালপুরুষের তরবারি। নীচে স্বেদ, রক্ত, শব্দগুঁড়ো, ভাসমান কাগজের স্তূপ। আর পাসকাল-বর্ণিত ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য।

আমি নিচু হয়ে হাতড়ে-হাতড়ে চেনা অক্ষর খুঁজি। শব্দের শরীর এত ভাস্কর্যময় তা কি আমি জানতাম? তার নীল দ্যুতি কি আমার করোটি ভেদ করে চলে যাবে?

কয়েকটি কাগজে শিশির পড়েছে। সেগুলো হাতে নিয়ে ঘুমের দরজা ঠেলে আমি আবার ফিরে আসি আমার ছোট ঘরের ছায়ান্ধকার নড়বড়ে টেবিলে।

জানলা খোলা। শব্দের ফিসফিসানি।

একটা বইয়ের নাম 'খোলো' (Ouvrez), অন্যগুলোর নাম 'রাবার', 'হাওয়া', 'যন্ত্রণা' 'বাইরে' 'ট্রানজিট এ ট্রানজিট বি', 'আয়না যা ফিরে ফিরে আসে'

এরা কী বলছে? কারা লিখেছে এসব ফরাসি বই?

সাদা মলাট, তার ওপর একটি নীল তারা। প্রথম দফায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে। প্রকাশক প্যারিসের 'মধ্যরাতের প্রকাশনা', Editions de minuit (মধ্যরাত! এমনও নাম হয়?)।

বারান্দায় খালি ডেকচেয়ার, দোকানের ক্যাটালগ, অসম্পূর্ণ এক চলচ্চিত্রের অংশ। কোনও এক রাষ্ট্রনেতার বক্তৃতা, গাড়ির রং, আইসক্রিমের সুগন্ধ। একজন গোয়েন্দা একটি খুনের মামলায় এক খুনিকে খুঁজছে, কিন্তু সম্ভবত কোনও খুনই হয়নি। একটি ট্রেন একজন মানুষকে নিয়ে চলে যায় যে ফিরতি ট্রেনে বদলে যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান অবরোধের অপমান পুড়িয়ে দিয়েছিল ফ্রান্সের মুখ। উত্তেজিত চল্লিশের দশকের সেই অগ্নিদাহ থেকে বেরিয়ে পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে শিল্পসাহিত্যের ভাষাকে আমূল বদলানোর দরকার বোধ করেছিলেন মঞ্চ, চলচ্চিত্র আর কথাশিল্পের কেউ-কেউ। চুরমার বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথনকে ছিঁড়েখুঁড়ে এ এক নতুন আত্মানুসন্ধান। ফরাসি থিয়েটারে এল নতুন এক ভাষা, যাকে আমরা ঠিক বা ভুল ভাবে অ্যাবসার্ড থিয়েটার বলে জানি, যার পুরোধা এক আইরিশ, যাঁর নাম স্যামুয়েল বেকেট আর এক আধা-রুমানীয়, যাঁর নাম য়্যজেন ইওনেস্কো। কয়েক বছরের মধ্যেই ওই দশকের শেষে হুড়মুড় করে আসবে মেদিনী-কাঁপানো 'নতুন ঢেউ' চলচ্চিত্র... গদার, ত্রুফো, রেনে, রোমের, শাবরল। কিন্তু চলচ্চিত্র যেমন বিদ্যুৎগতিতে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে পারে, এমনকী নাটক, উপন্যাস কি তা পারে? বাইরের পৃথিবী তেমন করে জানল না ফরাসি 'নুভো রমাঁ', বা নতুন উপন্যাসকে। পর্ব ও পর্বাঙ্গে বিভক্ত জটিল অনুপুঙ্খময় বাক্যজালে তৈরি 'দুর্বোধ্য' রচনাগুলোর অধিকাংশ রয়ে গেল অনুবাদের আয়ত্তের বাইরে।

যে-বছর ৩ জানুয়ারি বেকেটের ফরাসি নাটক 'গোদোর অপেক্ষায়' মঞ্চায়িত হল প্যারিসে, সেই ১৯৫৩-তেই প্রকাশিত হয়েছিল আল্যাঁ রব-গ্রিয়ে'র 'রাবার' আর নাতালি সারোৎ-এর 'মারত্যরো'। ১৯৫৮ সালের ভিতর একে-একে প্রকাশিত হল মিশেল ব্যুতর-এর 'মিলান থেকে যাত্রা', রব-গ্রিয়ে'র 'ঈর্ষা', ব্যুতর-এর 'পরিবর্তন', ক্লোদ সিমঁ-র 'হাওয়া', মার্গ্যরিৎ দ্যুরাস-এর 'তার্কিনিয়ার ছোট ছোট ঘোড়াগুলি'...। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হল নাতালি সারোৎ আর রব-গ্রিয়ে'র লেখা নতুন সাহিত্যতত্ত্ব 'অবিশ্বাসের যুগ' আর 'নতুন উপন্যাসের সপক্ষে'।

সার্ত্র-কাম্যু'রা প্রবলভাবে জীবনসংকটের নৈতিক-রাজনৈতিক সমাধান খুঁজেছিলেন। প্রতিবাদ হিসেবে এঁরা চাইলেন শিল্পের সত্যকে ছুঁতে। যদিও 'শিল্প' কথাটাকে এঁরা কম ঘৃণা করতেন না। দার্শনিক সমস্যার চেয়ে এঁদের কাছে জরুরি হয়ে উঠল সাহিত্যের সমস্যা। রলাঁ বার্ত একে বললেন, 'La littérature objectale ou littéraire', বস্তুসাহিত্য, সাহিত্যিক সাহিত্য। রব-গ্রিয়ে'র ভাষায়, 'J'écris parce que je veux savoir pourquoi j'écris' ('আমি লিখি কারণ আমি জানতে চাই কেন আমি লিখি')। বিশিষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমালোচক গায়েতাঁ পিকঁ-এর ভাষায়, 'C'est le moment des auteurs'—এ হল লেখকের সময়।

কথাশিল্প আর পাঠকের শ্বাসরোধ করে রাখবে না কাহিনির অজুহাত দিয়ে, নাতালি সারোৎ লিখলেন 'অবিশ্বাসের যুগ' বইতে। আর জীবনের আয়নায় দেখা চরিত্রে ঠাসা হবে না সাহিত্য, থাকবে না প্রাকৃতিক বা সামাজিক ক্লিশে অথবা হৃদয়ের নতুন কোনও বিশ্লেষণের ভান। বিধৃত হবে না কোনও ধারাবাহিক চরিত্র, যার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখতে চাইব আমরা, থাকবে না ধারাবাহিক সময়। থাকবে শুধু 'des éclats discontinus, brouillés' (বিচ্ছিন্ন কয়েকটি এলোমেলো ঝলক)। এক সংঘবদ্ধ ঐকান্তিক চেষ্টা হল উপন্যাস থেকে কাঠামোর কঙ্কালটিকে (প্লট, চরিত্র, মানে) বের করে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার, যাতে কিছুই না বাকি থাকে শুধু রক্তমাংস ছাড়া।

বিন্যাসের ফ্রেমওয়ার্ক-টি মুছে গিয়েছে, রচনাটি হয়ে উঠছে বিমূর্ত এক ছবি। এ এক চরমপন্থা, যাকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করতে চাইলেন তাঁরা। উপন্যাস হয়ে উঠতে চাইল inaugural writing, লিখনের সূচনাবিন্দু। যা বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ, তা বোধগম্য নয়। এই বিচ্ছিন্নতা, সময় ঘটনাক্রম ও বিবেককে টুকরো-টুকরো করে ফেলা... যেন ক্লাসিকাল ফিজ়িক্স-কে মুছে ফেলতে চাইছে মলিকিউলার ফিজ়িক্স।

উপন্যাস এতদিন পৃথিবীর কথা বলেছে, পৃথিবী এবার উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে কথা বলবে, লিখলেন রব-গ্রিয়ে। টেক্সট যেন নিজের মধ্যে মোমবাতির মতো নিবদ্ধ ও সমাহিত হয়ে আছে। পৃথিবীতে যা ঘটে গিয়েছে তার বিচার করার জন্য লেখক আসেননি, কারণ Work in progress— কাজ চলছে, আমরা এক প্ল্যাকার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে। লিখন যেন লিখনের বিবৃতিকার— Le livre s'écrit...। প্রুস্ত, জয়েস, ফক্‌নার-এর থেকে আলাদা, কারণ তাঁরা কেউ ঠিক এত দূর যেতে চাননি। এ যেন সাদা পৃষ্ঠায় ছোঁয়া স্পর্শাতীত এক বাস্তব— authenticité insaisissable— যা ছড়িয়ে আছে লিখনের খাঁজে-খাঁজে। অর্থকে বাদ দেওয়া হয়নি, তাকে এক যন্ত্রণাক্ত শূন্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনির্দিষ্ট, অনামা এক বস্তু— যেমন রক্ত— পর্যন্ত পৌঁছতে চাইছে অক্ষর, এ যেন অব্যক্তের সঙ্গে কথার সাঁকো। যে-কথা বলা হয়ে গিয়েছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকে অতিক্রম করে, সংলাপের সেতুর নীচের জলপাতালের ঢেউ ভেঙে অবলুপ্তির দিকে যাওয়া। মৃত্যু আর জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ কি তবে এক বিকল্প প্রার্থনা? রব-গ্রিয়ে'র ভাষায়, 'তাৎপর্যময় বা উদ্ভট কোনওটাই নয়, পৃথিবী এখন পৃথিবী।' নতুন ফরাসি উপন্যাস যেন বলতে চায়, সে ওখানে আছে, **ওখানে** (Etre-là)— শূককীটের মতো।

এ কি তবে, যেমন মার্সেল রেমঁ মনে করেন, উপন্যাসের সমাপ্তি— the end of the novel? সার্ত্র নিজে— আগেই বলেছি, যাঁর দার্শনিক/ রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে এই 'নুভো রমাঁ'-র আন্দোলন— নাতালি সারোৎ-এর 'অজানার প্রতিচ্ছবি' উপন্যাসের ভূমিকায় সেটিকে anti-roman (anti-novel) বলে অভিহিত করেন। প্রুস্ত, জয়েস বা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর চৈতন্যপ্রবাহী উপন্যাসের চরিত্রগুলো আমাদের চেনা ছিল, এঁদের চরিত্রগুলো নয়। বরঞ্চ কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, যুদ্ধের আগে ১৯৩৮ সালে সার্ত্র-র লেখা প্রথম উপন্যাস 'বিবমিষা' (Nausea) থেকে কি এঁদের জন্ম? যাকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর অভিজ্ঞতা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন এঁরা? নতুন ঔপন্যাসিকরা অবশ্য একথা অস্বীকার করবেন। সার্ত্র তাঁর বইয়ের ভূমিকা লিখলেও, নাতালি সারোৎ ও তাঁর সতীর্থরা তাত্ত্বিক আলোচনার সময় সার্ত্র-এর নাম করেননি।

এক ছেঁড়া পুরনো ছবির রিল, যার বাকিটা হারিয়ে গিয়েছে, তাকে নিয়ে ক্লোদ সিমঁ-র (১৯৮৫ সালে নোবেল পুরস্কার পান) উপন্যাস 'গল্প'। তাঁর বাক্যগুলো যতিহীন ও দীর্ঘ, কারণ পুরো বাক্যটি অধরা। রব-গ্রিয়ে'র বিখ্যাত উপন্যাস 'ভোয়াইয়র'-এ এক ভ্রাম্যমাণ ঘড়িবিক্রেতা তার বাল্যকালের দ্বীপে ফিরে আসে একটি মৃত্যুরহস্যকে অনুধাবন করার জন্য। সমুদ্রপাথরে আবিষ্কৃত হয় এক তরুণীর শব। তার সঙ্গে ছেলেটির সম্পর্ক কী? সে কি খুনি, না খুনের স্বপ্ন দেখছে? খুন কি হয়েছিল কেউ? রব-গ্রিয়ে'র 'গোলকধাঁধার মধ্যে' উপন্যাসে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা একজন সৈনিক কাউকে খুঁজছে। তাকে কিছু দিতে চায় সে? কী দিতে চায়?

'ঈর্ষা' উপন্যাসে কথক নেই, অথবা আছে। একটি লোক নীরবে লক্ষ করে তার স্ত্রীর সঙ্গে (যার নাম 'ক') ফ্রাঁক নামে এক প্রতিবেশীর সম্পর্ক। কথকের নিঃশব্দ উপস্থিতি টের পাওয়া যায় নৈশভোজের টেবিলে অথবা বারান্দায় রাখা ডেকচেয়ারে। লোকটি যা দেখছে এবং যা ভাবছে, তার জট খোলা যায় না। উপন্যাস জুড়ে শূন্যে মাথা খোঁড়ে অদ্ভুত এক রিক্ততা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অব্যক্তের ছবি আঁকতে গিয়ে সামাজিক কথোপকথন থেকে নিঃসৃত 'অসংখ্য ছোট অপরাধের' কথা লিখেছেন নাতালি সারোৎ। মধ্যবিত্ত সমাজের ভদ্রতার মুখোশের নীচে এই সব ছোট-ছোট হত্যাকাণ্ড ঘটে যেতে থাকে।

১৯৬১ সালে নতুন উপন্যাসকে ছবিতে সম্প্রসারিত করার ইচ্ছেয় আল্যাঁ রেনে-র 'মারিয়াঁবাদে গত বছর' ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন রব-গ্রিয়ে। পরে তিনি নিজে বেশ কয়েকটি ছবি করেন: 'ট্রান্স-ইউরোপিয়ান এক্সপ্রেস', 'ইডেন এবং তারপর', 'আনন্দের ধীর পিচ্ছিলতা'...। মার্গ্যরিৎ দ্যুরাস লেখেন রেনে-র 'হিরোশিমা আমার প্রেম' ছবির চিত্রভাষা। করেন 'ইন্ডিয়া সং'-এর মতো ছবি।

বিজ্ঞাপন, বন্দুক, সুন্দর মুখ, গাইডবই, পাঁচিলের ওপর বোতলভাঙা কাচের টুকরো, পরিবর্তমান আমি, তুমি ও সে। ভিতরে ভিতরে মগ্নতার লাভা।

এ কি তবে কানাগলিতে ঢুকে পড়া কৃত্রিম পুনরুক্তির স্রোত? যা বোরহেস আর কাসারেস রচিত 'ক্রনিকাস দে বুসতোস দোমাক'-এর সেই আশ্চর্য বইয়ের মতো, যার নবম খণ্ড পর্যন্ত আছে শুধু একটি টেবিলের উত্তর-পশ্চিম কোণের বর্ণনা?

অথবা, হে কালপুরুষ বলো, এ কি কথার পরমাণুকণা, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যাকে আমরা খুঁজে চলেছি?

৬ জানুয়ারি ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২

অনন্ত রাত্রির বুকে সমুদ্রে ভাসমান কয়েকটি কাগজের স্তূপে আগুন জ্বলছে। নক্ষত্রের নীল বর্শা ঝলসে উঠছে সেই আগুনে।

কে জ্বালিয়েছে আগুন? কী দোষ করেছে ওই আয়তক্ষেত্রগুলো?

আমি হাত পুড়িয়ে একটি অগ্নিদগ্ধ বই তুলে নিই। আশ্চর্য, বইটি দাউদাউ করে জ্বলছে, কিন্তু একটি অক্ষরও পোড়েনি। তার সারা গায়ে আগুনের চুম্বন-চিহ্ন আর রক্তের দাগ।

আমি রক্ত আর ছাই মুছে অষ্টাদশ শতকের স্বর্ণাক্ষরগুলো পড়ি: 'Candide ou l'Optimisme', কাঁদিদ বা আশাবাদ। জার্মান থেকে ফরাসিতে অনূদিত। লেখকের নাম ড. রাল্‌ফ্‌। ১৭৫৯ সালে ছাপা। শতাব্দীর সম্ভবত সবচেয়ে ভূগর্ভলীন (clandestine) বইটি প্রকাশিত হয়েছিল একযোগে প্যারিস, জেনিভা, আমস্টারডাম আর লন্ডন থেকে।

প্রকাশমাত্র ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ বইটির মূল লেখক যে 'le siècle des lumières' বা আলোর শতাব্দীর যুগন্ধর পুরুষ ভলতের (১৬৯৪-১৭৭৮), সেটা বুঝতে সমসাময়িকদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। এত স্বচ্ছ, এত ধারালো অথচ এত প্রবলভাবে মেরুদণ্ডী আর কার রচনা হতে পারে আঠারো শতকের ফ্রান্সে? ভলতের ছাড়া আর কে এত নির্মম শিল্পিত হিংস্রতায় খুলে দিতে পারেন ধর্মীয়, সামাজিক আর রাজনৈতিক ভণ্ডদের ছলছলানো মুখোশমালা? প্রতিপক্ষকে ধারাবাহিক ভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতে ভলতের-এর সমকক্ষ আর কে আছে?

অতএব, চুপ!

> সাবধান, কাছে এসো না। ওটা একটা টাইম-বোমা। ওটাকে সরিয়ে নেওয়া যাবে না, ওটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে নিষেধাজ্ঞা—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বিপদ! বিপদ!' যারা শুনতে চাইবে না তারা জানে না তাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে, তারা একদম বোকা বনে যাবে।

(নাতালি সারোৎ-এর 'আহাম্মকেরা বলে')

আসলে, আবহমান কাল ধরে মুক্তচিন্তার ইতিহাস একদিকে মানুষের আদালতে না-পৌঁছতে দেওয়ার ইতিহাস, অন্যদিকে কাঁটাতার পার হয়ে মানুষের কাছে পৌঁছনোর ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাস একদিকে ছিন্নলিঙ্গ অমেরুদণ্ডীদের হঠকারিতার ইতিহাস, ক্ষমতার কর্দমাক্ত অলিন্দের ত্রাসের ইতিহাস। অন্যদিকে, পৃথিবীর ইতিহাস মেরুদণ্ডীদের জয়ের ইতিহাস।

ভলতের আর সার্ত্র-এর (১৯৭০ সালে প্যারিসের রাজপথে নিষিদ্ধ কাগজ 'মানুষের জন্য' বিক্রি করার জন্য সার্ত্রকে গ্রেপ্তার করা হলে রাষ্ট্রপতি দ্য গোল বলেন, 'ভলতেরকে কি বন্দি করে রাখা যায়?') ঘরানাকে বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, গ্রিক নাট্যকার এউরিপিসেদের ব্যবহৃত একটি শব্দে: Parrhesia। প্রায় এক হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত এই শব্দের অর্থ হল 'fearless speech', ফরাসিতে 'franc-parler' এবং জার্মানে Freimüthkeit। 'পারোজিয়া' কথাটি এসেছে parrhesiazomai বা parrhesiazesthai ক্রিয়াপদ থেকে, যার অর্থ 'সব কিছু বলা'।

একজন 'পারেজ়িয়াস্ত' বা স্পষ্টবক্তা কোনও কিছুর পরোয়া করেন না। সম্পূর্ণ অকপট হতে গিয়ে তিনি মৃত্যু-উপত্যকা পর্যন্ত হেঁটে যেতে প্রস্তুত। মৌনতা, তোশামোদ বা মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ না-করে তিনি নির্ভীকভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেন। পদ বা পুরস্কারের মোহ তাঁকে টানে না। হয়তো সুবিচার বা ন্যায় (justice)-ই তাঁর কাছে প্রধান প্রশ্ন। গ্রিকরা মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত 'পারেজ়িয়া' বা স্পষ্টবাদিতা উৎসারিত হয় 'mathesis' বা প্রজ্ঞা থেকে।

প্রশ্নদীপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসুদের সমাজপতিরা চিরকাল ভয় পেয়েছে। সক্রাতেস-এর হাতে বিষপত্র তুলে দিল কে? কে পুড়িয়ে মারল জিওর্দানো ব্রুনো'কে? কারা উত্ত্যক্ত করল শেক্সপিয়রকে? কারা দেশছাড়া করল ভিক্তর য়্যুগো আর রম্যাঁ রলাঁ-কে? ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক অসংগতি আর অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে আঠারো শতকে ভলতের-কে বারবার নির্বাসিত,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ হতে হয়েছে। বাইশ বছর বয়সে তাঁকে যুবরাজ পঞ্চদশ লুই'কে নিয়ে শ্লেষাত্মক নাটক লেখার জন্য নির্বাসিত হতে হয়। কিছুদিন পরেই রাজা চতুর্দশ লুই-কে নিয়ে আক্রমণাত্মক কবিতার জন্য বাস্তি-র কারাগারে বন্দি হতে হয়। চুরাশি বছর বয়সে মৃত্যুর পরও তিনি রেহাই পাননি, কারণ তাঁর মৃতদেহকে প্যারিসে সমাধিস্থ হতে দেওয়া হয়নি। সতেরো শতকে মলিয়ের-এর মৃতদেহের ভাগ্যেও একই রকম অসম্মান জুটেছিল। ফরাসি বিপ্লবের পর মহাসমারোহে চূড়ান্ত সম্মান দিয়ে তাঁর মৃতদেহকে প্যারিসে পাঁতেয়ঁ-র মহাসৌধে ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

মানুষের জন্য ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে ভলতের শুধু কবিতা বা নাটক নয়, 'দার্শনিক চিঠিপত্র', 'দার্শনিক অভিধান' এবং 'সহনশীলতা বিষয়ক পত্র'-র মতো বই লিখেছেন, ইতিহাসকে পুনর্লিখন করতে চেয়েছেন। ইতিহাসে বিশ্বচেতনা তাঁর অন্যতম অবদান। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনারও পূর্বসূরি তিনি। এর নমুনা আমরা একটু পরে 'কাঁদিদ' থেকে দেব।

যাঁর ভাবেন ভলতের (প্রচলিত বাঙালি উচ্চারণে 'ভলতেয়ার'; যদিও ফরাসিতে ai-ধ্বনি 'এ' এবং 'অ্যা'-র মাঝামাঝি) শুধু পক্ককেশ পণ্ডিতদের জন্য, তাঁদের বলি, ছদ্মনামে এই লেখকের (মূল নাম জাঁ-মারি আরুয়ে) ভাষা যে একশো-ফলা ছুরির মতো, তা 'কাঁদিদ'-এর যে কোনও অনুচ্ছেদ পড়লেই বোঝা যায়। কিন্তু কোন সংস্করণ?

বাঙালি সুধী পাঠককে আমি জন বাট-এর মধ্যমানের ইংরেজি অনুবাদটি পড়তে বারণ করব। যে-কটি ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যায়, তার অধিকাংশতেই ভলতেরি গদ্যের বর্ণচ্ছটা ধরা পড়েনি। মূল ফরাসির স্বাদ সুস্বাদু শ্যাম্পেনের মতো যে অবিস্মরণীয় বাংলা অনুবাদের গা বেয়ে চুঁইয়ে পড়েছে তার স্রষ্টার নাম অরুণ মিত্র।

১৯৭০ সালে সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত সেই অনুবাদ যেন, শঙ্খ ঘোষের শব্দ চুরি করে বলি, 'আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে'।

'আরব্য রজনী'-র ফরাসি অনুবাদের তুমুল সাফল্যের পর ভলতের ভ্রমণ-উপন্যাসে এক নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। তাঁর হাতেই সৃষ্টি হয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'দার্শনিক গল্প' বা Conte philosophique। প্রেমিক-প্রেমিকার দীর্ঘ বিচ্ছেদ পর্বের পর মিলনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের বিশেষ ধাঁচকে ভলতের পরমানন্দে প্যারডি করেছেন 'জাদিগ', 'কাঁদিদ', 'ব্যাবিলনের রাজকন্যা'-র মতো উপাখ্যানে। সকলেই তার প্রিয়জনকে খুঁজছে। ঘটনাক্রমগুলো খুব দ্রুতগতিতে ঘটে যেতে থাকে, এবং সেই সুযোগে ভলতের তোলেন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সমালোচনার ঝড়। অন্ধ আবেগ ও লোভ, ইতরামি ও চরিত্রহীনতা, মহত্ত্বের ধারাবাহিক অবনমন, প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্মপ্রচারকদের মিথ্যাচার ও নীচতা, বিচারব্যবস্থার প্রহসন, রাজারাজড়া ও পণ্ডিতদের দম্ভ, ভলতের-এর আক্রমণ থেকে কোনও কিছুই রক্ষা পায়নি।

কিন্তু এর ওপর ভলতের যোগ করেন একটি থিম, যা কাহিনিটিকে দেয় এক বিশেষ ধরনের বাঁধুনি, যা আখ্যানটিকে তার পথনির্দেশ দেয়। তাঁর উপাখ্যানগুলোর উপ-শিরোনাম থেকে থিম-টির সন্ধান পাওয়া যাবে: 'জাদিগ ও ভবিতব্য', 'মেমনঁ ও অভিজ্ঞান', 'কাঁদিদ বা আশাবাদ'। অবশ্য শেষ পর্যন্ত, 'কাঁদিদ' ও অন্যান্য উপাখ্যানে প্রধান প্রশ্ন একটাই; মানুষ কী করে সুখী হবে?

চরিত্রগুলি বিচিত্র: সারা পৃথিবী সেখানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে তারা ভলতের-এর সুতোয় ধরা পুতুল, ভলতের-ই তাদের প্রদর্শক। ভলতের সর্বদা উপস্থিত থাকেন, তিনি ইচ্ছেমতো আমাদের দেশে-বিদেশে নিয়ে যান। কোথায় কখন যাবেন, সেটা তাঁর মর্জির ওপর নির্ভর করে, কিন্তু এই ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ভাবে এক দার্শনিক উপসংহারের দিকে আমাদের টেনে আনে।

'কাঁদিদ' ও অন্যান্য উপাখ্যানে মূল কথা হল মানুষের জীবন যন্ত্রণাদীর্ণ, অন্ধ ভাগ্যের হাত থেকে সে কোনওক্রমে রক্ষা পেলেও নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সক্ষম।

হালকা, ফুরফুরে এক গদ্য যার সংহত মাধুর্য চরাচর অতিক্রম করে এসে আমাদের ছোঁয়। যেমন, 'কাঁদিদ'-এর চূড়ান্ত হিংসার বর্ণনা দেওয়া হয় এমন এক ভঙ্গিতে যেন এক গ্রামের মেলার বর্ণনা করা হচ্ছে। ভলতের-এর প্রধান অস্ত্র তাঁর হাস্যরস। সবচেয়ে গম্ভীর ব্যাপারগুলোকে নিয়ে করেন লঘু রসিকতা, আর হালকা জিনিসগুলোকে দেওয়া হয় দার্শনিক গুরুত্ব।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফরাসিতে 'ভলতেরিয়ানিস্‌ম' বলে একটি কথাই তৈরি হয়ে গিয়েছে, যার অর্থ সব কিছু সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সন্দেহ, সমস্ত রকম গোঁড়ামির সমালোচনা। কদর্থে, এক বিদ্রুপ-প্রিয় ধনীর শ্লেষাক্ত খামখেয়ালিপনা, যা সব কিছু নস্যাৎ করতে চায়।

১৭৫৫ সালে লিসবনের ভূমিকম্প ও সুনামি ছিল 'কাঁদিদ' রচনার প্রধান উপলক্ষ। তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল জার্মান দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ গটফ্রিড ভিলহেল্‌ম্‌ লাইব্‌নিৎসের 'বিশ্বভাবনা', যেখানে প্রমাণ করা হয়েছিল পৃথিবীর সব কিছুই মানুষের ভালর জন্য, এমনকী লিসবনের ভূমিকম্প এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে চলমান 'সাত বছরের যুদ্ধ'। ভলতেরের মনে হয়েছিল এত বড় ধ্বংসলীলার পরও এক ছদ্ম-আশাবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকার মতো অশ্লীল আর কী হতে পারে? লিসবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর লাইব্‌নিৎসীয় আশাবাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ভলতের দু'টি কামান দাগেন: একটি কবিতা, অন্যটি 'কাঁদিদ' উপাখ্যান।

আরব্য উপন্যাসের অনুপ্রেরণা ছাড়াও ১৬৬৯ সালে প্রকাশিত হান্‌স্‌ য়াকব ক্রিস্‌টোফেল ফন গ্রিমেলসহাউসেন-এর শ্লেষাক্ত ভ্রমণ-উপন্যাস 'সিম্‌প্লিসিউস সিমপ্লিসিসিমুস' এবং ১৬৯৯ সালে প্রকাশিত ফ্রাঁসোয়া ফেনেলঁ-র ফরাসি ক্লাসিক 'তেলেমাক'-কেও 'কাঁদিদ'-এর পূর্বসূরি হিসেবে গণ্য করা যায়। শ্লেষ ও প্যারডির আরেক রাজা ইংল্যান্ডের (ইংল্যান্ড ছিল ভলতেরের প্রিয় দেশ, যেখানে তিনি ১৭২৬-১৭২৯ চার বছর ছিলেন) জনাথন সুইফ্‌ট-এর 'গালিভার্‌স ট্রাভেল্‌স' (১৭২৬)-এর নায়কও দূর দেশে পাড়ি জমিয়ে নানা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। মঁব্রঁ-র 'কসমোপোলিৎ' (১৭৫৩)-এর প্রধান চরিত্রটিও কাঁদিদের মতো একটির-পর-একটি আশাভঙ্গের মধ্যে দিয়ে যায়। কিন্তু পিকারেস্ক উপন্যাস বা Bildüngsroman ধারার উপন্যাসের কোনওটিই হয়তো ভলতেরের বইয়ের মতো বহুকোণ হীরকখণ্ড হতে পারেনি। 'কাঁদিদ'-এর পৃষ্ঠা বেয়ে চুঁইয়ে-পড়া একটি শিশির যেন বিশ্বসংসারকে এক মায়ামুকুরে ধরে রেখেছে। ভলতের কি সাধে বলেছিলেন, বড়-বড় নয়, ছোট-ছোট কুড়ি পয়সার বই দিয়ে বিপ্লব করা যায়?

কথিত আছে যে, ভলতের তিন দিনে এই উপন্যাসটি লেখেন। ল্যুসিয়্যাঁ পেরে আর গাস্তঁ মোগ্রা-র ভলতের-জীবনী এই গল্পটি চাউর করে। কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তথ্যসাবুদ বলছে তিনি যথেষ্ট সময় নেন। বহুবার ঘষামাজা ছাড়া এ জিনিস কি সম্ভব? তাঁর এক হাতে ছিল বাটালি, অন্য হাতে ছুরি।

এই যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের ভেতর সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য এ এক তুলনারহিত প্রতিবেদন।

এবার চলুন খোলা যাক এই নিষেধাজ্ঞাবিদীর্ণ ক্লাসিক। যার প্রামাণ্য সংস্করণ পাওয়া যায় বিখ্যাত লা ভালিয়ের পাণ্ডুলিপিতে, যা ১৭৫৮ সালের শেষে ভলতের লা ভালিয়েরের ডিউক ও তাঁর সহধর্মিণীকে পাঠিয়েছিলেন।

যে-বাংলা অনুবাদটি বহু ভাগ্যে আমাদের হাতের কাছে আছে ('কাঁদিদ', অনুবাদসংগ্রহ ১, অরুণ মিত্র), তার টীকাগুলো আমাদের দীপিত করবে। বস্তুত, বাংলা অনুবাদে সচরাচর এমন যথাযথ টীকা আমি দেখিনি।

ওয়েস্টফালিয়া-র ব্যারনের দুর্গভবনের অতি মিষ্ট তরুণ কাঁদিদ। ইংরেজিতে Candid, অরুণ মিত্র টীকায় লিখেছেন, 'বাংলার সরলকুমার বললে নামমাহাত্ম্য প্রকাশ পেতে পারে।'

> পরিবারের প্রাচীন ভৃত্যেরা সন্দেহ করত যে, ব্যারনের ভগ্নীর গর্ভে এবং প্রতিবেশী এক সজ্জনের ঔরসে তার জন্ম। ওই সম্ভ্রান্ত তরুণী কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হননি, কারণ ভদ্রলোক তাঁর বংশপরিচয়ে মাত্র একাত্তরটি অভিজাত কুলপর্যায় প্রমাণ করতে পেরেছিলেন...

লাইব্‌নিৎসের প্রতিনিধি আশাবাদী গৃহশিক্ষক ড. পাঁগ্লস কী ভাবছেন?

> 'প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সেরা উদ্দেশ্য রয়েছে। লক্ষ করে দেখুন, চশমা পরার জন্য নাক তৈরি হয়েছে, অতএব আমরা চশমা পরি। স্পষ্টতই পা তৈরি হয়েছে মোজা পরার জন্যে, অতএব আমরা মোজা পরি। পাথর তৈরি হয়েছে কেটে মাপসই করার জন্যে এবং তা দিয়ে দুর্গভবন বানানোর জন্যে, অতএব হুজুরের এই অতি সুন্দর দুর্গভবন...। যেহেতু শুয়োর তৈরি হয়েছে খাওয়ার জন্য, সেহেতু আমরা সারা বছর ধরে শুয়োর খাই। অতএব যারা বলেছে সব কিছুই ভালর জন্যে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারা মুর্খের মতো কথা বলেছে; তাদের বলা উচিত ছিল সব কিছুই সবচেয়ে ভালোর জন্যে।'

ড. পাঁগ্লসকে একটি সুশ্রী পরিচারিকাকে 'ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা' শেখাতে দেখে কাঁদিদ ব্যারন-কন্যা ক্যুনেগঁদের প্রেমে পড়ে।

তরুণ যুবক সরল মনে তরুণীর হাতে চুমু খেল... তাদের ওষ্ঠাধর মিলিত হল, চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। হাঁটু কাঁপতে লাগল, হাতগুলো এলোমেলো পথে এগিয়ে গেল। এমন সময় ব্যারন মহোদয় পর্দার কাছ দিয়ে যেতে যেতে এই হেতু আর এই পরিণাম দেখতে পেলেন। তিনি কাঁদিদের পশ্চাদ্দেশে বেশ জোর কয়েকটি পদাঘাত দিয়ে তাকে দুর্গভবন থেকে বহিষ্কৃত করে দিলেন। ক্যুনেগঁদ অজ্ঞান হয়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন ব্যারন-জায়া তার গালে চড় কষালেন। সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে মনোরম দুর্গভবনে সব কিছু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

দেশ-বিদেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর ফ্রান্সের উপকূলে পৌঁছয় কাঁদিদ।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল, 'মি. মারত্যাঁ, আপনি কি কখনও ফ্রান্সে এসেছিলেন?' মারত্যাঁ বলল, 'হ্যাঁ, আমি কয়েকটা প্রদেশে ঘুরেছি।... সমস্ত প্রদেশেই লোকের প্রধান কাজ হল প্রেম করা, দ্বিতীয় কাজ হল পরনিন্দা করা এবং তৃতীয় হল শূন্যগর্ভ কথা বলা।'
'কিন্তু মি. মারত্যাঁ, আপনি কি প্যারিস দেখেছেন?'
'হ্যাঁ, আমি প্যারিস দেখেছি। প্যারিস ওই সবেরই এক মিশ্রণ। সে এক বিশৃঙ্খলার রাজ্য, সে এক জঙ্গল যার মধ্যে প্রত্যেকেই সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত কিন্তু কেউ তা পাচ্ছে না।... আমার পরিচয় হয়েছিল লিখিয়ে ইতরদের সঙ্গে, ঘোঁট-পাকানো ইতরদের সঙ্গে আর গোঁয়ার ইতরদের সঙ্গে।'

সবাই তাকে বলল, 'আমরা প্যারিসে যাচ্ছি।' সে প্রবেশ করল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহরতলি স্যাঁ-মারসো দিয়ে। এ জায়গাটা তার মনে হল ওয়েস্টফালিয়ার সবচেয়ে কুৎসিত গ্রাম।

সরাইখানায় উঠতে না উঠতেই কাঁদিদ একটু অসুস্থ হয়ে পড়ল। কাঁদিদের আঙুলে ছিল মস্ত একটা হীরে এবং লটবহরের মধ্যে ছিল একটা ভীষণ ভারী তোরঙ্গ। সুতরাং সে না ডাকা সত্ত্বেও দু'জন চিকিৎসক সঙ্গে-সঙ্গে এসে গেল তার চিকিৎসার জন্যে, আর এল দু'জন প্রাণের বন্ধু যারা কিছুতেই তার কাছ থেকে নড়বে না এবং দুটি ভক্তিমতী মেয়ে যারা তার জন্য সুরুয়া গরম করতে লেগে গেল।

মারত্যাঁ বলেছিল, 'আমার মনে আছে প্যারিসে আমিও প্রথম যাত্রায় অসুখে পড়েছিলাম। আমি ছিলাম খুব গরিব, সুতরাং বন্ধু বা ভক্তিমতী মেয়ে বা চিকিৎসক কেউই আমার জোটেনি। এবং আমি সেরেও উঠেছিলাম।'

প্যারিসের লোকেদের হাসি:

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল, 'একথা কি সত্যি যে প্যারিসের লোকেরা সব সময় হাসে?'

পাদ্রি বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু তা প্রবল ক্রোধ নিয়ে; কারণ এখানে হো হো করে হাসতে হাসতেই সব কিছু সম্বন্ধে অনুযোগ করা হয়। এমনকী হাসতে হাসতেই এখানে জঘন্যতম কাজ করা হয়।'

নাট্যসমালোচক:

কাঁদিদ বলল, 'যে-নাটক দেখে আমি এত কাঁদলাম এবং যার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আমায় এত আনন্দ দিল সেই নাটকের এত নিন্দে করছিল যে মোটা শুয়োরটা সে কে?'

পাদ্রি উত্তর দিল, 'ও একটা ত্যাঁদড় লোক। সমস্ত নাটক এবং বইয়ের নিন্দে করেই ও জীবিকানির্বাহ করে। যে-কেউ সাফল্য লাভ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে তাকেই ও ঘৃণা করে, যেমন নপুংসকরা সম্ভোগীদের ঘৃণা করে।'

পেশাদার লিখিয়ে:

'ও হল সাহিত্যের সেই সাপদের একজন যারা নোংরায় আর বিষে নিজেদের পুষ্ট করে। ও এক পেশাদার লিখিয়ে।'

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল, 'পেশাদার লিখিয়ে কাকে বলছেন?' পাদ্রি বলল, 'যে পত্রিকার পাতা ভরায়।'

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক:

ভেড়াটাকে সে রেখে এল বর্দোর বিজ্ঞান-পরিষদের কাছে। কেন এই ভেড়াটার লোম লাল তার গবেষণাই সেই বছরের পারিতোষিকের বিষয় হবে বলে পরিষদ প্রস্তাব করল। পারিতোষিক পেলেন উত্তরের এক পণ্ডিত যিনি 'ক' যোগ 'খ' বিয়োগ 'গ' ভাগ 'হ' দ্বারা প্রমাণ করলেন যে ভেড়াটার রং লাল হতেই হবে এবং গায়ে ঘা হয়ে তার মরতেই হবে।

মারত্যাঁ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, বিজ্ঞান-পরিষদের আশি খণ্ড প্রবন্ধ-সংকলন রয়েছে দেখছি। ওগুলিতে ভাল কিছু থাকা সম্ভব। পোকোকুরান্তে বললেন, 'থাকতে পারত যদি এইসব আগড়ম-বাগড়মের একজন লেখকও অন্তত পিন-তৈরির শিল্পও উদ্ভাবন করতেন।'

নাটক ও নাট্যকার:

বর্বর রচনাভঙ্গিতে লেখা ভাবোন্মাদের স্বপ্ন-প্রলাপ, এলোমেলো কথা, ঝুটো নীতিবাক্য, ফোলানো ফাঁপানো মামুলি বক্তব্য, দেবতাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্বোধন করে বক্তৃতা, যেহেতু মানুষের সঙ্গে কথা বলতে এরা জানে না।

মানুষ যা ভাবে, মানুষ যা লেখে:

পোকোকুরান্তে বললেন, 'মানুষ যা ভাবে তা যদি লেখে তো সে খুব ভাল, এ হল মানুষের এক বিশেষ অধিকার। আমাদের সময় ইতালিতে লেখা হয় শুধু তাই যা ভাবা হয় না।'

সংগীত ও কোলাহল:

নৈশভোজের আগে পোকোকুরান্তে এক কনসার্টের আয়োজন করলেন। সে-সংগীত কাঁদিদের অতি মধুর লাগল। পোকোকুরান্তে বললেন, 'এই কোলাহল আধ ঘণ্টা বেশ লাগতে পারে, কিন্তু আর বেশিক্ষণ চললে প্রত্যেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যদিও কেউ তা স্বীকার করতে সাহস পায় না।'

শ্বেতাঙ্গের কীর্তি, ধর্ষিতার বয়ানে:

'আমি অনেক কষ্টে সেই মৃতদেহের স্তূপ থেকে কোনওক্রমে নিষ্ক্রান্ত হলাম।... আমি চোখ খুললাম, দেখলাম একজন সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁতে দাঁত চেপে বলছে: 'ওহো... না থাকা কি দুর্ভাগ্য!'

পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতার স্বরূপ:

(সুরিনামের হাত-পা কাটা কাফ্রিটি) কাঁদিদকে বলল, 'পোশাক হিসেবে বছরে দুবার আমাদের শুধু এই জাঙিয়া দেওয়া হয়। আমরা চিনির কলে কাজ করার সময় যখন কলে আঙুল আটকে যায়, তখন আমাদের হাতটা কেটে দেওয়া হয়। আমরা যখন পালাতে চাই, তখন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের পা কেটে দেওয়া হয়। দু'টো অবস্থাই আমার হয়েছিল। আপনারা ইউরোপে যে চিনি খান, তার দাম এইভাবেই আমাদের দিতে হয়।... কুকুর বাঁদর এবং কাকাতুয়ারা আমাদের চেয়ে হাজারগুণ কম দুর্ভাগা।'

ক্ষমতামদমত্তের অবজ্ঞা:

তাঁর যতখানি গর্ব থাকা স্বাভাবিক ততখানি গর্ব এই প্রভুর ছিল। তিনি সুমহান অবজ্ঞা নিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন। নাক এত উঁচুতে ওঠাতেন, গলার স্বর এত নির্মমভাবে চড়াতেন, কথায় এমন প্রভুত্বের সুর ফোটাতেন, ভঙ্গি এমন জবরদস্ত করতেন যে, যারা তাঁকে অভিবাদন করত, তাদের সকলেরি লোভ হত তাঁকে উত্তমমধ্যম দেওয়ার।

আশাবাদ:

কাঁদিদ চেঁচিয়ে উঠল: 'শেষ পর্যন্ত তোমার আশাবাদ আমাকে ছাড়তে হবে দেখছি।'

কাঁকাবো জিগ্যেস করল, 'আশাবাদটা কী?'

কাঁদিদ বলল, 'যখন সব কিছুরই খারাপ দশা, তখন সব কিছুকে ভাল বলার বাতিক হল আশাবাদ।'

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসে ভলতের 'কাঁদিদ' উপাখ্যানের শেষ পরিচ্ছেদে এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে নিজের চরকায় তেল দিলে তিনটি মহাব্যাধি ঘেঁষতে পারে না: একঘেয়েমি, পাপ এবং অভাব। শেষ পর্যন্ত এক ক্ষুদ্র মুসলমান চাষিকে সব রাজারাজড়া, আমির-ওমরাহ, ধর্মব্যবসায়ীর চেয়ে মহৎ বলে শনাক্ত করেন ভলতের।

ভণ্ড আশাবাদীটিকে শত উদাহরণেও কাবু করা যায়নি। কিন্তু উপাখ্যানের শেষ বাক্যে কাঁদিদ সারকথাটি বলে: 'কথাটি চমৎকার বলেছেন। কিন্তু আমাদের কর্তব্য আমাদের বাগান চাষ করা।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেষ পরিচ্ছেদে ছোট জমির ফলন (যা ভলতের ফের্নেতে করে দেখিয়েছিলেন) বা সূচিশিল্পের কাজ অথবা কুৎসিতদর্শনা নায়িকার কেক বানানোর পেশা অপূর্ব মায়াময় হয়ে ওঠে। আর আমরা এই আশ্চর্য বইকে সূর্যস্নাত পাখির মতো আকাশের নীল ওম বুকে নিয়ে উড়ে যেতে দেখি।

জুভেনাল বা হোরেস, এমনকী জনাথন সুইফটের বিষমাখানো তীর নয়, ভলতেরীয় ঠাট্টার সঙ্গে মিশে থাকে এক আকাশ কান্নার রামধনু রং।

২০ জানুয়ারি ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩

ঘুমের মধ্যে আটতিরিশ বছর আগেকার বিলুপ্ত এক রাত ফিরে এল ডুবসাঁতার দিয়ে। কোন অঘ্রানের শিশিরে হারিয়ে গিয়েছিল সেই বইয়ের রাত!

আমি দেখছি জীবনানন্দের 'বিলাস' গল্পের মাস্টারমশাই গলা খাঁকরে শান্তিশেখরকে বলছেন:

> 'বইগুলো দেখেছ?'
>
> 'দেখছি।'
>
> কতকগুলো আলমারির লবেজান অন্ধকার— অন্ধকারের তিব্বতি পবিত্রতা তবু— ধূপের আবছায়া আর মণিপামহুম্— টেবিল ডেস্ক ও একটা বৈরাট্যের ছায়ান্ধকার ছাড়া কিছুই দেখছিল না সে তবুও। এ-জিনিসগুলোও দেখছিল না। ঠিক, অনুভব করছিল।
>
> 'এই বইগুলো তুমি কিনেছ হয়তো—' মাস্টারমশাই বললেন।
>
> 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি—, আপনিও কিনতে বলেছিলেন—'
>
> 'আমি? কিন্তু এসব বই কী হবে? এ তো ইস্কুলের ছেলেদের লাইব্রেরি। তুমি কি আশা কর, ওরা মালার্মের বই পড়বে?'
>
> 'মালার্মে?' শান্তিশেখর একটু থতমত খেয়ে বললে।
>
> 'এই তো— এই যে—'
>
> ...শান্তিশেখরের মনে হল, মাস্টারমশাই মালার্মের দু'-তিনখানা বই আলগোছে টু-শব্দ না করে কোথায় যেন রেখে দিলেন। মনে হল, আমলকিপল্লবের থেকে শিশির ঝরে পড়ল যেন হেমন্ত রাতের পাখির পালকে, ছায়া-আঙুলের নিঃশব্দতায় বইগুলো অন্তর্হিত হয়ে গেল কোথায়; সে-সব বইয়ের মলাট কীরকম, তাও দেখবার সুযোগ হল না শান্তিশেখরের...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ মনে হল ময়লা গেঞ্জি গায়ে ভাঙা পেয়ালা হাতে ওই গল্পের মাস্টারমশাই অপরেশবাবু নয়, আমাদের ইস্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই জ্যোতিবাবু। জ্যোতিভূষণ চাকী মধ্যবিত্ত বারান্দার সেই ভাঙাচোরা টেবিলের এক আধো-অন্ধকার কোণে বসে সংস্কৃত থেকে নন্দনতত্ত্বের সূত্রগুলোকে এক অপূর্ব অভিনিবেশে অনুবাদ করতে করতে বললেন, 'তুই কিন্তু বললি না মালার্মের কথা। ভুলে গেলি।'

আমি মাটির ওপরে খড়ি দিয়ে লিখি, মালার্মে।

মালার্মে।

হারিয়ে যাওয়া এক পিতা।

পল ক্লোদেলের ভাষায় 'la fleur suprême de Paris'। প্যারিসের পারিজাত।

তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র ভূমিকায় প্রথম ছত্রেই যাঁর নাম উৎকীর্ণ করেছিলেন জীবনানন্দ। জীবনানন্দের মতো 'আধুনিকতম', দুঃসাহসিক অভিযাত্রী ছাড়া আর কে বুঝতে পারতেন মালার্মের রহস্যমেদুর অভিযানমালা? যিনি লিখতে পেরেছেন 'নগ্ন নির্জন হাত' অথবা 'অন্ধকার':

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া।
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

তিনি ছাড়া আর কে দীপিত করবে কবিতার কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছ?

শব্দের মানে না বুঝে আমি কবিতা পড়েছি অনেকদিন। অনেক অনেকদিন শুধু শব্দের ভাস্কর্য, তার দৈর্ঘ্য, তার র-ফলা ও রেফ আমাকে ডেকে নিয়েছে কবিতাত্মার দিকে। কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাসক মালার্মে যেভাবে ভেবেছিলেন সেইভাবে। একমাত্র এভাবেই কি ছোঁয়া যায় না আবহমান কবিতাশরীরকে?

স্তেফান মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮, আসল নাম এতিয়েন মালার্মে)-র জন্ম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোদল্যের-এর কবিতা থেকে। তিনি বোদল্যের-এর অভিযানের এক সেনাপতি, তাঁর নতুন প্রস্বরকে তিনি অনুসরণ করেছেন। তবু তিনি কবিতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ এককভাবে স্বতন্ত্র। তিনি বিশ শতকের প্রায় সমস্ত পশ্চিমি সাহিত্যতত্ত্বের আদিপুরুষ। তাঁর ভাবনাচিন্তাকে না-জেনে যাঁরা সোস্যুর-বার্ত-দেরিদা'র নাম করেন, করুণাঘন অবজ্ঞায় তাঁদের ছিন্ন পাঠমালা আমরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে পারি।

অশ্লীল বাস্তব, তার কদর্যতা আর একঘেয়েমিকে ঘৃণা করতেন মালার্মে ('La chair est triste, hélas!' হায়, কী বিষণ্ণ মাংস!), তাই তিনি নৈরাশ্য আর বিতৃষ্ণাকে কাটিয়ে উঠতে সমুদ্রযাত্রা ('সমুদ্রবাতাস') এবং মৃত্যুর ('ঘণ্টাবাদক') কথা ভেবেছেন। বোদল্যের-এর মতো তিনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন এক রহস্যমেদুর স্বর্গের ('তিক্ত বিশ্রামে ক্লান্ত', 'জানালাগুলি', 'আকাশনীল')।

কিন্তু মালার্মে তাঁর যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠাকে দিলেন এক নিজস্ব নৈর্ব্যক্তিক শরীর। এই পৃথিবী তাঁর সূক্ষ্মতাকে ধারণ করতে অক্ষম, এক কাল্পনিক বিশ্ব নির্মাণ করতে অনুপ্রাণিত করে না; এক সাদা পৃষ্ঠায় মালার্মে তাঁর অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে চান। জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ আর স্বপ্নে আশাহত, অপবিত্রতার খাদ (যা তাঁকে দেয় বিবমিষা) এবং পবিত্রতার সমুদ্রের (যার সামনে তাঁর মাথা ঘোরে) মাঝে স্থাণুর মতো তিনি দাঁড়িয়ে। 'জানলা' কবিতায় মালার্মে এক মৃত্যুপথযাত্রীর বর্ণনা করেন যে 'বিষণ্ণ হাসপাতালে ক্লান্ত' মুখ রাখে রৌদ্রস্নাত কাচের দেয়ালে, আর হয়ে ওঠে দিনগত পাপক্ষয়-ক্লান্ত ব্যর্থ পলাতকের প্রতীক। 'আকাশনীল' কবিতায় এক ভয়ংকর হতাশাদীর্ণ কবির ছবি আঁকেন যিনি এক অসম্ভব আদর্শের সামনে আর্তনাদ করে ওঠেন।

এই কানাগলি থেকে বেরোতে চান তিনি, বন্ধ্যাত্বের পরিসমাপ্তি চান এক নতুন নান্দনিকতার সন্ধানে, কিন্তু বাধা হয়ে ওঠে পেশাগত সংকট ও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা— নিদ্রাহীনতা, নিউর‍্যালজিয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা। অবশেষে ১৮৭১ সালে ২৯ বছর বয়সে প্যারিসে ইংরেজির শিক্ষকের চাকরি হল মালার্মের। ল্যকঁৎ দ্য লিলের ভাষায়, 'স্তেফান মালার্মে এলেন, আগের চেয়েও নম্র, বিনীত ও উন্মাদ এবং কপর্দকহীন। সঙ্গে এমন কিছু গদ্য এবং কবিতা যা সম্পূর্ণ অবোধ্য, স্ত্রী ও দুই শিশু যার একজন তখনও জন্মায়নি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮৭৫ সালে নতুন করে পরিমার্জনা করলেন তাঁর ইশারাময় কবিতা 'ফনের বিকেল'। য়্যুইসমাঁস তাঁর প্রশংসা করায় হু হু করে খ্যাতি বাড়ে। ফরাসি কবিতার নতুন তীর্থক্ষেত্র ৮৭, রু্য দ্য রোম-এর বাড়িতে মঙ্গলবারের বিখ্যাত সাহিত্যবাসরে আসেন ভক্ত আর শিষ্যেরা, আসেন আঁদ্রে জিদ ও পল ভালেরি নামে দুই তরুণ। আসেন ক্লোদ দ্যবুসি, জ্যুল লাফর্গ, মরিস মেতেরল্যাঁক, গ্যুস্তাভ্ কান, আলফ্রেদ জারি, চিত্রশিল্পী মানে, মনে, দ্যগা, পিসারো, হুইসলার, গগ্যাঁ, ওগ্যুস্ত র‍্যনোয়ার। গভীর নিষ্ঠায় আর অনন্ত ধৈর্যে মালার্মে তিল-তিল করে নির্মাণ করছিলেন নিবিড় ও সমাহিত 'দুর্বোধ্যতম' সব কবিতা। বোদল্যের, ভের্লেন, পো আর ভাগনারের সমাধি নিয়ে কবিতা কিংবা 'বলাকা' সনেট।

সেই সঙ্গে নির্মাণ করতে থাকেন যুগান্তকারী এক নন্দনতত্ত্ব। ১৮৯৭ সালে, মৃত্যুর আগের বছর 'অসংলগ্ন ভাবনা' নামে এক সংকলনের জন্য একত্র করেন তাঁর সব ভাবনাচূর্ণ এবং বক্তৃতা। একই বছর প্রকাশিত হয় সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে বিতর্কিত কবিতা 'পাশার এক দান'। অদ্ভুত টাইপোগ্রাফিতে ছাপা এই কবিতায় তিনি এক অসম্বন্ধ পৃথিবীর রহস্যভেদ করার জন্য চিন্তার অভিযানের প্রকল্পের কথা বলেছেন। এই অভিযান তো কবিরও অভিযান। তিনি পৃষ্ঠার ওপর শব্দ প্রক্ষেপণ করেন, এক পরম বাস্তব (la réalité absolue)-কে প্রকাশ করার জন্য শব্দের আদর্শ সংস্থাপনকে খুঁজে বেড়ান। শূন্যতার ঘোড়সওয়ার মালার্মে তাঁর চূড়ান্ত প্রচেষ্টাগুলোর অসফলতার মধ্যে দিয়ে আবার খুঁজে পেলেন সাদা পৃষ্ঠার হতাশা।

মালার্মে হয়ে উঠলেন বাতাসরুদ্ধ এক তাত্ত্বিক, হয়ে উঠলেন গভীরভাবে আত্মস্থ আর সমাহিত কবিতার প্রবক্তা ও পুরোহিত।

সেখানে অদীক্ষিত পাঠকের প্রবেশ নিষেধ। বহু আগেই ১৮৬২ সালে 'শিল্পী' পত্রিকায় ক্ষমাহীন কাঠিন্যের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন: 'Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s'enveloppe de *mystère*...' (সব পবিত্র বস্তু এবং যা কিছু পবিত্র থাকতে চায় *রহস্যে* আবৃত)। তিনি দাবি করলেন নিখুঁত ও অমলিন এক ভাষা (une langue immaculée) যা সুবিধেবাদী পাঠকদের অন্ধ করে দেবে। ক্রমশ অনমনীয় হয়ে ওঠেন মালার্মে। তাঁর প্রথম দিকের কবিতার আপেক্ষিক স্বচ্ছতা মুছে যায়, তাঁর স্বপ্নকে আরও উঁচু তারে বাঁধার জন্য তিনি কবিতার তাৎক্ষণিক সুবোধ্যতাকে বর্জন করেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং গণপাঠককে কোনও রকম সুযোগ-সুবিধে দেওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। এডমান্ড গস্-কে লেখেন, কবিতা তো খবরের কাগজের পৃষ্ঠা নয়।

মালার্মে চেয়েছিলেন কবি হয়ে উঠুন ক্রিয়াপদের জাদুকর। তিনি চেয়েছিলেন ভাষাস্থাপত্যের মধ্যে শুদ্ধ চিন্তার (idée pure) আলোকময় ক্ষমতাকে বন্দি করতে, যাতে তার ভেতর থেকে উৎসারিত হয়ে পারে নতুন এক আঙ্গিক। মালার্মে চেয়েছিলেন আপাত-দৃশ্যমানতাকে ভেদ করে প্রকৃত সারবত্তা (essence)-কে স্পর্শ করতে। যাতে গোলাপের আড়ালে অথবা গোলাপের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে গোলাপের আদর্শ সত্তা।

'সাহিত্যের সিম্ফনি'-তে এইরকম দৃশ্যপট এঁকেছিলেন মালার্মে: একটি দোমড়ানো গাছ, যার বাকল একরাশ স্নায়ুশিরার মতো, যার স্নায়ুমুখকে তুলনা করা হয়েছিল বেহালার কান্নাভরা সুরের সঙ্গে, যা গাছের ডালের শেষ প্রান্তে একটি সংগীতের স্বরলিপির মতো কাঁপছে...। শোকার্ত অববাহিকা এক আবহমান ফুলের বাগানে ঢুকে পড়েছে: মৃত, ভারী, ধাতব জল, পেতলের ফোয়ারা, যেখানে আছড়ে পড়ে বেদনার্ত এক অদ্ভুত রশ্মি, মুছে যাওয়া মাধুর্য নিয়ে।

একদিক থেকে প্রতীকী অনুষঙ্গ-কে হয়তো শার্ল বোদল্যের-এর চেয়েও বেশি তীব্রতায় অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন মালার্মে। অনুষঙ্গগুলোর একটিকে অন্যটির ওপরে সংস্থাপন করে দেন তিনি। অভাবনীয় দক্ষতায় মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন। যেমন, স্বপ্নে দেখা দু'টি নারীশরীরকে ফন একটি রেখায় বিম্বিত হতে দেখে— দিগন্তে উন্মোচিত একটি শান্ত শুভ্র রেখা, যা একটি সুরমূর্ছনার মতো। এভাবে শিল্পের প্লাস্টিক গুণ ও সাংগীতিকতাকে এক স্বর্ণিল শূন্যতায় স্থাপন করা হয়।

১৬ নভেম্বর ১৮৮৫ সালে পল ভের্লেন'কে লেখা এক স্বীকারোক্তিমূলক চিঠিতে তিনি লেখেন

> আমি সব সময় এক অ্যালকেমিস্টের ধৈর্য নিয়ে স্বপ্ন দেখি, যেমন সমস্ত ভণিতা ও তৃপ্তিকে বিসর্জন দিয়ে লোকে এক সময় ঘরের আসবাব ও কড়িকাঠ জ্বালিয়ে দিত, তেমনি করে মহাশিল্পের উনুনে উৎসর্গ করতে... একটি বই, কারণ আমি নিশ্চিত যে বই একটিই, অচেতনভাবে যেই তা লিখুক না কেন...। বইটির ছন্দ (যা নৈর্ব্যক্তিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর সজীব) থেকে পৃষ্ঠাসংখ্যা পর্যন্ত সেই স্বপ্ন বা ওড-এর সমীকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

প্রিয় বন্ধু, এই হল আমার পাপের নগ্ন স্বীকারোক্তি, যা আমি হাজার বার রক্তাক্ত, ক্লান্ত মনে প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু তা আমায় ভর করে থেকেছে, এবং হয়তো একদিন আমি সফল হব, গোটা বইটি লিখতে নয় (তার জন্য না জানি কী করতে হয়), অন্তত এক টুকরো নির্মাণ তুলে ধরতে যা বাস্তবতার গরিমায় ঝলমল করে উঠবে, বাকি সব কিছুর দিকে আঙুল দেখিয়ে যা বলে উঠবে ওসব একটি জীবনও টেকার নয়। ওই নির্মিত অংশগুলো দিয়ে প্রমাণ করা যাবে বইটির অস্তিত্ব, যা আমি চিনতে পেরেছি, কিন্তু শেষ করে উঠতে পারিনি।

এক উন্মীলীয়মান গ্রন্থের অসম্ভব স্বপ্নের সামনে দাঁড়িয়ে সাহিত্যকে বিনির্মাণ করেছিলেন তিনি।

৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪

এক তুষারমথিত নিস্তব্ধতার ভেতর এক অসহায়, নিষ্প্রদীপ আলপথ দিয়ে প্রদীপ হাতে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন ওঁরা কারা?

আলো হাতে আঁধারের যাত্রী।

ভাল করে দেখলে ওঁদের কাউকে কাউকে চেনা যাচ্ছে। ওই তো বেদব্যাস, বাল্মীকি, হোমার... সক্রাতেস, প্লাতো, আরিস্ততল, সফোক্লেস, দান্তে, শেক্সপিয়র, সেরভানতেস, ভলতের, গ্যোয়েটে, য়্যুগো, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ... তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, নীৎশে, বিভূতিভূষণ... ওই তো জীবনানন্দ। সঙ্গে বোদল্যের আর রিলকে। আরও অনেকে। কিন্তু সকলের পিছনে যাঁরা চলেছেন, তাঁদের মুখ ঢাকা। তাঁরাও এই শিশ্নোদরতন্ত্রী পৃথিবীর অন্ধকারকে কমাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের আমরা চিনি না।

ওঁদের ছাড়া পৃথিবী অচল। ওঁদের ছাড়া ভেঙে পড়বে যোগাযোগের সেতু, তৈরি হবে অলঙ্ঘনীয় সব পাঁচিল, আলোর পথযাত্রীদের সমস্ত অভিজ্ঞান মিথ্যে হয়ে যাবে।

ওঁরা অনুবাদক।

আমরা ওপরের ওই মহাশিল্পীদের অধিকাংশের লেখা, অথবা মার্কস-লেনিন, কাফকা-কাম্যু কিংবা ফুকো-দেরিদা যতটুকু জানি অনুবাদ পড়েই জেনেছি, সাব-টাইটেল পড়ে বুঝতে পেরেছি বার্গম্যান-এর ছবির সংলাপ, মার্কেস কিংবা কালভিনো পড়ে আমরা শিলীভূত। কিন্তু যাঁদের নিরন্তর পরিশ্রম আর অভিনিবেশের জন্য আমরা জানলাম ওঁদের, সেই অনুবাদকদের নাম জিজ্ঞেস করলে আমরা খাবি খাব। অবশ্য অনুবাদক যদি হন বিখ্যাত লেখক তা হলে একটু অন্য কথা। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তেমনটা আর কতবার হয়েছে? যাঁর জন্য চেনা গেল স্বাতী আর শতভিষা নক্ষত্রকে, তাঁকেই আমরা উপেক্ষা আর অসম্মান করলাম সবার আগে। যেন তিনি নেই, কোনও দিন ছিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাঁকে ছাড়া সাহিত্যের সহিতত্ত্ব চলে যায়, তাঁর মুখ কুয়াশাবৃত। তিনি নোবেল পুরষ্কার পাবেন না কোনও দিন। মার্কেস পাবেন, অনুবাদক গ্রেগরি রাবাসা সম্ভবত একটি সাধারণ সৌজন্যমূলক নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত পাবেন না। কেউ তাঁকে পছন্দ করে না, না সমালোচক, না মূল রচনার লেখক। বিশ্বাসঘাতকের তকমাটা চিরকালের জন্য তার কপালে সাঁটা আছে। বিশিষ্ট ফরাসি সাহিত্যরসিক মাদাম দ্য সেভিন্যে (১৬২৬-১৬৯৬) তাঁর মেয়েকে লিখেছিলেন, 'Les traducteurs sont des domestiques qui vont porter un message de la part de leur maître et qui disent tout le contraire de ce qu'on leur a ordonné.' (অনুবাদকগুলো হচ্ছে সেই ধরনের চাকর যারা মালিকের কাছ একরকম বার্তা নিয়ে গিয়ে উলটো কথা বলে চলে আসে।) ১৭৭৬ সালের নভেম্বর মাসে কবি আলেকজান্ডার পোপ আর্ল অফ বার্লিংটন-কে লিখেছিলেন, অনুবাদগুলো হচ্ছে 'a pack of rogues' (বজ্জাতের ঝাড়)! তিনি জনৈক মি. লিনটন-কে লেখেন: 'I have known one of them take down a Greek book and cry, Ah, this is Hebrew, I must read it from the latter end!' মনে রাখতে হবে যে পোপ নিজে ছিলেন হোমারের 'ইলিয়াড'-এর অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথ রানী মহলানবিশকে তাঁর জীবনীকার ও অনুবাদক এডওয়ার্ড টমসনের 'উদ্ধত নিঃসংশয়তা, অবজ্ঞা ও মুরুব্বিয়ানা'-র কথা লেখেন (৮ এপ্রিল ১৯৩৭)। অনুবাদক প্রায়শই ভুল বার্তা পৌঁছনোর জন্য, যত্রতত্র বিকৃতি ও পরিবর্তনের জন্য নিন্দিত, উদাসীনতা ও বিস্মৃতির শিকার। তিনি সর্বদাই পার্শ্বরেখার বাইরে। কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে, প্রচ্ছদপট থেকেও তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়েছে। সারা বিশ্বের গ্রন্থঅর্থনীতিতে অনুবাদকের জন্য বরাদ্দ থাকে এক শতাংশের কম লভ্যাংশ। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুবাদ-বিষয়ক তাত্ত্বিক ধোঁয়ায় ভরা সেমিনার আয়োজন করে অনুবাদতত্ত্ব-বিলাসীরা আপনমুগ্ধ, ঠিক তখনই নিরাপত্তহীনতার লাল আলো জ্বলে ওঠে।

শূন্য আয়নার মধ্যে সংকুচিত হতে-হতে অনুবাদকের মনে হয়, তবে কি অনূদিত রচনা দ্বিতীয় শ্রেণির, second-hand সাহিত্য? যা মর্যাদার দিক থেকে, সৃজন-সাহিত্য থেকে হীনতর? যার পৃথক কোনও পরিচয় নেই? তিনি কি গাড়ির অপ্রয়োজনীয় পঞ্চম চাকা, যাকে ফরাসিতে বলে, 'la cin-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

quième rue de la charette?' তিনি কি তবে শুধুই এক পণ্য-সরবরাহকারী? এক সুযোগসন্ধানী কোকিল, যে অন্য পাখির বাসায় ডিম পেড়ে আসে? তিনি কি শুধু এক শূন্য পাত্র, অন্যের কাজকে পরিবেশন করাই যার কাজ? নাকি তিনি একজন না-লেখক, 'লেখক' হওয়ার বাসনায় যিনি অনুবাদক হয়েছেন? কোনও একটি ভাষাও সম্যকভাবে না-জেনে 'অনুবাদ' করার মজারু উদাহরণ কলকাতাতেই তো কম নয়!

Translation কথাটির মানে 'to pass on'— অর্থাৎ পৌঁছে দেওয়া। একটি লিখনের চিহ্নমালাকে এক ভাষা থেকে অন্য এক ভাষায় পৌঁছে দেওয়া, একটি সাংস্কৃতিক স্পেস-কে অন্য একটি সাংস্কৃতিক স্পেসে পৌঁছে দেওয়া সত্যিই কি এক বাস্তব প্রকল্প? ভাষাজালটা, semantic network-টাই তো আলাদা! অনুবাদ কি তবে এক মধ্যরাতের দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়? ছায়াবৃত ওই স্বেদাক্ত শ্রমিকটির মতো সেটা আর কে জানে?

অনুবাদক জানেন তাঁর সংকট তাঁর নিজস্ব, কেউ তাঁকে সাহায্য করবে না। তাঁর কাছে এক অসম্ভব দাবি করা হচ্ছে: তাঁর অনুপ্রেরণা, শৈলী, বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য কোনওটাই তাঁর নিজের নয়। অনুবাদক এক অন্যের সামনে এক অন্যকে নিয়ে একা। এক আত্ম-অবলুপ্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। যত বেশি তিনি নিজেকে ভুলে যেতে পারেন, ততই তিনি সার্থক। তাঁকে বলা হয়েছে তোমার আত্মা ও শরীরকে তুমি ভুলে যাও। কিন্তু কেউ কি পারে নিজেকে ভুলে যেতে? শ্লেগেল যেমন বলেছিলেন, এ এক রক্তক্ষয়ী দ্বৈরথ, যেখানে হয় লেখকের মৃত্যু হবে, নয় অনুবাদকের। হত্যাকাণ্ড থামাতে অনুবাদককে অক্লান্তভাবে ট্রাপিজের খেলা খেলে যেতে হয়।

দু'টি বিরোধী আইডিওলজি-র বিপ্রতীপ ঘূর্ণির ভিতর দাঁড়িয়ে তিনি ছিঁড়েখুঁড়ে যান। কাকে তিনি উপস্থাপন করবেন— মূল লেখককে, না নিজেকে? তিনি শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এক বাজিকরের নির্দেশ তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তিনি বালজাক অথবা নীৎশের মুখপাত্র, তাঁর নিজের নয়। সাদা পৃষ্ঠায় তাঁর উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবু তাঁরই হাতে লাগাম, তিনি অনিবার্য ভাবে উপস্থিত। এই অনুপস্থিতি কি স্কিৎসোফ্রেনিয়া-র মতো, যা অনুবাদের দ্বিমেরু বচনে (bipolar discourse) এক আলাদা সংকট (crisis) তৈরি করে? ফলে অনুবাদের স্নায়ুশিরা টনটন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে ওঠে, তার খাঁজে খাঁজে কয়েক ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ে লাল মুক্তোর মতো জমে থাকে।

এ ছাড়া তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাকাল। অনুবাদক জানেন না, কিন্তু মহাকাল জানে অনুবাদক নিজের অজান্তে সমকালের দাস, কারণ সমকালের দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুদ্রাদোষ অনুবাদকের শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে আঠেরো শতকের শেক্সপিয়র-অনুবাদক জাঁ-ফ্রাঁসোয়া দ্যুসি শেক্সপিয়রকে বানিয়ে তোলেন ফুরফুরে ছন্দবদ্ধ জোড়া-পঙ্‌ক্তির নিওক্লাসিকাল কবি। একই ভাবে উনিশ শতকের রোমান্টিক ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার আলেকসাঁদ্‌র দ্যুমা-র হাতে শেক্সপিয়র হয়ে ওঠেন বিস্ময়চিহ্নদীর্ণ এক রোমান্টিক। আবার বিশ শতকের অনুবাদক-কবি ইভ্‌ বনফোয়া-র পুনর্নির্মাণে তিনি হয়ে ওঠেন আলব্যের কাম্যু-র উপন্যাসের নায়কের মতো নিরাসক্ত।

কাজেই ভিন্ন এক সমাজ-সংস্কৃতিতে এক সমান্তরাল শব্দজালের ইশারা তৈরি করতে গিয়ে অনুবাদককে এক সীমাহীন মানসিক চাপের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, তাঁর সুষুম্না বেয়ে নেমে আসে রক্তের লাল মুক্তো।

অন্ধকার ঘরে মোমবাতির আলোয় আঁদ্রে জিদ-এর 'শীর্ণ তোরণ' অনুবাদ করতে করতে ওই মুক্তো আমি খুঁজেছি, যা রক্তিম পাখি হয়ে আকাশে উড়বে। শূন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এ এক অন্তহীন আত্ম-আবিষ্কার, যা সমস্ত অন্তর্লীন স্রোতকে এক রক্তমোহনায় মিলিয়ে দেবে।

কিন্তু রক্তকণিকা কি সহজে মেলে? তিল-তিল করে এই অপার্থিব, পিচ্ছিল পুনর্নির্মাণ? তা কি তবে সৃজনকর্মের চেয়েও শক্ত? বাজুবন্ধ খুলে খুলে যায়। দেরিদা বলেছেন অনুবাদককে দোষ দেওয়া অন্যায়, কারণ তিনি সব সময়ই ব্যর্থ। ফ্রয়েডের ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে ব্রুনো বেটেল্‌হাইম একটি জার্মান শব্দ ব্যবহার করেছেন, Fehlleistungen (faulty achievement)।

তবু অনুবাদক তাঁর নিভৃত কোণে অপেক্ষা করে থাকেন। একদিন তিনি পারবেন। একদিন সম্ভব হবে লেখক এবং অনুবাদকের দুই ডানার উড়াল। একদিন সিন্ধু-বারোয়াঁ-য় লাগবে তান। বিদ্যুচ্চমকের মতো পুনর্জীবন পাবে অলোকরঞ্জন আর হান্স হার্ডার-এর জার্মান অনুবাদে সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল', অথবা তরুণ ঘটকের হাতে সেরভান্‌তেস-এর 'দন কিহোতে'।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ম্যাকবেথ'-এ ডাইনিদের দৃশ্য সোনার কাঠি রুপোর কাঠি দিয়ে জাগিয়ে তুলবেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ।

একদিন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর শব্দ ব্যবহার করে বলি, স্তোত্রে ভরে উঠবে শিশির।

একদিন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫

একটি লোক। ইউরোপীয় নবজাগরণের পৃথিবী বদলে দেওয়া মিছিলের শেষ দিকে সে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

ছোট এক শহর স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন থেকে সে এসেছে। তার নিজস্ব কোনও পয়সাকড়ি নেই, পারিবারিক প্রভাব নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নেই, ভাগ্যের সন্ধানে লন্ডনে এসেছিল ১৫৮০-র দশকের শেষে।

তারপর কী যে ঘটে গেল, মায়াবীর মতো জাদুবলে 'সে' হয়ে উঠল 'তিনি', শুধু তাঁর দেশ ইংল্যান্ডে তাঁর সময়ের নয়, হয়তো সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, কবি ও জীবনশিল্পী। তাঁর রচনা একযোগে মুগ্ধ করল শিক্ষিত ও নিরক্ষরদের, শহুরে চালিয়াত থেকে প্রথমবার থিয়েটার দেখতে আসা গ্রামবাসীদের। সব ধরনের দর্শককে তিনি অনায়াসে হাসাতে বা কাঁদাতে পারেন, রাজনীতির ক্লেদাক্ত অঙ্গনকে বানিয়ে তুলতে পারেন কবিতার পাখিরালা। চূড়ান্ত ভাঁড়ামির সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিতে পারেন পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘকায় দার্শনিককে ঘোল খাইয়ে দেওয়ার মতো গভীর দর্শন। রাজাগজা থেকে পাগল, ভাঁড় আর দীনভিখারি, সকলের মনের অতল থেকে তিনি ডুবুরির মতো তুলে আনতে পারেন হিরে-জহরত। কারও প্রতি তিনি উদাসীন নন। এক-এক সময় মনে হয় আইন তাঁর নখদর্পণে, কিংবা আধুনিকতম মনঃস্তত্ত্ব অথবা ইতিহাস। তিনি খুনে-মস্তানের ভাষা জানেন, পাড়াবেড়ানো মাসিমার মতো মেঠো নিন্দেমন্দে অংশ নিয়ে হোহো করে হাসতে পারেন, যৌনাঙ্গ বা যৌনসংগম নিয়ে রসিকতা করতে কোনও শুচিবায়ু তাঁকে পীড়িত করে না। আবার সব কিছু থেকে সরে এসে, তিনি জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কন, আর তা আমাদের তানপুরার তারের মতো মন্দ্রিত করে দেয়, বেঠোফেন-এর 'মুনলাইট সোনাটা'-কে শব্দজাল দিয়ে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোল্‌রিজ-এর ভাষায়, তিনি 'সেরা শব্দকে' 'সেরা ক্রমানুযায়ী' সাজিয়ে দিতে পারেন।

সব মহাশিল্পীই তো এক অর্থে জাদুকর, রবীন্দ্রনাথের দমবন্ধ করা উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। তবু শেক্সপিয়র হয়ে থাকেন এক রূপকথার অশ্বারোহী। এই অপরিসীম প্রতিভার ব্যাখ্যা কী?

ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে সেন্সরের খাঁড়া, কিন্তু তাঁকে ছোঁয়া যায় না। তিনি দর্শকের গভীর গোপন স্বপ্ন আর ভয়কে নিয়ে খেলা করেন। প্রতিযোগী অন্য নাট্যকাররা অনেকেই যখন অনাহারের দিকে চলে যাচ্ছেন, প্রতিদিন কাঠের দেয়ালে ঘেরা গোলাকার মঞ্চশালায় তিনি দেড়-দু'হাজার লোককে টেনে নেন।

তারপর? বয়স পঞ্চাশ পেরোতে-না-পেরোতে মানুষটি নিজের ছোট্ট শহরে বাড়ি বানিয়ে অবসর নেন। কে তিনি? কী চেয়েছিলেন?

কবিতা ও নাটকগুলো ছাড়া তাঁর জীবনের তেমন কিছুই আমরা জানি না। শুধু দু'চারটি দলিল আমাদের হাতে; সম্পত্তির হিসেব। নামকরণ আর বিয়ের কাগজপত্র, অভিনেতার তালিকা (যাতে তাঁর নামও রয়েছে), অকিঞ্চিৎকর অ্যাফিডেভিট, ট্যাক্স বিল। তাঁর জীবৎকালে তিনি পরিচিত ছিলেন, ১৫৯৮ সালেই অ্যাডাম ডায়ারমন্থ বলে কোনও এক ব্যক্তি তাঁর দু'টি নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর দিনপঞ্জিতে এবং একাধিকবার উইলিয়াম শেক্সপিয়র নামটি লিখেছেন। ১৬১৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেন জনসন তাঁকে 'the wonder of the stage' এবং 'star of poets' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তথ্য-সাবুদ থাকতে থাকতে কেউ তাঁর জীবনী লেখার চেষ্টা করেননি। তাঁর মৃত্যুর চারশো বছর হতে চলল, অথচ আজও কয়েকটি নগণ্য আবিষ্কার ছাড়া বিশেষ কোনও আলো পড়েনি এই রহস্যময় সৃষ্টিকর্তার জীবনের ওপর। ফলে উত্তরাধুনিকতার তত্ত্বের বহু আগে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে Autonomy of the text-এর চমকপ্রদ উদাহরণ।

খুব 'সাধারণ', 'মধ্যবিত্ত' জীবন তাঁর। সেখানে এমন কিছু পাওয়া শক্ত যাতে যুক্তিসিদ্ধ যোগসূত্র স্থাপন করা যাবে তাঁর সময়োত্তীর্ণ সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে, যা বিস্ময়কর ভাবে বিশ্বজনীন আর বহুমাত্রিক, যা জ্বালিয়ে দেয় হাজার প্রদীপ, যা (জীবনানন্দের ভাষায় বলি) 'অমা-আঁধার ফিকে-আঁধার আলো-আঁধারের নিঃশব্দ নিরবচ্ছিন্ন মাখামাখির কত-শত চোরাপথের ভিতর দিয়ে'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যায় আমাদের। কত-শত মাংস-কৃমি খোঁটা সমারূঢ় অধ্যাপক তলিয়ে গেলেন টীকা তৈরি করতে করতে। সবচেয়ে দুঃখের কথা হল, যিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে জীবনের বিদ্যুৎপ্রবাহকে স্নায়ুশিরায় ধারণ করেছিলেন, তাঁকে নিয়ে চর্চা করল কাচের দেওয়ালের আড়ালে বসে থাকা, থিয়েটারে না-যাওয়া একদল বিচিত্র নাক উঁচু টীকাটিপ্পনিবিদ— যাঁরা 'শেক্সপিয়র পণ্ডিত' নামে খ্যাত।

উচ্চতায় তাঁর সমকক্ষ আছেন আরও কয়েকজন। হয়তো কালিদাস, দান্তে, লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলো, তলস্তয়; কিংবা রবীন্দ্রনাথ, বেঠোফেন, রেমব্রান্ট বা পিকাসো— কিন্তু মানুষের এত বড় প্রদর্শশালা আর কেউ তৈরি করতে পারেননি। ফিলিপ সিডনি তাঁর 'অ্যাপলজি ফর পোয়েট্রি'-তে বলতে চেয়েছিলেন কবি হচ্ছেন কল্পনার প্রোট্যাগোনিস্ট। শেক্সপিয়রের কল্পনাপ্রতিভা তাঁর প্রধান অস্ত্র। সেই সঙ্গে বাস্তব সম্পর্কে তীব্র অন্তর্দৃষ্টি। বাস্তব জীবন তাঁর শিল্পকে দিয়েছে সেই শক্ত ভিত, যা বহু বিমূর্ত সৃষ্টিকর্মকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। তাঁর হোমওয়ার্ক সীমাহীন। তাঁর দ্রুত ধাবমান পালক-কলমের পাশে টেবিলের ওপর রাখা আছে এডওয়ার্ড হল এবং হলিনশেড-এর 'ক্রনিকল', প্লুটার্কের স্যর টমাস নর্থ অনূদিত 'লাইভস', বোক্কাচ্চো-র 'দেকামেরন' অথবা অন্য কোনও সূত্রগ্রন্থ। আধুনিকতায় তিনি স্যামুয়েল বেকেট-এর চেয়ে কম নন, যেমন লিখেছেন পোলিশ সমালোচক য়্যান কট তাঁর 'শেক্সপিয়র আওয়ার কনটেম্পোরারি' বইতে। সময় তাঁর কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে।

কিন্তু মানুষটি, তিনি কি সত্যিই মেঘের আড়ালে নিরাসক্ত আর নৈর্ব্যক্তিক?

মৃত্যুযন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে অতলস্পর্শী গভীরতা। আর শেক্সপিয়র-কে?

১৫৯৬ সালের বসন্তে অথবা গ্রীষ্মে খবর পেলেন তাঁর এগারো বছরের একমাত্র ছেলে হ্যামনেট অসুস্থ। হয়তো তক্ষুনি ছুটে যেতে চেয়েছিলেন তিনি, হয়তো লন্ডনে নাটক নিয়ে ব্যতিব্যস্ত বলে যেতে পারেননি। ২২ জুলাই মারা গেলেন লর্ড চেম্বারলেন হেনরি কেরি, শেক্সপিয়রের কোম্পানির পেট্রন। অনিশ্চয়তার প্রভাব পড়েছিল অভিনেতাদের ওপর। এদিকে লন্ডনের নৈতিক আর শারীরিক ক্ষতি রোধ করতে থিয়েটারগুলো বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসছে আবার। সরাইখানাগুলোতে অভিনয় নিষিদ্ধ হল এবং ১৫৯৬-এর গ্রীষ্মে শহরের মঞ্চগুলো সাময়িক ভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা হল। কাজেই শেক্সপিয়রের দলের কোনও কোনও সদস্যকে রাস্তায় নামতে হল ফেবারশ্যাম ও অন্যত্র অভিনয় করার জন্য। 'কিং জন', 'হেনরি দ্য ফোর্থ' বা 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' লিখতে লিখতে স্ট্র্যাটফোর্ডে ছেলের অসুস্থতা বৃদ্ধির খবর পাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে যখন তিনি পৌঁছলেন, সে আর নেই। ১১ অগস্ট হোলি ট্রিনিটি চার্চে হ্যামনেটের শেষকৃত্যের সময় উপস্থিত ছিলেন তিনি। গির্জের রেজিস্টারে লেখা আছে: Hamnet filius Shakespeare।

সমকালীন নাট্যকার বেন জনসনের মতো পুত্রশোকে কবিতা লেখেননি উইলিয়াম শেক্সপিয়র, কোনও এলিজি নেই তাঁর। ভিক্তর য়্যুগো যেমন মেয়ের শোকে ব্যাকুল হয়ে কবিতা লিখেছিলেন, যা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন আরেক সন্তান-হারানো কবি রবীন্দ্রনাথ (বেঁচেছিল হেসে হেসে/ খেলা করে বেড়াত সে— হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কী হল তোমার?'), শেক্সপিয়রের তেমন কোনও রচনা পাওয়া যায় না। তিনি কি শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন?

এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডে মৃত্যু বারবার হানা দেয় ঘরে। শেক্সপিয়রের জন্মের বছর ১৫৬৪ সালে বুবনিক প্লেগে স্ট্র্যাটফোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদ্যজাত শিশু মারা যায়। হয়তো মা মেরি শেক্সপিয়রকে নিয়ে কয়েক মাসের জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে বাঁচানোর জন্য। চোদ্দো বছর বয়সে সাত বছর বয়সি বোন অ্যান-এর মৃত্যু দেখেছিলেন উইলিয়াম। তারপর একমাত্র পুত্রসন্তানের মৃত্যু। সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া সেকালের এক চিকিৎসকের দিনপঞ্জি থেকে জানা যাচ্ছে শোকে-দুঃখে পাগল হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসা বাবা-মা অথবা স্বামী-স্ত্রী'র কথা।

হ্যামনেটের মৃত্যুর পর চার বছর তিনি লিখলেন সবচেয়ে সূর্যোকরোজ্জ্বল কয়েকটি কমেডি: 'দ্য মেরি ওয়াইভ্স অফ উইন্ডসর', 'মাচ অ্যাডু অ্যাবাউট নাথিং', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'। কিন্তু দুঃখ হয়ে রইল তাদের কেন্দ্রকোরক। সম্ভবত হ্যামনেটের মৃত্যুর বছর লেখা 'কিং জন' নাটকে আছে সন্তানহারা এক মায়ের আত্মহত্যা করার ইচ্ছের কথা: 'Grief fills the room up of my absent child,/ Lies in his bed, walks up and down with me...' (তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হ্যামনেটের মৃত্যু যাতে তাঁকে পাগল করে না দেয়, তাই হয়তো তিনি কাজে ডুবে যান। অসামান্য এক কালপর্যায় শুরু হয় শেক্সপিয়রের সাহিত্যজীবনে। রবীন্দ্রনাথের মতোই কি অসহনীয় যন্ত্রণাকে অনুসৃজিত করে নিলেন তিনি? 'উইন্টার্স টেল' নাটকে এক প্রতিভাবান বালক ধীরে ধীরে শুকিয়ে ঝরে যায়।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল হ্যামনেটের মৃত্যুর চার বছরের মধ্যে 'হ্যামলেট' লেখার সিদ্ধান্ত। ডেনমার্কের রাজকুমারকে নিয়ে সম্ভবত টমাস কিডের লেখা সুপরিচিত এক এগারো বছরের পুরনো নাটক, যা হয়তো সবচেয়ে বেশি দিন অভিনীত হয়েছিল (যাতে শেক্সপিয়র নিজে অভিনয় করে থাকবেন)। অথবা নতুন করে মঞ্চায়িত হয়েছিল, তাকে আবার পুনর্নির্মাণ করলেন উইলিয়াম। ১৫৭৯ সালে, যখন তিনি হয়তো স্কুলে পড়েন, ফিলিপ সিডনি আলগা কাঠামোর অগোছালো পুরনো নাটকটিকে প্রবল বিদ্রুপ করেছিলেন।

কিন্তু শেক্সপিয়র? দর্শকের মনকে তাঁর চেয়ে বেশি কে বুঝবেন? তিনি নিশ্চয়ই পড়েছিলেন 'ইসতোয়ার ত্রাজিক' (১৫৭০) নামে ফ্রাঁসোয়া দ্য বেলফরে সংকলিত বিষাদান্ত কাহিনির ফরাসি সংকলনটি, ষোড়শ শতকে যেটির অন্তত দশটি সংস্করণ হয়। বেলফরে হ্যামলেটের গল্পটি নিয়েছিলেন দ্বাদশ শতকের শেষে 'ব্যাকরণবিদ স্যাক্সো' নামে এক ডেনিশ লেখকের লাতিন ভাষায় সংকলিত ডেনমার্কের ইতিহাস 'গেস্তা দানোরুম' থেকে। অতি পরিচিত এক নাটক ঘনবদ্ধ হয়ে উঠে পুনর্জন্ম নিচ্ছে ধীরে ধীরে জীবনশিল্পী হিসেবে পূর্ণতাদীঘল হয়ে ওঠা স্ট্র্যাটফোর্ডের সেই ছেলেটির হাতে। আগেও যেমন 'রিচার্ড দ্য থার্ড' নাটকে দ্বিধা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ছিল: 'What do I fear? Myself? There's none else by/ Richard loves Richard; that is, I am I/ Is there a murderer here?/ No, Yes, I am.' (পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য)। কিন্তু তা ছিল আড়ষ্ট, কৃত্রিম। এবার মনের গহন অবচেতন যন্ত্রণাক্ত অন্তর্জগতকে উন্মোচিত করে দিলেন তিনি।

পুঁজ আর বিষে ভরা এক চূর্ণ্যমান পৃথিবীতে দ্বিধাদীর্ণ এক একাকী মানুষ।

সে কী করবে?

সে কোথায় রাখবে পা? জ্বরের ঘোরে তর[illegible] কেঁপে [illegible]ায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক্সপ্রেশনিস্ট ছবির মতো তার অন্তস্পট সময়ের গায়ে চিরকালের মতো আঁকা হয়ে রইল।

সন্তান হ্যামনেটের মৃত্যু আর 'হ্যামলেট' নাটকে সন্তানের পিতার মৃত্যু ('the thousand natural shocks that flesh is heir to') কি এক রাগিণীরেখায় গিয়েছিল মিশে?

১০ মার্চ ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬

ঘুমের উতরোল ঢেউ পার হয়ে এক আধো-অন্ধকারে তিনি পাশ ফিরে বসে। মুখে অনন্ত যন্ত্রণার দাগ।

সামনে আলোয় ভাসমান কয়েকটি উজ্জ্বল, সুন্দর মুখ। ছবিতে হাজার বার দেখা শেলি আর কীট্‌স। ফরাসি লাল মদ খেতে খেতে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন লর্ড বায়রন।

কিন্তু পিছনের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটি একা। জামাকাপড় ময়লা, পায়ে চটি নেই। আফিম-খাওয়া চোখ তুলে বললেন, 'উইলিয়াম কোথায়? ওকে দেখছি না।'

বেঠোফেন আর উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর চেয়ে দু'বছরের ছোট স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪)। একটি সম্পূর্ণ ('রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার') আর দু'টি অসম্পূর্ণ ('ক্রিস্টাবেল' এবং 'কুবলা খাঁ') কবিতার জোরে যিনি অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছেন স্বয়ং দান্তে আর শেক্সপিয়রের পাশে, মনে করেন বিশিষ্ট সমালোচক জি উইলসন নাইট। শেলি তাঁকে বলেছেন 'hooded eagle'। অন্ধকারে লুকিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছেন বায়রন। কীট্‌স উত্তেজনায় শিউরে উঠেছেন তাঁর সঙ্গে পথ হাঁটতে পেরে।

ইংল্যান্ডের ডেভনশায়ারে ওটার নদীর ধারে ওটারি-সেন্ট মেরি গ্রামের সদা-ক্ষুব্ধ এক বালক, যে মায়ের ওপর হম্বিতম্বি করে, ভাইদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। কিন্তু বাবার হাত ধরলেই সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। দরিদ্র পিতা ধর্মযাজক জন কোলরিজ ছিলেন কেমব্রিজের মেধাবী ছাত্র। দশটি সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ স্যামুয়েল শীতের সন্ধেয় তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে হেঁটে আসতে আসতে তাঁর কাছে অজানা তারাদের রহস্যময়তার কথা শোনেন ('My mind has been habituated to the Vast')। রাতে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি— 'armies of ugly things'। একদিন তিনি ছুরি নিয়ে তাড়া করেন তাঁর দাদাকে, তারপর ইংল্যান্ডের মারাত্মক ঠান্ডায় নদীর ধারে সারা রাত শুয়ে থাকেন, কোনও দিন জাগবেন না জেনে কোনও দিন আর। পরদিন সকালে ঘরে ফিরে তিনি দেখেন, তাঁর বাবার চোখ থেকে গড়িয়ে নেমে আসছে অশ্রু, যা তিনি কোনও দিন ভুলতে পারেননি। তারপর ন' বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই মায়ের আর্তনাদ শুনে বালকটি ধড়মড় করে উঠে বসে: তার একমাত্র বন্ধু বাবা আর নেই।

এক আশ্রয়হীনতার বোধ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। লন্ডনের ক্রাইসট্স হসপিটাল স্কুলে তাঁর ছুরির ফলার মতো মেধা আর কথনক্ষমতাতে মুগ্ধ হন দুই সহপাঠী লি হান্ট আর চার্লস ল্যাম্ব। কেমব্রিজের জিসাস কলেজে (১৭৯২-'৯৪) ফরাসি বিপ্লব নিয়ে তর্কবিতর্ক লেখাপড়ায় বাদ সাধল। পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পুরস্কার না-পেয়ে এবং প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মদ্যপান শুরু করলেন স্যামুয়েল, শুরু করলেন গণিকালয়ে যাওয়া। অবশেষে ১৭৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মিলিটারিতে যোগ দিলেন কোলরিজ। পাগলামির অজুহাতে কোনওমতে তাঁকে ছাড়িয়ে আনলেন দাদা জর্জ।

১৭৯৪-এর গ্রীষ্মে অক্সফোর্ডে দেখা হল কবি রবার্ট সাদি-র সঙ্গে। 'প্যান্টিসোক্রেসি' নামে সাম্যবাদের এক অভিনব প্রকল্পের জন্য প্রচণ্ড খাটাখাটনি করলেন দুই বন্ধু। এই দার্শনিক-রাজনৈতিক উদ্যোগের সঙ্গেই চলছিল সারা আর ইডিথ নামে দুই বোনকে প্রেম-নিবেদন। কবিতা প্রকাশ করলেন কোলরিজ, গডউইন ও অন্যান্য র‍্যাডিকালদের নিয়ে সনেট, যৌথভাবে লিখলেন রবেসপিয়েরের মৃত্যু নিয়ে নাটক (১৭৯৪)। তারপর মামুলি কারণে ঝগড়া হয়ে গেল সাদি আর কোলরিজের। কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা আর চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে কাজ করার আশ্চর্য ক্ষমতা স্যামুয়েলের। তাঁর সম্পাদনায় র‍্যাডিক্যাল খ্রিস্টীয় কাগজ 'দ্য ওয়াচম্যান'-এর দশ-দশটি সংখ্যা প্রকাশিত হল, ছাপা হল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অস্থির কম্পমান এক আত্মা, আফিম তাঁর যন্ত্রণাকে চতুর্গুণ করে তোলে।

অতঃপর কালপুরুষের অলৌকিক সুতোটানে কী জানি কী মহালগনে তাঁদের দেখা হল, কোলরিজ আর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের! চির-অতৃপ্ত কোলরিজকে মৃত্যু উপত্যকা থেকে কে আর বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন প্রাজ্ঞ আর সুস্থির ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ছাড়া? ১৭৯৭ সালের জুনে রেসডাউন, ডরসেটে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থদের সঙ্গে হেঁটে দেখা করতে এলেন কোলরিজ। যদি না-আসতেন, ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্লিখিত হত না।

আঠেরো শতকের শেষে ইংল্যান্ডে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কোলরিজের সৃজনময় বন্ধুত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়; অন্যদিকে, উনিশ শতকের শেষে ফ্রান্সে ভের্লেন-র‍্যাঁবো-র সম্পর্ক ছিল সংঘাতে ভরা। একযোগে কাব্যিক বচনকে পুনর্নির্মাণ করলেন দুই ইংরেজ বন্ধু, যদিও তাঁদের পারস্পরিক মিল ছিল না বললেই চলে। তাঁরা একসঙ্গে পাহাড়ে হাঁটছেন, কবিতা আর ফরাসি বিপ্লবোত্তর সমকালীন সমাজ নিয়ে কথা হচ্ছে তাঁদের। ১৭৯৭ সালের জুলাই থেকে ১৭৯৮-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে দুই বন্ধু আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বোন ডরোথি একযোগে কাজ করেছেন। খাওয়ার টেবিলের দুই প্রান্তে বসে দুই কবি দু'রকম ভাবে পালটে দিচ্ছেন কবিতার ভাষা। যে টি-পট থেকে চা ঢালছেন ডরোথি, তিনি তাকে ডাকছেন 'কুব্‌লা' বলে।

কোলরিজ লিখছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো: 'ফ্রস্ট অ্যাট মিডনাইট' 'ফিয়ার্‌স ইন সলিচ্যুড', 'কুব্‌লা খাঁ'...। পাহাড়ে হাঁটার খরচা তুলতে দু'জনে মিলে কাগজে একটি কবিতা লেখার কথা ভাবলেন, বিষয়টি হবে একটি অ্যালবাট্রসের হত্যা। লিখতে শুরু করেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বুঝলেন কোলরিজ আস্তে আস্তে এক জাদুবয়ান তৈরি করছেন। তিনি নিঃশব্দে সরে গেলেন, আর কোলরিজ কয়েক মাস ধরে শেষ করলেন 'রাইম অফ দ্য এন্‌সিয়েন্ট মেরিনার'। 'হ্যামলেট' আর 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' ছাড়া এর মতো বহুমাত্রিক কি কিছু লেখা হয়েছে ইংরেজিতে?

ঝড়ের মধ্যে একটি জাহাজ, যাতে কোনও কর্ণধার নেই! একটি অ্যালবাট্রস চূড়ান্ত বিপদ থেকে জাহাজটিকে রক্ষা করে, অথচ অকৃতজ্ঞ নাবিক তাকে হত্যা করে। এক প্রাচীন নাবিক যার গলায় ঝুলছে একটি পাখির শব। এ যেন শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়।

আর লিখছেন এক অদ্ভুত কবিতার অংশ (fragment), 'ক্রিস্টাবেল'। এক মধ্যযুগীয় দুর্গে মধ্যরাতে এক নারীর আরেক নারীকে বশীকরণের কাহিনি। ক্রিস্টাবেল কে? ওক গাছের পিছনে জেরালডিন-ই বা কে? গাছটি কি পুরুষাঙ্গের প্রতীক? দ্বিতীয় নারীটি কি ভ্যাম্পায়ার? এ কি কৌমার্য হারানোর চিত্রমালা, বিকল্প সত্তার উপাখ্যান, না মানবমনের বিপ্রতীপতার গহন অন্বেষণ? এ কি এই নিরাপত্তাহীন পৃথিবীতে মানুষের আপন সত্তা হারানোর ভয়ংকর গল্প।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ তো আঠেরো শতকের শেষের নয়, আজকের মানবাবস্থার আবিষ্কারমালা। এ কি বিশ শতকের অস্তিত্ববাদের— কাফকা বা সার্ত্র-র— উৎকণ্ঠা-ভরা বয়ানের পূর্বসূরি নয়?

'কুবলা খাঁ'-তে কোলরিজ দেখালেন মানুষ পৃথিবীতে স্বর্গ বানাতে পারে না, শুধু কল্পনায় ছাড়া।

১৭৯৮ সালে প্রকাশিত হল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর কোলরিজের বৈপ্লবিক কবিতা-বই 'লিরিকাল ব্যালাড্‌স', যা সূচিত করল ইংরেজি কবিতার রোমান্টিকতাকে। কিন্তু ১৮০০ সালে লেখা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিখ্যাত মুখবন্ধ কি ছুঁতে পারল কোলরিজের বহুস্তরান্বয়ী জটিল মনকে? রোমান্টিকরা যদি শান্তি ও স্বস্তির সন্ধানে প্রকৃতির কাছে ফিরে গিয়ে থাকেন, তবে কোলরিজের কবিতায় প্রকৃতি এত নিরাপত্তাহীন কেন? কেন চাঁদ ফ্যাকাশে ('pale and dull'), কেন জল পচে যায়, এমনকী জল? 'The very deep rot: O Christ!/ That even this should be!/ Yea, slimy things did crawl with legs/ Upon the slimy sea.

'লিরিকাল ব্যালাড্‌স' প্রকাশিত হওয়ার পর দু'জনে চলে গেলেন জার্মানি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ চাইলেন প্রকৃতির নতুন করে অনুধাবন করতে, চাইলেন আত্মখনন। আর কোলরিজ? তিনি ছড়িয়ে পড়তে চাইছেন অসীম শূন্যে শুনতে যাচ্ছেন বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা, লিখছেন জার্মান, পড়ছেন কান্ট, শিলার এবং শেলিং! শেলিং-এর রচনায় অবচেতনের পাতালঢেউয়ের কথা পড়তে পড়তে নিজেরই 'প্রাচীন নাবিকের গাথা'-র কথা কি মনে পড়েছিল তাঁর?

হুড়মুড় করে পৃথিবী ভেঙে পড়ছে তাঁর মাথায়। ঘর ভেঙে যাচ্ছে। স্ত্রী সারা নয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শালি সারা তাঁকে মথিত করে দিচ্ছেন। হতাশার কালো ঢেউ তলপেট থেকে উঠে এসে সাঁড়াশি দিয়ে ধরতে চাইছে তাঁকে। আফিম কোথায়, আফিম? আ—

লিখছেন, 'ডিজেকশন: অ্যান্ড ওড'। নোটবুক লিখছেন বাঁচার জন্য। লেখা বন্ধ করে দিচ্ছেন, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন মালটা-য়।

উদ্ভ্রান্তের মতো ফিরে আসছেন আবার। কোলারটনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থদের বাড়িতে উঠছেন। ১৮০৮ সালে কবিতা আর নাটক নিয়ে বক্তৃতা তৈরি করছেন, সারা হাচিনসনের সঙ্গে সম্পাদনা করছেন 'দ্য ফ্রেন্ড' পত্রিকার আঠাশটি সংখ্যা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে তবু। শঙ্খ ঘোষের কবিতার ভাষায়, 'কুয়াশা ভেঙে জেগে উঠছিল রাশি রাশি নাম-না জানা কবর'। আফিমের সঙ্গে সমুদ্রবাস করছেন কোলরিজ। তারপর এল ১৮১০ সালের সেই বিভীষিকাময় দিন: ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে বিবাদ। হিংস্র ও ক্ষমাহীন। 'তুমি নাকি আমাকে rotten drunkard বলেছ?' 'আমি!' 'আমি শুনেছি। তুমি, তুমি!'

কোলরিজ চিরকালের মতো তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন লন্ডন। দুঃস্বপ্ন, অবসাদ, ফুঁপিয়ে কান্না, হিস্টিরিয়া, দৃষ্টিবিভ্রম। হাত-পা কেটে চলে যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে। আ—

লন্ডনের স্ট্র্যান্ডে একটি গা-ছমছমে বাড়িতে পুতিগন্ধময় পরিবেশে ছেঁড়া জামা গায়ে ইংল্যান্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আর বিচলিত না হয়ে তাঁর শুশ্রূষা করছেন মরগ্যান পরিবার! কোলরিজকে শান্ত করার জন্য তাঁরা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন শহরের বাইরে। আস্তে আস্তে ছাইয়ের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। একদিকে ব্যর্থতা, বিলম্ব, শক্তিহীনতা, হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন, ঝগড়া, আত্মবিলাপ, অনুশোচনা, আফিম, মদ্যপান, অসমাপ্ত কবিতা...। অন্যদিকে, এক গভীর ঐশ্বর্যশালী বহুস্তরান্বয়ী মন, ইংরেজি সাহিত্যে যার তুলনা মেলা ভার। নভেম্বর ১৮১১ আর জানুয়ারির ১৮১২-র মধ্যে লন্ডন ফিলজ়ফিক্যাল সোসাইটি-তে শেক্সপিয়র এবং মিলটনের ওপর পনেরোটি বক্তৃতা দেন কোলরিজ। সেই বক্তৃতা শুনতে ওভারকোটের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকেন বায়রন। শেক্সপিয়রের নাটক নয়, তাঁর মনকে বুঝতে চাইলেন তিনি, যা তাঁর আগে আর কেউ করেননি।

ধর্মবিশ্বাস ফিরে আসছে আস্তে আস্তে। তিনি খোলাখুলি তাঁর মাদকাশক্তির কথা স্বীকার করছেন, লিখতে শুরু করছেন আবার। বাইরের শত্রু তো থাকবেই, যেমন উইলিয়াম হ্যাজ়লিট, কিন্তু ভিতরের শত্রুকে জয় করতে চাইছেন তিনি। 'এনশিয়েন্ট মেরিনার'-এর পার্শ্বটীকা লিখছেন, প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর কবিতাসংগ্রহ এবং আত্মজীবনী, দর্শন ও সাহিত্যভাবনার সেই মহাগ্রন্থ যার নাম 'বায়োগ্রাফিয়া লিটরারিয়া'— যা কীটসের চিঠিপত্রের মতোই অভ্রময়।

ছন্দ আর সহজ শব্দকে নিয়ে এমন অনায়াস কড়িখেলা ক'জন খেলেছেন আমার জানা নেই। নিপুণ তুলিটানে তিনি বানিয়ে তুলতে পারেন এক স্থিরচিত্র: 'All in a hot and copper sky./ The bloody Sun, at noon,/

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Right up above the mast did stand,/ No bigger than the Moon,/ Day after day, day after day,/ We stuck, nor breath nor motion;/ As idle as a painted ship/ Upon a painted ocean.' কিন্তু তিনি তো শুধু কবি নন, দ্রষ্টা, যিনি ঘুম-নীল অন্ধকার সাঁতরিয়ে ধমনীতন্তুকে স্পর্শ করতে চান। আমাদের শূন্যতা আর উৎকণ্ঠার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনের মূল্য ও তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে চান, বুঝতে চান কীভাবে নির্মিত হয় সত্তার রহস্য। ছুঁতে চান যা ছোঁয়া যায় না।

তাঁর মৃত্যুর পর চার্লস ল্যাম্ব লিখেছিলেন: "(He) long had been on the confines of the next world- *he had a hunger for eternity.*"

বুদ্ধদেব বসু দুঃখ করেছেন, বোদল্যের পো পড়েছিলেন, কিন্তু কোলরিজ পড়েননি।

কবিতার ছেঁড়া পাতা হাতে এই জীবাশ্মপ্রহত নাবিকের দু'টি বিদ্যুৎদীপ্ত উক্তি আজ আবার আমাদের ছিঁড়েখুঁড়ে দিক

In looking at objects of Nature while I am thinking, as at yonder moon dim-glimmering thro' the dewy window-pane, I seem rather to be seeking, as it were *asking*, a symbolical language for something within me that already and forever exists...

I would compare the Human Soul to a ship's crew cast on an Unknown Island.

হা ঈশ্বর! কত অযুত-নিযুত বছর ধরে এই অভিজ্ঞান আমরা সাদা পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ দেখতে চেয়েছি!

২৪ মার্চ ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭

চারপাইয়ের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে একটি লোক শুয়ে আছে। পাশে একটি হুঁকো। এমন সময় "একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল 'মেও'।"

ও আপনি! প্রথমে চিনতে পারিনি।

'মসীচিত্রিত পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে' বাঁধা কতগুলো কাগজ উড়ে এসে পড়েছে পায়ের কাছে। এগুলো তো ভীষ্মদেব খোশনবীসের কাছে জমা দিয়ে সে কোথায় চলে গিয়েছিল আর ফেরেনি, ঘুমের মধ্যে মনে পড়ল আমার।

তাতে লেখা:

> এখন জানিয়াছি যে এ অরণ্যে পথ নাই; এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে।

অন্যটিতে লেখা:

> বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না। পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না— বাঁশী ফাটিয়াছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৭, মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে ছাপা এবং ২, ভবানীচরণ দত্ত লেন থেকে বাংলা ১২৯২, ইং ১৮৮৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত' কি উনিশ শতকের বাঙালির মানবভাবনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল? শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্কিম-জীবনীতে লিখেছেন, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন পুস্তকখানিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?' বঙ্কিম একটুও চিন্তা না করে হাসতে হাসতে বললেন, 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

ঔপন্যাসিক আর প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর প্রতিভার তুঙ্গে দাঁড়িয়ে ১৮৭৩ সালে এই দার্শনিককে নির্মাণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি কি নতুন এক প্রকাশমাধ্যম খুঁজছিলেন? 'বিষবৃক্ষ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে ১৮৭৩, 'চন্দ্রশেখর' ১৮৭৫, 'রজনী' ১৮৭৭, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১৮৭৮, 'আনন্দমঠ' ১৮৮২ এবং 'দেবী চৌধুরাণী' ১৮৮৪ সালে। আর এর পাশাপাশি এক স্পষ্টবক্তা ভাবুকের তীব্র এক বয়ান: 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪)। তাঁর প্রধান ট্রিটিজ় 'সাম্য' প্রকাশিত হবে ১৮৭৯ সালে। কিন্তু তবু ভিন্নতর এক প্রকাশের সন্ধানে লিখলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ভাষ্য 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৬)।

এই 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সঙ্গে 'কমলাকান্তের পত্র' এবং 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' মিলিয়ে 'কমলাকান্ত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে।

প্রথম থেকেই গভীরতা এবং লঘুতাকে মিশিয়ে দেওয়ার এক আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তাঁর। এবার প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত রম্যরচনার সঙ্গে মিলেমিশে গেল জার্নাল, স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্ম হাস্যরস। উপন্যাস বা প্রবন্ধে কখনও উঁচু থেকে কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কিন্তু কমলাকান্তের সঙ্গে পাঠক এই প্রথম গাঁয়ের কথকের মতো এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে চলে আসেন। 'আফিমের অসীম মহিমা' কি বঙ্কিম অনুধাবন করেছিলেন টমাস ডি কুইন্‌সি-র (১৭৮৫-১৮৫৯) 'কনফেশন্‌স অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম-ইটার' পড়ে?

দুর্বল, অসুস্থ, অর্থাভাবতাড়িত, নিঃসঙ্গ ও বিষাদগ্রস্ত ডি কুইন্‌সি, বিরাট প্রতিভা নিয়ে পনেরো বছর বয়সে অক্সফোর্ডে গিয়ে পড়াশোনা না শেষ করতে পারা 'দ্য ওয়েস্টমরল্যান্ড গেজেট'-এর সম্পাদক হিসেবে অনির্ভরযোগ্য ডি কুইন্‌সি-র সঙ্গে কি কমলাকান্তের চরিত্রের কোনও মিলই নেই?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বলিত, কি করিত, তার স্থিরতা ছিল না।

...কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত—আপিসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্ষপীয়ার নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত; বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। ('কমলাকান্তের দপ্তর', শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীসের ভূমিকা)

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলেছিল, সে 'সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনো মিছা বলে না।' এই ছদ্ম উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে হাটে-বাজারে এই বাঙালি সক্রাতেস-কেই তো খুঁজছি আমরা।

আরেক আফিমখোর কোলরিজ-এর প্রাচীন নাবিকের মতো কথা বলার অসম্ভব জাদুক্ষমতা তাঁর। কমলাকান্তের উপস্থাপনার সহজিয়া ভঙ্গিটি বড় মধুর করেছেন বঙ্কিম। কিন্তু সিনিসিজ়ম ও বিষণ্ণতাকে অতিক্রম করে চর্বিত-কথনকে (Plateetud, Plateetud,) আক্রমণ করে ('কাকাতুয়া'), তিনি যে নতুন নির্মাণকে তুলে ধরছেন তা নিশ্চয়ই সেই যুক্তিশাসিত মানব-প্রকল্প যা ওগ্যুস্ত কঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) ও জন স্টুয়ার্ট মিল-এর (১৮০৬-১৯৭৩) দর্শনচিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁদের হিতকারী মানবভাবনায় অংশগ্রহণ না করে পারেন আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তক?

কঁৎ-এর 'কোর্স অন পজ়িটিভ ফিলজ়ফি' (ছয় খণ্ড, ১৮৩০-১৮৪২) তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তা হয়ে ওঠে সামাজিক পুনর্ভাবনার অঙ্গ। আর কঁৎ-প্রাণিত বঙ্কিম 'লোকরহস্য'-র পাশাপাশি লেখেন 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫)। আর মিল? মিল বলছিলেন স্বাধীনচেতা মনের কথা, বাকস্বাধীনতার কথা, নারী-অবমাননার কথা, সুখের উচ্চ-নীচ শ্রেণি-বিভাগের কথা (higher and lower pleasures)।

'আত্মাদর' (I'amour-propre, যাকে মানুষের প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেছেন ষোড়শ শতকের ফরাসি মরালিস্ট লা রশফুকো, বঙ্কিমের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এ যাঁর উল্লেখ আছে)-কে অতিক্রম করে 'অন্যের জন্য বাঁচা'-র কথা বলে কমলাকান্ত:

> প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

কিংবা সেই অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি:

> পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

একদিকে, গীতিকবিতার মতো স্বপ্নিল তার ভাষা। অন্য দিকে তা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য এক মায়ামুকুর। তীব্র আর প্রতীকী।

কমলাকান্তের 'বড় বাজার' এক শতাব্দী অতিক্রম করে আজকের উদরতন্ত্রী বিশ্ববাজারটির কাপড় খুলে নেয়। বাংলা সাহিত্যের বাজারে গিয়ে সে 'বিক্রেয় পদার্থ' দেখে—

> জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কিসের দোকান?'
> বালকেরা বলিল, 'বাঙ্গালা সাহিত্য।'
> 'বেচিতেছে কে?'
> 'আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছে। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।'
> 'কিনিতেছে কে?'
> 'আমরাই।'
> বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল।
> দেখিলাম— খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।...
>
> তার পরে যশের ময়রাপীঠ। সম্বাদপত্রলেখক নামক ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া নগদ মূল্যে করিতেছে বিক্রয়— রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে— মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার— কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না— কেবল এক সর্বপ্রাণীভীতিসাধক অনন্ত গর্জন শুনিতে পাইলাম— অল্পলোকে দ্বারে ফলকলিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।
বিক্রেয়— অনন্ত যশ।
বিক্রেতা— কাল।
মূল্য— জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।
আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম— আমার যশে কাজ নাই— কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম— দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়— ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে,— ছাগ, মেষ ও গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, 'এও গোরু, কাটিতে হইবে।' আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

সার কথাটা হল: 'আমার মন কোথায় গেল? কে লইল?'

কমলাকান্ত, এবার উঠুন। এই অসহায় পৃথিবীতে আপনাকে আমাদের ভীষণ প্রয়োজন।

৭ এপ্রিল ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৮

অন্ধকারের ভেতর কার যেন চোখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। অন্ধকারে কি রক্তের রং চেনা যায়? আমি ঘুমের মধ্যে ফিসফিস করে বলি, রক্ত পড়ার কোনও শব্দ হয় না, শুধু এক নিঃশব্দ কান্না ক্ষীণ জলপ্রপাতের মতো ঝরে পড়ে।

ঝলমলে পোশাক পরা একটি কন্দর্পকান্তি লোক তার ডান চোখ থেকে দু' ইঞ্চি ঢুকে যাওয়া ছুরিটি বের করার চেষ্টা করছে।

তারপর আকাশ-মাটি বিদীর্ণ করে একটি আর্ত চিৎকার মহাশূন্যে নীল তারা হয়ে আটকে গেল।

আমি শিউরে উঠলাম। মৃত্যুর আগে কি লোকটি একটি প্রকাশ-অযোগ্য কটূক্তি করেছিল, যা ইস্পাতের ফলার মতো ধারালো আর কঠিন?

৩০ মে ১৫৯৩ ইংল্যান্ডের ডেপ্‌টফোর্ডে ডেম ইলিয়ানোর বুলের বাড়িতে খুন হওয়া ২৯ বছর বয়সি লোকটি নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো, শেক্সপিয়রের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী। লন্ডনের বাইরে ওই শহরে কী করছিলেন তিনি? শুধু প্লেগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গিয়েছিলেন সেখানে?

১৯২৫ সালে লন্ডনের পাবলিক রেকর্ডস অফিসে লাতিনে লেখা মৃত্যু-তদন্তের যে সরকারি প্রতিবেদনটি পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে জানা যাচ্ছে সেদিন সেখানে ছিলেন মার্লো ছাড়াও রানির গোপন পত্রবাহক এবং অভিজ্ঞ সরকারি প্রতিনিধি রবার্ট পলি, মার্লো-র পৃষ্ঠপোষক এবং সদ্যপ্রয়াত স্যর ফ্রান্সিস ওয়ালসিংহ্যাম-এর (যিনি গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করতেন) ভাই টম ওয়ালসিংহ্যাম-এর (যিনি নিজে গুপ্তচর ছিলেন এবং যাঁকে তাঁর কাব্য 'হিরো অ্যান্ড লিয়েন্ডার'-এর একটি সংস্করণ উৎসর্গ করেছিলেন মার্লো) ব্যক্তিগত ভৃত্য ইঙ্গগ্রাম ফ্রিজার। ওই গোপন প্রতিবেদনের বয়ান অনুযায়ী:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

After supper the said Ingram & Christopher Morley were in speech and uttered one to the other divers malicious words for the reason that they could not be at one nor agree about the payment of the sum of pence... the said Christopher Morley then and there maliciously gave the aforesaid Ingram two wounds on his head...

So it befell in that affray that the said Ingram, in defence of his life, with the dagger aforesaid to the value of 12d, gave the said Christopher then & there a mortal wound over his right eye of the depth of two inches & of the width of inch; of which mortal wound the aforesaid Christopher Morley then & there instantly died...

অর্থাৎ সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিল-সংক্রান্ত বিবাদের ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে এই হত্যাকাণ্ড! পুরো প্রতিবেদনটি যে চতুরভাবে সাজানো তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু কেন এই ষড়যন্ত্র?

শেক্সপিয়রের থেকে দু' মাসের বড়, ক্রিস্টোফার মার্লো-র ব্যাপ্টিজ়ম হয় ক্যান্টারবেরি-র সেন্ট জর্জ দ্য মার্টার গির্জায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৫৬৪ (স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-অ্যাভনে শেক্সপিয়রের নামকরণের ধর্মানুষ্ঠান হবে ২৬ এপ্রিল)। সমকালীন নাট্যকার জর্জ পিল-এর ভাষায়, 'The Muses' Darling', কবি ড্রেটনের ভাষায়, 'Marlow, bathed in Thespian springs'; টেনিসন লিখেছিলেন 'If Shakespeare is the dazzling sun of this mighty period, Marlowe is certainly the morning star.' শেক্সপিয়র যদি হন ওই শক্তিশালী সময়ের চোখ-ধাঁধানো সূর্য, মার্লো তবে নিশ্চয়ই সকালবেলার তারা।

ক্রিস্টোফার মার্লো-র (১৫৬৪-১৫৯৩) বাবা ছিলেন একজন জুতো-নির্মাতা। কাজেই জন্ম থেকেই শুরু হয়েছিল লড়াই, শূন্যতার বিরুদ্ধে। স্কলারশিপ পেয়ে প্রথম পড়লেন ক্যান্টারবেরি-র কিংস স্কুলে, পরে সতেরো বছর বয়সে কেমব্রিজে করপাস ক্রিস্টি কলেজে। অসীম প্রতিভাবান, কিন্তু মূলস্রোতের বাইরে। আগুন জ্বলছে [illegible] মাথা [illegible] মাঝে দীর্ঘ সময়ের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য ক্লাসে আসেন না। দৈবাৎ এলে যিশু খ্রিস্ট ও তাঁর মা সম্পর্কে অকল্পনীয় কটু কথা বলেন। কে প্রতিবাদ করবে? কলেজের রেকর্ড থেকে জানা যায় খানাপিনায় তিনি যে খরচ করেছেন তা এক দরিদ্র জলপানি পাওয়া ছাত্রের আয়ত্তের বাইরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তি সত্ত্বেও সম্ভবত রাজসভার সুপারিশে ('faithful dealing' এবং 'good service to the Queen') এম এ ডিগ্রি পান (১৫৮৭)। কেমব্রিজে থাকতে থাকতেই লেখেন 'দ্য ট্র্যাজেডি অফ ডিডো, কুইন অফ কার্থেজ'। লেখেন ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে তখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ইংরেজি নাটক 'ট্যাম্বারলেন' প্রথম ভাগ (১৫৮৭) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৫৮৮)। তারপর 'দ্য জু অফ মালটা', 'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড' এবং ষোড়শ শতকের ইংরেজি নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ শরীর ও শয়তানকে নিয়ে নাটক 'ডক্টর ফসটাস', যা একটি যুগের সর্বগ্রাসী জিজ্ঞাসা ও দুঃসাহসিক অনুসন্ধানের উদাহরণ হয়ে থাকবে। অনুবাদ করেন ওভিদের 'এলিজিজ়' 'আমোরেস', এবং লুকান-এর 'ফারসালিয়া'। লিখলেন অবিস্মরণীয় প্রেমের কবিতা 'হিরো অ্যান্ড লিয়েন্ডার' (যা তাঁর মৃত্যুর পর শেষ করে প্রকাশ করেন চ্যাপম্যান)। লেখেন শিশির স্নিগ্ধ প্রেমের গান 'The Passionate Shepherd to his Love' ('Come live with me, and be my love/And we will all the pleasures prove/ That hills and valleys, dales and fields,/ Woods on sleepy mountain yields/ And we will sit upon the rocks, seeing the shepherds feed their flocks/ By shallow rivers, to whose falls/ Melodious birds sing madrigals.')।

প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক ছাত্র 'স্প্যানিশ ট্রাজেডি'-র স্রষ্টা টমাস কিড ইংরেজি নাটকে এনেছিলেন প্লট ও ঘটনার ঘনঘটা। মার্লো আনলেন চরিত্র। তৈরি করার চেষ্টা করলেন সুবিন্যস্ত এক ভাষাজাল, যা প্রস্তুত করবে শেক্সপিয়রের কথনসৃজনের জমি। নাটকীয় সংলাপের আদান-প্রদানে বৈদ্যুতিক গতি আনবেন 'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড' নাটকে। তাঁর নাটকগুলোতে যেন ক্রমশ সেই স্বর 'যে স্বর স্বরের চেয়ে শরীরের আরও কাছাকাছি।' ('শবের উপরে শামিয়ানা', শঙ্খ ঘোষ)। শেক্সপিয়র তাঁর এই প্রিয় 'dead shepherd'-এর কাছে কম ঋণী নন।

সমবয়সি শেক্সপিয়র যখন পথ খুঁজে চলেছেন, মার্লো-র নাটক তখনই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিপুল সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করছে লর্ড অ্যাডমিরাল্‌স কোম্পানি। তাঁর চরিত্রদের (ট্যাম্বারলেন বা জুনিয়ার মর্টিমারের) মতো তিনি যেন আগুনঝড়। প্রধান চরিত্রগুলোতে অভিনয় করছেন সাত ফুট লম্বা এডওয়ার্ড অ্যালেন। মার্লো-র নিজের পক্ষেও সেইসব নাটকে কখনও কখনও অভিনয় করা অসম্ভব নয়। মাত্র পাঁচ বছরে নাটককে সাবালক করে দিয়েছিলেন তিনি।

চতুর্দশ শতকে ইতালীয় রনেসাঁস যেন ঘুমভাঙানিয়া গান। রনেসাঁস মানে নতুন করে বেঁচে ওঠা, রনেসাঁস মানে চোখ খুলে যাওয়া, রনেসাঁস মানে 'জাগিয়া উঠিল প্রাণ'। ইউরোপীয় নবজাগরণের মহাশিল্পীরা, দান্তে, পেত্রার্কা, লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলো, মাকিয়াভেল্লি, মঁতেন, শেক্সপিয়র ও মার্লো নতুন করে পৃথিবী ও মানুষকে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। এই নতুন আত্মানুসন্ধানের কেন্দ্রে মানুষ, সীমাহীনভাবে মানুষ। মিকেলাঞ্জেলো এবং লেওনার্দো মধ্যরাতে সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে কবর খুঁড়ে শবব্যবচ্ছেদ করেছেন মানুষকে জানার জন্য। পিকো দেল্লা মিরানদোলা-র 'মানুষের মর্যাদা' (De hominis dignitate) বিষয়ক বক্তৃতা (১৪৮৬) যেন রনেসাঁসের বীজমন্ত্র। 'আমি কে? আমি কী জানি?' এই জ্ঞানতৃষ্ণার কোনও শেষ নেই, জানার জন্য তাঁরা শেষ পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত। আর মার্লো যেন রনেসাঁসের মূর্ত আত্মা, যাঁর চঞ্চলতা আর পিপাসার কোনও শেষ নেই।

তাঁর 'ট্যাম্বারলেন' নাটকে সম্রাট ট্যাম্বারলেন সারা পৃথিবী জয় করতে চায়, 'দ্য জু অফ মাল্‌টা'-তে বারাবাস জড়ো করতে চায় বিশ্বের ধনৈশ্বর্য, আর ডক্টর ফসটাস চায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান, যার জন্য সে শয়তানের কাছে আত্মা বন্ধক রাখতেও রাজি। না হলে যে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অন্ধকারের তলপেট তাকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে টানে। স্যর ওয়ালটার র‍্যালে-র 'ফ্রি থিংকার্‌স' গ্রুপের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ধর্ম-বিরোধিতার এমন চাঁছাছোলা উদাহরণ দুর্লভ। এলিজাবেথীয় যুগে নাস্তিকতা ও ধর্মবিরোধিতার চরম শাস্তি ছিল জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। রিচার্ড বেন্‌স নামে এক পুরনো শত্রু প্রিভি কাউন্সিলে একটি 'নোট' দেয় যে, মার্লো ধর্মীয় বচন ও গির্জাকে যথেচ্ছভাবে নিন্দে করছেন।

এখানেই শেষ নয়। মার্লো কি গুপ্তচর ছিলেন? বিশ্বাস করার যথেষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারণ আছে যে, কেমব্রিজে থাকাকালীন এই সরকারি 'চাকরি' মেলে, কারণ, শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের এই কাজের জন্য বেছে নেওয়া হত। আগেই বলেছি, তাঁর হত্যাকারী ইঙ্গগ্রাম ফ্রিজার ছিলেন গুপ্তচর টম ওয়ালসিংহ্যামের খুব কাছের লোক। 'ম্যাসাকার ইন প্যারিস' নাটকে একজন নীরব 'English Agent' ছিলেন। তিনি কি মার্লো নিজে?

কেন ইউরোপে গিয়েছিলেন তিনি? নেদারল্যান্ডস থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয় জাল স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারের জন্য। প্রতিবেশীদের সঙ্গে গোলমাল করার জন্য দু' সপ্তাহ নিউগেট জেলখানায় কাটাতে হয় তাঁকে। ১৫৮৯ সালে রাস্তায় মারামারিতে অংশ নেন মার্লো, যাতে কবি ওয়াটসন জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেন। তিন বছর পর ইনজাংকশন আনেন শোরডিচের এক কনস্টেবল। তাঁর ঘরের সহ-বাসিন্দা টমাস কিড বলেছিলেন, পৃথিবীতে এমন কোনও দুষ্কর্ম নেই যা মার্লো করেননি।

কী খুঁজছিলেন রনেসাঁসের এই ব্যতিক্রমী সন্তান? অন্ধকারকে ধারালো ছুরি দিয়ে চিরে-চিরে দেখবেন বলে ঠিক করেছিলেন তিনি? এ কি স্থির লক্ষ্যে অবিচল এক অভিমান-অভিযান? জীবনকে সম্যকভাবে অন্য সকলের চেয়ে স্নায়ুনিষ্ঠ ভাবে জানতে চেয়েছিলেন তিনি?

প্রোটেস্টান্ট ইংল্যান্ডে ক্যাথলিক রিফিউজিদের সমস্যার সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িয়ে যায়। ধর্মবিরোধিতা ও নানা অজানা অভিযোগে ১৮ মে ১৫৯৩ প্রিভি কাউন্সিল তাঁকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি করে। ২০ মে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলেও, কোনও রহস্যময় কারণে মুক্তি দেওয়া হয় এই শর্তে যে, বিচারবিভাগীয় অফিসারের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করবেন। কিন্তু কাউন্সিলের মুখোমুখি হওয়ার আগেই ৩০ মে ১৫৯৩ তাঁকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারী ফ্রিজারকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১ জুন মার্লোকে সমাধিস্থ করা হয় এক অচিহ্নিত কবরে।

চার শতাব্দী ধরে ইংরেজি থিয়েটার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে যাঁর জন্য, সেই জীবনশিল্পী মার্লোকে কেন যেতে হল ডেপ্‌টফোর্ডে? তাঁর রচনার সত্যকে চরিতার্থ করার জন্য? শেক্সপিয়রের মতো তাঁর নাটকেও সত্যেরই জয় হয় বারবার, এবং 'overreacher'-দের পরাজয়।

'ডক্টর ফসটাস' নাটকের শেষে কোরাস বলে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Cut is the branch that might have grown full straight,
And burned is Apollo's laurel-bough,
That sometime grew within this learned man,
Faustus is gone regard his hellish fall,
Whose fiendish fortune may exhort the wise,
Only to wonder at unlawful things,
Whose deepness doth entice such forward wits,
To practise more than heavenly power permits.

এ কি মার্লোর এপিটাফ?

আজ হঠাৎ ভোর রাতে তাঁরই জন্য নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল। আর একটা বিষনীল ব্যথা সুষুম্না বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে স্নায়ুতে।

২১ এপ্রিল ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৯

আকাশপৃথিবী, পাখিপাখালির ডাক আর ওড়াউড়ি কখন অন্ধকার হয়ে গেল ঘুমের ভিতর। জীবনানন্দ-কথিত আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার। শুধু বইয়ের চৌকো জাদুলণ্ঠনগুলো জ্বলছে।

আমি বোরহেসের কয়েকটি লাইন বিড়বিড় করি:

> Entre mi amor y yo han de laventarse/trescientas noches como trenscientas paredes/y el mar será une magia entre nosotros.
>
> ('Three hundred nights like three hundred walls/ must rise between my love and me/and the sea will be a black art between us.')

সমুদ্রের নীচে এক অনন্ত সুড়ঙ্গে একটি গ্যালারির মধ্যে আমি হাঁটছি। সেখানে কোন্ কবোষ্ণ অমা-আঁধার থেকে উঠে আসা রবীন্দ্রনাথের এক নারী। তারপর য়োয়াকিম ফন সান্ড্রার্ট-এর ১৬৫৬ সালে আঁকা 'রাত্রির অ্যালেগরি'। 'রাত্রির অ্যালেগরি'? এমন বাঙ্ময় নাম কে দিল এই ছবির? পিছনে অন্ধকারদীপ্ত আরও অনেকে। টিশিয়ান, কারাভাজ্জো, রেমব্রান্ট, বেলাসকেস, শার্দ্যাঁ, গোইয়া, টার্নার, দ্যগা, পেট্রুস ফন শেনডেন...।

বরফ আর অন্ধকার মিশে গিয়েছে সেজ়ানের 'লেস্তাক' ছবিতে (১৮৭১)। এরপর টমাস কোল-এর আঁকা 'দ্য ভয়েজ অফ লাইফ' (১৮৪২), যা লন্ডনের 'ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি'-তে দেখা কবেকার ধূসর অতীত থেকে ডুব সাঁতার দিয়ে ফিরে এল। অবশেষে ভ্যান গখের 'নক্ষত্রের রাত' (১৮৮৯), যা জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানির ঘাড়ের ওপর চিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছে। তার সঙ্গে একটি ছবির ঘুমনীল অন্ধকার 'রোন নদীর ওপর নক্ষত্ররাত'।

আমি দেখতে পাচ্ছি অন্ধকারের ক্ষতমুখ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে অশ্রু আর ফসফরাসের মতো ঝলসে উঠছে। আর তাঁর জ্যোৎস্নাসিক্ত চোখ তুলে কবিতা পড়ছেন কবি:

...রাত্রি ভরে গেছে জলে, ডুবোপাথরের গায়ে ঘষা লেগে লেগে
তুমি আজ ভেসে উঠলে ধাক্কায় চুরমার মুখ নিয়ে
মুখ থেকে নেমে যাওয়া লতানো রক্তের ধারাগুলি...

...দেখবে, সমস্ত রাত, এই অনিঃশেষ
জলে ভরে উঠছে রাত্রি, আর তার একফালি চরের ওপরে
আঁকাবাঁকা অঙ্গগুলি শুয়ে শুয়ে ভিজছে বৃষ্টিতে...
('গৃধিনী', জয় গোস্বামী)

শোনো, বেজে ওঠে কালো শক্তির জরায়ু। আমি শুনি কোনো কোনোদিন
রাত্রি ফেটে গেলে
চিতা ফেটে গেলে আমি শুনি তার কাঠ ফেটে চোঁয়ানো রক্তের
নীচে মেলে রাখি চোখ, মণি ফেটে গলে গিয়ে পড়ে
চিতার উপরে ওঁ স্বাহা! এই ঘৃতরাগ কীভাবে যে ক্ষরিত করেছি
জানি না, কেবল দেখি সাদা নীল হাজার মক্ষিকা
আমার শরীরে এসে বসে
রোমকূপে এত হুল! অথচ কিছুই তারা টানে না, বরং
ভরে দিতে থাকে এক জ্বলন্ত আরক। তার সীমাহীন তাপে
নভোমুখ ফেটে গিয়েছিল একদিন আমি একঝলক দেখতে পেয়েছি
কালো কলসের মধ্যে ফুটে উঠছে শত শত রাগিণীর কোষ...
('শক্তি')

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি আয় ধাত্রী ভাণ্ড খুলি তোর
('উন্মাদের পাঠক্রম')

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কালো কলস ফেটে বেরিয়ে আসা অন্ধকারের সত্যকে ভয় করে আমার। 'Come, thick night,/ And pall thee in the dunnest smoke of hell,/ That my keen knife see not the wound it makes... আমি জাদুলণ্ঠনগুলোর মধ্যে খুঁজি আদিম লতাগুল্মময় এক মর্মরধ্বনি, যা জুড়িয়ে দেবে ক্ষত। কবিতাটির নাম পালটে 'রাত্রি' রেখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

রাত্রিকে কোনও দিন মনে হতো সমুদ্রের মতো;
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনও কারও হৃদয়ের কাছে সে-রাত্রির মানে;
আমার সে মন নেই
যে-মন সমুদ্র হতে জানে।

('রাত্রি', সঞ্জয় ভট্টাচার্য)

সঞ্জয় ভট্টাচার্য আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন, বন্ধু জীবনানন্দ তা করেছেন। কিন্তু আজ রাতে?

ট্রাম-লাইনগুলো খালি প'ড়ে আছে— রাস্তার সেই বিরাট হাঙরদের এখন ঘুমোবার সময়...।

('গ্রাম ও শহরের গল্প', জীবনানন্দ দাশ)

নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে আমিও জীবনানন্দের মতো ঘুমের আস্বাদে লালিত হয়ে চেয়েছি, অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি। আমি তার বুকে খুঁজেছি লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ, 'কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরও দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের ক্ষণিক আভাস— আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।'

মাল্যবান সুস্বাদ পেল, কেমন স্নিগ্ধ শারীরিক মনে হল রাত্রিটাকে, রাত্রির এই নিঝোর সময়টাকে।... মশারির খুঁট তুলে এদের খাটের পাশে পাড়াগাঁয় পৌষরাতের নিশ্চুপ ডানার পাখির মতো এসে স্নিগ্ধ নৈঃশব্দ্যে— এদের জাগিয়ে?— বসে থাকতে চায়।

('মাল্যবান', জীবনানন্দ দাশ)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সারা দিনের সমস্ত কথা কাজ অবসন্ন শোল-বোয়ালের মতো দিঘির অতলে তলিয়ে যেত যেন, ঝির-ঝির ফটিক-ফটিক ঝিক-ঝিক ঝর-ঝর করে উঠত ওপরের জল, যে-জল গানের মতো, যে-গান জলের মতো চারদিককার খেজুরছড়ি নারকোলঝিরিঝিরি ঝাউয়ের শনশনানি ছায়া অন্ধকার একটি তারার ভেতর; এক কিনারে চুপচাপ বসে থাকত সে।

(ঐ)

পাড়াগাঁর রাত এমন নিস্তব্ধ হয়ে যায় যে সুপুরির কুঁড়ি ঝরবার শব্দ অব্দি শোনা যায়; আমের মুকুলও আওয়াজ করে ঝরে টুপটাপ-টুপটাপ-টুপটাপ...

('গ্রাম ও শহরের গল্প')

তারপর তোমাকে একটা পাৎলা সরপুঁটির মতো কান্‌কোতে বেঁধে একটা বাচ্চা রুইয়ের মতো নদীতে ভেসে এলাম আমি। সেই নদী— নলের গন্ধ— রাত— অন্ধকার— নক্ষত্র— ভিজে বালির চর— তোমার ঠান্ডা শরীর কত দিন আমার হৃদয়কে শাসন করেছে—

(ঐ)

গভীর গভীর এই শীতের রাত। অনির্বচনীয়— যখন নদীর থেকে নয়, শুকনো শক্ত চুনি-পান্নার ভেতর থেকে জল ঝরছে, সেই জলদেবীকে নিয়ে এ-রকম শীতের রাতে শুয়ে থাকা।

কোনো দিন শেষ হবে না রাতের?

না।

কোনো দিন শেষ হবে না আমাদের রাতের, উৎপলা?

হবে না। হবে না।

শীতের রাত ফুরুবে না কোনো দিন?

না।

কোনো দিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?

ফুরুবে না, ফুরুবে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো দিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?
না, না, ফুরুবে না।
কোনো দিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?
ফুরুবে না, ফুরুবে না। কোনো দিন—

আলোড়িত হয়ে কথা বলতে-বলতে কেমন আলো-অন্ধকার, সূর্য, শিকরে বাজ, বড় বাতাস, মাতৃগণ, গণিকাগণ, উৎপলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, মৃত্যুশব্দ, অফুরন্ত শীত রাতের প্রবাহের রোল শুনতে শুনতে মাল্যবানের ঘুম ভেঙে গেল।... তাকিয়ে দেখল ঘর অন্ধকার... টেবিল ফিটফাট পরিচ্ছন্ন— কাল সরীসৃপের পিঠের মতো চকচক করছে।

('মাল্যবান')

কাল সরীসৃপের পিঠের মতো। কা—

আমি বোদল্যের খুলে পড়ি: 'Entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche' (শোনো, প্রিয়া আমার, নরম রাতের পদপাত।)

যিনি নৈঃশব্দ্য দিয়ে শব্দকে শাসন করেন সেই খনিজ-কবিতার রাজা য়্যজেন গিলভিক লিখেছেন:

এমনকী ধাতুও
রক্তখালগুলির সামনে
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় কেঁপে কেঁপে ওঠে

আর এই সুনিদ্রার রাত
যা বিরল হয়ে আসছে।

('এমনকী ধাতুও')

তুমি জেগে উঠছ...
তুমি দেখতে পাচ্ছ এখনও ছায়ার ভেতর বিরাট বিরাট গর্ত,
হাঁ-মুখ, পাথরের দাঁত,
এক বিশাল আগুন
ধাতুকে লেহন করছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুমি দেখছ
জ্বলন্ত সমুদ্রের থেকে নেওয়া
পুড়ে যাওয়া দীর্ঘ করিডোরগুলির গহ্বর বুজে দেওয়া নুন
দৈত্যাকার জলের আলোড়ন
তোমার মনে পড়ে তাদের পরাজয়ের চিৎকার।

তুমি পিছলে যাচ্ছ নৈরাজ্যের ভেতর
অট্টহাসির পাথর ঠেলতে ঠেলতে
আগুন-বন্ধুত্বের খোঁজে।

('দিনরাত')

অন্ধকারের নুন আমায় ডেকে নিচ্ছে তার ধূসর গুহায়। এ কি নির্জ্ঞান পরলোক? এক মাতাল তরণীর মতো তার আভিচারিক শক্তির কাছে আমি নিজেকে সমর্পিত করে দিচ্ছি। আর বাইরে তাকিয়ে দেখছি:

রাত্রে চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো।

('স্বর্গ হতে বিদায়', সমর সেন)

৫ মে ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১০

নীল চোখ। রোগা দীর্ঘকায় একটি মানুষ, গায়ে অনাড়ম্বর পোশাক। একটি বই বোঝাই ছোট ঘরের ছোট্ট টেবিলে তিনি ঝুঁকে পড়ে কী যেন লিখছেন। আমি নিচু হয়ে দেখি শব্দগুলো যেন ডানা মেলে আকাশে উড়ে যেতে চায়।

> Aux âmes libres de toutes les nations qui souffrent, qui luttent et qui vaincront.
> (সব দেশের মুক্তমনাদের, যারা কষ্ট পায়, যারা লড়াই করে, আর যাদের জয় হবেই।)

তাঁর হলদে মুখের ইস্পাতের ঝলকানির মতো দৃষ্টি দেখেও বুঝতে পারিনি। এবার 'জাঁ-ক্রিস্তফ' উপন্যাসের উৎসর্গপত্র দেখে বুঝলাম। অস্ফুট স্বরে বললাম, রম্যাঁ রলাঁ!

ঘুমের দরজা ঠেলে দেখছি, ছোট একটি ছেলে তার মা'র পিছন পিছন ফুল নিয়ে সমাধিক্ষেত্রে যাচ্ছে দু' বছরের ছোট বোনের সমাধিতে ফুল দেবে বলে।

প্রায় পনেরো বয়স পর্যন্ত সে কাটিয়েছিল মধ্য ফ্রান্সের ক্লাম্‌সি শহরে, বাবা-মা আর দাদামশাইয়ের সঙ্গে। যখন তার বয়স এক বছরের কম, কাজের মেয়েটি তাকে সারা রাত প্রচণ্ড শীত আর বরফের মধ্যে বারান্দায় ফেলে রেখে একটি নাচ-গানের উৎসবে চলে যায়। কেউ লক্ষ করেনি। সারা জীবনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি।

রুগ্‌ণ ছেলেটির [illegible] তবু পাঁচ বছর পর্যন্ত সে সুখেই কাটায়। নীল-চো[illegible] খেলা [illegible] বোন মাদ্‌লেনের সঙ্গে। আরকাশাঁ-র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সমুদ্রতীরে গিয়ে তারা হুটোপাটি করে। তারপর এক রাতে ছ' ঘণ্টার মারাত্মক যন্ত্রণার পর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে হোটেলের ঘরে ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত মেয়েটি মারা যায়।

সমাধিক্ষেত্রের মৃত্যুময়তার মধ্যে সেই ছেলেটি, রম্যাঁ রলাঁ, শুধু শোনে সাইপ্রাস গাছে হাওয়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজ। অসুস্থতা, আতঙ্ক আর শ্বাসরোধকারী উৎকণ্ঠা। নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে আর্তচিৎকার করে ওঠে, 'Je ne veux pas mourir'। না— আমি মরতে চাই না...। মা ছুটে আসেন, চুমো খান, 'Non, non, mon petit garcon' না, না, খোকা, ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন না।' রম্যাঁ-র মনে হয় সে 'মৃত্যুগহ্বরের ওপর একটা সুতোয় ঝুলছে।' অতলস্পর্শী খাদ ও শূন্যতা।

শরীর চলে না বালকের। মাদ্‌লেনের মৃত্যুর আগের দিন সমুদ্রবেলায় অন্য শিশুরা তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ায় সে ছোট বোনটির কাছে গিয়ে কেঁদেছিল। পরে ইস্কুলে শক্তিশালী সহপাঠীরা তাকে অত্যাচার করে। ক্লামসিতে বাগানের শেষে, বাড়ির পিছনে, নিভেরনের খালের ধারে সে কাঠবোঝাই নৌকার দিকে চেয়ে দূর পৃথিবীর কথা ভাবে। কে বাঁচাবে তাঁকে?

> Tout est mort sur la terre, Tout est mort dans mon coeur. La tête tourne...
> L'abîme m'aspire. Ciel vide, engloutis-moi.
>
> পৃথিবীতে সব কিছু মৃত। আমার হৃদয়ে সব কিছু মৃত। মাথা টলমল করে।... খাদ আমায় টেনে নেয়। শূন্য আকাশ, আমাকে গিলে ফেলো।

হলদে হয়ে যাওয়া একটি বই 'শেক্সপিয়রের নারীরা' তাকে মুগ্ধ করে দেয়। কী রহস্যময় সব নাম... ভায়ওলা, পারডিটা, পোরশিয়া! দাদামশাইয়ের কেনা পুরনো এক খণ্ড শেক্সপিয়র আস্তে আস্তে তাকে মৃত্যু-অববাহিকা থেকে বের করে আনে। শেক্সপিয়র আর সংগীত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঁচ বছরে পড়ার আগে সে পিয়ানোতে জীবনের সুরবিহার শোনে। সংগীত খুলে দেয় হাজার দরজা।

আর একটি ছোট মেয়ে, যে বালির ওপর বসে থাকে, হাত দিয়ে কণ্ঠস্বর দিয়ে চোখ দিয়ে তার ভাইকে ছুঁয়ে থাকে।

সাড়ে সাত বছর বয়সে ক্লামসির ইস্কুলে ঢুকে সে পাগলের মতো পড়াশোনা করে। ইতিহাস, ভূগোল, ফরাসি, গ্রিক, লাতিন, অঙ্কে প্রথম হয়। কিন্তু শান্তি নেই। তার মা তাকে মোৎসার্টের স্বাদুতার কাছে নিয়ে যান।

১৮৮২ সালের ২২ অক্টোবর 'পারসিফাল' শোনে সে, ৫ সেপ্টেম্বর বেঠোফেন-এর সিম্ফনি। না, না, বুঝতে পারে না সে। তারপর একদিন 'যখন হলদে তৃণ ভরে গেছে মাঠে', ২৬ নভেম্বর, ছোট একটি দমবন্ধ করা সভাগৃহে আলোহীন ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে উঁচু থেকে সে শোনে মহাজাগতিক এক সংগীত। বেঠোফেনের দ্বিতীয় সিম্ফনি। মনে হল বিশ্বসংসারের অন্তরের মূর্চ্ছনা শুনছে সে।

টলমল করছে পৃথিবী। কনসার্ট থেকে বেরনোর সময় সে ঠিক করে সে আর বিজ্ঞান পড়বে না। সমুদ্রবাতাস এসে তার ফুসফুস ভরে দেয়। কী যন্ত্রণা, কী আনন্দ! কিন্তু তার স্নায়ুতে যে জট, তা তো পুরোপুরি খোলে না।

একোল নরমাল স্যুপেরিয়্যরে ভর্তির পরীক্ষায় ফেল করে সে। কিন্তু ক্ষতির চেয়ে লাভ হয় বেশি। সক্রাতেস-পূর্ববর্তী গ্রিক চিন্তাবিদরা তাকে ডাকে। দু' বছর ধরে সে পড়ে ভিক্তর য়্যুগো, স্পিনোজ়া আর শেক্সপিয়র।

১৮৮৫ সালে পরীক্ষায় ফেল করার জন্য সে দায়ী করে য়্যুগো'কে। তাঁর ৮৩তম জন্মদিনে মিছিলে হেঁটেছিল সে। কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যু হয় য়্যুগো-র। আর ক্লাস না করে ফরাসি কবির বাড়ির চারপাশে সে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। বসন্ত আর গ্রীষ্ম কাটে তাঁর লেখা পড়তে পড়তে।

দ্বিতীয়বার একোল নরমাল-এ প্রবেশাধিকার পেলেন না উনিশ বছরের রলাঁ। এদিকে য়্যুগো-র চেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে আরও দু'টি প্রভাব—স্পিনোজ়া আর হ্যামলেট। রলাঁ একে বলেছেন 'Eclair' (বিদ্যুৎ)। স্পিনোজ়াকে তিনি অন্যভাবে আবিষ্কার করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আবহমান কোনও বিমূর্ত কিছু নয়, একটি 'substance' যা সমস্ত অস্তিত্বকে স্পর্শ করে আছে। 'আমার হিমশীতল ঘরে, যেখানে নামছে শীতের রাত, আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে, সত্তার শ্বেত সূর্যের ভেতর।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কয়েদখানা, বাতাসরুদ্ধ পরিবেশ আর মুক্তি-ভাবনা মিলেমিশে যায়। রলাঁ-র মনে হয়, 'আমি সত্তাকে আলিঙ্গন করছি।' তাঁর অন্তর্জীবন, ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সমুদ্রসত্তার দিকে প্রবাহমুখ খুঁজে পায়। তাঁর জীবন-ভাবনা খোদাই হয়ে গেল নিঃশব্দে।

আরেক সহযাত্রী শেক্সপিয়র। 'হ্যামলেট' তাঁর কাছে অসীম মূল্যবান, রলাঁ-র প্রথম সংরক্ষিত রচনা 'হ্যামলেট' নিয়ে (১৮৮৬)। স্বপ্ন আর বাস্তবের দ্বন্দ্ব তো তাঁর জীবনেরও কেন্দ্রীয় সংকট। ফর্টিনব্রাস-এর জয় তাঁকে উদ্দীপ্ত করে। রম্যাঁ রলাঁ পরে সারা জীবন চেষ্টা করবেন শরীর অবশ করা দ্বিধাদীর্ণ কর্মহীনতাকে প্রত্যাখ্যান করতে। যে কাজ করে সেই একমাত্র মানুষ নামের যোগ্য।

কবিতা নয় (বন্ধু পল ক্লোদেলের মতো), দর্শন, নাটক আর সংগীত তাঁকে মৃত্যু-উপত্যকা থেকে বের করে আনে। বেঠোফেন আর ভাগনার-এর তৈরি মহৎ চরিত্রগুলোর সঙ্গে মিশে যায় প্রথাগত বিশ্বাসের প্রতি রলাঁ-র অনাস্থা। তা তাঁকে দিল আত্মবৃত্তকে অতিক্রম করে এক সমুদ্রপ্রতিম অনুভূতিকে স্বীকৃত জানানোর শক্তি আর আবেগ।

সংগীতের মহাবিশ্বের সামনে রলাঁ-র বিপন্ন বিস্ময় তাঁকে করে দিল পাশ্চাত্যে অন্য সকলের থেকে আলাদা। তাঁর মনে হল, বেঠোফেন ভবিতব্যের নলি ধরে ঝাঁকাতে পারেন, তিনি নতিস্বীকার করেন না কিছুতেই। তিনি একজন নন, তিনি অনেক মানুষ। আর ভাগনারের সৃষ্ট সিগফ্রিড আর ট্রিস্টান চরিত্র দু'টি যেন বুনে দেয় এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির মোহজাল।

আমি ঘুমের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখছি, একটি রুগ্ণ বালক ফুল হাতে তার বোনের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে। চারপাশে অন্ধকারের কালো জল।

শীর্ণ, ক্লিষ্ট মুখে সে আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে বিকল্প এক আলো।

যে-আলো একদিন তাকে করে তুলবে এক দীর্ঘ আলোকস্তম্ভ।

এক বরফে ঢাকা আগ্নেয়গিরি।

১৯ মে ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১১

রাতের রেলিং ধরে আমি দাঁড়িয়ে। আকাশে একটি তারা জ্বলছে।

পিঠে হাত দিয়ে কে যেন বলে উঠল: 'ভূ নাভে পা ফিনি লিস্‌তোয়ার দ্য রম্যাঁ রলাঁ।' রম্যাঁ রলাঁর গল্পটা শেষ করোনি।

পিছনে তাকিয়ে দেখি লুই আরাগঁ। সঙ্গে সিগারেট হাতে পল এল্যুয়ার আর আলব্যের কাম্যু। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আঁদ্রে মালরো। আঁদ্রে জিদকেও কি দেখলাম এক ঝলক? তিনি না রলাঁর শত্রু! আমার মনে পড়ছে মালরো-র উক্তি: 'ভিক্‌তর য়্যুগোকে বাদ দিয়ে রম্যাঁ রলাঁকে কল্পনা করে শক্ত। তিনি যে প্রশংসা ও নিন্দে প্ররোচিত করেছিলেন তা আমরা কোনও দিন বুঝতে পারব না, যতক্ষণ না আমরা অনুধাবন করতে পারছি যে তিনি ছিলেন মহান ফরাসি রোমান্টিকদের শেষ প্রতিনিধি।'

শুনতে পাচ্ছি মাছির ভনভনানির মতো অন্তহীন অভিযোগ: উনি ফরাসি নন, উনি ফরাসি নন...। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে মঁপারনাস-এর ফুটপাথে রলাঁ-র বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, সবাই কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে, রম্যাঁ রলাঁ! সে কে? জানি না। দেওয়ালে দেওয়ালে ধিক্কার: 'দেশদ্রোহী', 'বিশ্বাসঘাতক'। কারা যেন ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলছে। রম্যাঁ রলাঁ বলে কেউ নেই। কেউ নেই।

অন্য দিকে, ওরা কারা এক সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে। অ্যালবার্ট সোয়াইৎসার, আইনস্টাইন, হেরমান হেস্‌সে, বার্ট্রান্ড রাসেল, মাক্সিম গোর্কি, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, গাঁধী, রবীন্দ্রনাথ, কার্ল স্পিটলার...। রলাঁ-র বন্ধু। রলাঁ-র?

প্যারিসের রু্য দ্যুল্‌ম্‌-এ ফ্রান্সের সবচেয়ে বিশিষ্ট কলেজ একোল নরমাল স্যুপেরিয়্যরে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন রলাঁ ১৮৮৬ সালের ২ নভেম্বর। সেখানে তিন বছর ধরে তিনি কী পড়াশোনা করবেন, তা তাঁর কাছে স্পষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি অধ্যাপক হতে চান না। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য ওই বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে কয়েকটা বছর তাঁকে কাটাতে হবে।

তাঁকে মুগ্ধ করে রাখে বেঠোফেনের পাশাপাশি আরেক দৈত্যাকার সংগীত প্রতিভা, ভিলহেল্‌ম্‌ রিশার্ড ভাগনার (১৮১৩-১৮৮৩)। 'লা র‍্যভু ভাগনেরিয়েন' পড়ে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন উনিশ শতকের ওই নতুন দেবতাকে। 'সিগফ্রিড'-এ অরণ্যের মর্মরধ্বনি শুনতে শুনতে রহস্যমেদুর এক জগৎ তাঁকে 'প্রকৃত জীবন' (la Vrai Vie)-এর কাছে কাছে নিয়ে যায়। 'পারসিফাল' পড়তে পড়তে আর বাজাতে বাজাতে রম্যাঁ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তাঁর শিরা-উপশিরা সমুদ্রের নীল জলে ভরে যায়।

একটি কনসার্টের শেষে তিনি লেখেন:

> আমি গিয়েছিলাম ছিন্নভিন্ন, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে। ওই সুরবিহারে আমার শরীর চমকে জাগ্রত হল, শিহরিত হল। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম আমার শক্তি বাড়ছে, আমি বিরাট আর অলৌকিক ক্ষমতাধর হয়ে উঠছি। ভাগনার আমার অভিব্যক্তি বদলে দিচ্ছেন। আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে, তিনি আমার ছড়িয়ে যাওয়া শক্তিকে মিলিয়ে দিচ্ছেন। ভাগনারের আবেগ আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্ফুরিত করছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। ভাগনারের চিন্তা আমার ভাবনাকে শুষে নিচ্ছে যেমন সূর্য শুষে নেয় পৃথিবীর বাষ্প। আমি বিরাট হয়ে উঠছি... বিরাট— যেন পৃথিবীর ওপর হেঁটে যেতে পারি।

তরুণ রলাঁ পড়েন ডিকেন্স, স্তাঁদাল, ফ্লবের, মপাসাঁ, দস্তয়েভস্কি, ভিন্যি, গোগোল, তুর্গেনিভ, আলফঁস দোদে... না, না, কেউ নয়। মপাসাঁ-র 'বিমূর্ত বাস্তব' নয়, যা শুধু অন্ধকারকে দেখাবে। ডিকেন্সের আদর্শবাদ নয়, যা বাস্তবকে বাস্তব হিসেবে দেখতে দেবে না। একা, একজন পেরেছেন সত্যকে তীব্রভাবে ভালবেসে সাহিত্য-বাস্তবকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে, তিনি তলস্তয়।

ভাঙাচোরা বাস্তব নয়, জীবনের প্রবাহ, জীবনের নিশ্বাস। তলস্তয়ের হাতে এই নতুন সাহিত্য-বাস্তব হয়ে ওঠে এক দর্শন, যেখানে তিনি কথা বলেন এক সমগ্রতার সঙ্গে। 'যুদ্ধ ও শান্তি' যেখানে পৌঁছেছে বেঠোফেন-ও তো সেখানেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৬ এপ্রিল ১৮৮৭ তলস্তয়'কে লিখেছিলেন ২১ বছরের রলাঁ কেন শিল্পকে নিন্দে করেন তিনি, যখন শিল্পের শক্তিতে তাঁর গভীর বিশ্বাস? শিল্প মানে তো 'মৃত্যুর মৃত্যু', ব্যক্তির ভঙ্গুর ক্ষুদ্রতাকে ভেঙে ফেলা?

প্যারিসের বিদ্যুৎময় প্রদর্শশালায় জাঁ-ফ্রাঁসোয়া মিয়ে (যাঁকে নিয়ে লিখবেন এক আশ্চর্য জীবনী), পিসারো, রনোয়ার, হুইসলার আর মনের ছবি দেখেন তিনি। ছবির রং আর বেঠোফেন-ভাগ্‌নার মিশে যাচ্ছে তাঁর মনে, নতুন এক বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। নভেম্বর মাসে রাশিয়া থেকে তলস্তয় উত্তর দেন ফরাসিতে 'উপভোগ-বাদী শিল্প' (I'Art jouisseur)-কে তিনি ঘৃণা করেন। শিল্প তো কোনও পেশা নয়, শিল্প এক জীবনবেদ।

'আহ্! যদি আমি একা হতে পারতাম, একা! সব কিছু বদলে দিতাম!' ভাঙচুরময় বর্তমান, না বহুস্তরান্বয়ী, বহমান সমগ্র? যন্ত্রণাকাতর এক আত্মা, রম্যাঁ রলাঁ, খুঁজে পাচ্ছেন তাঁর অগ্নিপথ। 'শান্ত আর বিষণ্ণ এক আনন্দ, আর্দ্র এক সুখ, যার অন্তস্তলে এক স্নিগ্ধ অর্ধ-উন্মীলন, অন্তর্গত অশ্রু— যা আমি খুঁজে পাই গ্লুকের সংগীতে, রামোর প্রিলিউডে, হাইড্‌ন্ আর মোৎসার্টে।'

লিখবেন তিনি, লিখবেন তিনি নাটক। এমন নাটক যা ঝড়ের মতো। লিখবেন তিনি, লিখবেন তিনি উপন্যাস যা সংগীতের মতো।

রোমের ফারনেজ প্যালেসে গবেষণার জন্য ইতালি গেলেন রলাঁ। সেখানে মাৎসিনি, গারিবালদি আর নীৎশের বান্ধবী প্রবীণা মালভিদা ফন মেজেনবুগ হয়ে উঠবেন সেই খুঁটি— যা তাঁকে নিজেকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। আগুন আর বরফকে তিনি মিলিয়ে দিলেন রলাঁর অন্তরাত্মায়। বাখ এবং বেঠোফেন, ভাগ্‌নার এবং লিস্‌ট...

রলাঁ লিখলেন এলসা ভোল্‌ফ্-কে খানিকটা রসিকতার খানিকটা সিরিয়াস সুরে, তিনি নদীর মাছ। যখন ভেঙে গেল প্যারিসীয় বিদুষিণী ক্লোতিল্‌দ ব্রেয়ালের সঙ্গে তাঁর প্রেম-বিবাহ, যা দূরে সরিয়ে দিয়েছিল মালভিদা এবং তাঁর নিজের মা'কে, প্রস্তর-কঠিন এক কোণে তিনি প্রস্তুত হলেন 'জাঁ-ক্রিস্তফ' উপন্যাসের জন্য। মালভিদা'কে লিখলেন:

> আমার উপন্যাস জীবনের গল্প, জন্ম থেকে মৃত্যুর। আমার নায়ক এক মহান জার্মান সংগীতকার যাকে ঘটনাচক্রের টানে ষোলো থেকে আঠেরো বছরের পর জার্মানির বাইরে যেতে হয়, প্যারিস, ইতালি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুইজারল্যান্ডে। প্রেক্ষিত আজকের ইউরোপ। সত্যি বলতে কী, এর নায়ক আজকের বেঠোফেন।

অন্য এক চিঠিতে লেখেন:

জাঁ-ক্রিস্তফ সেই মুক্ত চিন্তক যে নির্ভয়ে সত্য কথা বলে, যে আমাদের সময়ের যন্ত্রণাকে উঁচু থেকে বিচার করতে পারে। বন্ শহরে মরে যাওয়া একশো বছর আগেকার সংগীতকার সে নয়, সে আমরা, আজকের জীবন্ত মানুষেরা যারা কষ্ট পায়, যারা লড়াই করে এবং যারা জয় করবে।

ক্রিস্তফের আত্মা লার্ক পাখির মতো। সে জানে সে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়বে কিছুক্ষণের ভেতর, বারবার পড়বে। কিন্তু সে জানে আগুনের ভেতর থেকে অক্লান্তভাবে সে উঠে দাঁড়াবে, আকাশের আলোর নীচে যারা আছে তাদের দিকে চেয়ে গান গাইতে গাইতে।

আমাদের মরে যেতে হবে, ক্রিস্তফ। নতুন করে বাঁচব বলে।

স্টেফান ৎসোয়াইগ-এর ভাষায়:

'জাঁ-ক্রিস্তফ' কোনও বই নয়, ওটি একটি বাণী। কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়, অথচ ওতে ধরা আছে আমাদের যুগ। 'জাঁ-ক্রিস্তফ' শুধু একটি বই নয়, এটি একজন মানুষের সত্য-অভিজ্ঞতার, সমগ্র জীবনপ্রবাহের, দৈনন্দিন জীবনচর্যার জাদুবয়ান।

বন্ধু ক্লোদেল'কে লিখেছিলেন, 'শুধু মনটা কস্‌মোপলিটন না, হৃদয়টা কস্‌মোপলিটন।'

যখন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার (১৯১৫) অব্যবহিত পরে রলাঁ লিখলেন জাতীয়তাবাদ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের তীব্রতম প্রতিবেদন 'ডামাডোলের উর্ধ্বে' আর স্বদেশে নিন্দিত আর ধিক্কৃত হলেন 'দেশদ্রোহী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর বিশ্বাসঘাতক' বলে, চিরকালের জন্য হারালেন নিজের স্থান, তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সুদূর প্রাচ্যে জাপানে এক দীর্ঘকায় ভারতীয় কবি একই আন্তর্জাতিকতার কথা বলছেন তাঁর জাতীয়তাবাদ-বিষয়ক বক্তৃতামালায়।

তিন বছর পর জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের বছর ১৯১৯ সালে রলাঁ-র অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সই করলেন স্বাধীন মনের স্বাক্ষরপত্র La Déclaration d'Indépendance de l'Esprit.

কালিদাস নাগ লিখেছেন, তাঁকে 'জাঁ-ক্রিস্তফ' পড়তে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর রলাঁ-পরিকল্পিত বিশ্বগ্রন্থাগারে প্রথম প্রকাশের জন্য বিশ্বসাহিত্যের যে-বইটিকে বেছে নিলেন রলাঁ, সেটি 'গোরা'!

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ, সুরের বাঁধনে।
পশ্চিম সমুদ্রের ঢেউ এসে মিশল পুবের সমুদ্রে।

২ জুন ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১২

পাথরের মতো রুক্ষ, কঠিন আর ইঙ্গিতময়।

বাস্তব যেন তাঁর মাধ্যম মাত্র, বাস্তবে তাঁর শেষ নয়। বস্তু থেকে মুচড়ে ছিঁড়ে বের করার চেষ্টা করেন এক বিকল্প অভিজ্ঞান, প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পের ধাক্কায় জমে পাথর হয়ে যাওয়া কথা, ধোঁয়া-ওঠা বরফের মতো নৈঃশব্দ্য-কঠিন কথা।

বিস্ফোরক, সহজ ও কঠিন, ভাঙা কাচের টুকরোর মতো।

কোথায় সেই ক্ষতমুখ
যা উত্তর দেবে?
কোথায় সেই ক্ষতমুখ
জীবন্ত মৃতের?

(অস্থিঘর)

এমন একেকটা জায়গা আছে
যেখানে তুমি ধরতেই পারবে না ওটা
কুমোরের মাটি না মাংস।
আহ্,
তুমি আতঙ্কিত হয়ে দেখছ
পৃথিবী সর্বত্র এক,
পৃথিবী ও আঠা।

(ঐ)

বিশ শতকের ফরাসি [illegible] তাৎপর্যপূর্ণ কবিদের একজন য়্যেন গিলভিক [illegible] জাঁ-পল সার্ত্র-র জন্মের দু'বছর আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্যামুয়েল বেকেট-এর (যাঁকে, ফরাসি সাহিত্যিক মনে করে ফরাসিরা) জন্মের এক বছর পর, য়্যুইসমাঁস আর আলফ্রেদ জারি-র মৃত্যুর বছর আর মরিস ব্লাঁশো ও রনে শারের জন্মের বছর তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। ব্রতাইনের কারনাক শহরের পাথুরে সামুদ্রিক দৃশ্যপটে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন নাবিক, পরে পুলিশে যোগ দেন। ছোটবেলায় মা'র ভালবাসা পাননি, তাঁর নিষ্ঠুরতা গিলভিককে চিরকালের মতো ভাবাবেগমুক্ত করে দেয়। এক অসহনীয় যন্ত্রণা তাঁর কবিতার মূল চারিত্র্য নির্ধারিত করে দেয় নিরাবেগ এক কথনে।

অঙ্কের ছাত্র (সম্পূর্ণ একটি পাটিগণিতের ছক/ তোমার ঢেউয়ের মধ্যে মিশে যায়), পরে কঠিন পরীক্ষায় পাশ করে জাতীয় অর্থমন্ত্রক দপ্তরে যোগ দেন এবং ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৩, জাতীয় অর্থমন্ত্রকের পরিদর্শকের পদে কাজ করেন। সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সময় পল এল্যুয়ারের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিতে সামিল হন। পরে ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণের সময় পার্টি ত্যাগ করেন।

প্রিয় প্রদেশ ব্রতাইন ছেড়ে পিতার নতুন পেশার কারণে তাঁকে চলে আসতে হয় আলজ়াসে। সেখানকার ইস্কুলে লা ফঁতেন-এর ফেবল্‌স পড়েছিলেন তিনি। সেই কম কথার সুঠাম অণুগল্প কি তাঁকে মথিত করে দিল চিরকালের জন্য?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রকাশিত তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ Terraqué (১৯৪২) তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এক খনিজ কবিতার (la poésie minérale) জন্য, যা ন্যূনতম কথা দিয়ে তৈরি, যেখানে বস্তুই রাজা।

মাটির অনেক নীচে নেমে যাওয়া এক বাঁকা শিকড়গুচ্ছ। টেবিল, বাটি, আলমারি, গাছ, পাথর... এই তাঁর পৃথিবী। সেদিক থেকে অস্তিত্ববাদী কবি ফ্রাঁসিস পঁজ-এর সঙ্গে তাঁর মিল। গম্ভীর ও স্তোত্রময় এক শূন্যতায় একটি বস্তুকে বিযুক্ত করে নেন তিনি। উন্মোচনের জন্য খুঁড়ে খুঁড়ে ভেতরে প্রবেশ করেন গিলভিক। আমরা যেন গাছের বাকলে অথবা আলমারির তাকে কান পেতে ঘুমন্ত প্রাচীন কথা শুনছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গাছটি, এখন, এখানে দাঁড়িয়ে
শুধু কাঠ
একটা পাখির মতো স্থির, সটান
মাথা ঝুলছে।
গাছটি বেঁচে রয়েছে।
কাঠের মতো,
পাখির মতো,
নড়ছে না।

(শীতের গাছ)

একটু আগেও এই মাংসের ভেতর দিয়ে রক্ত বয়েছে,
এই মাংসে কেঁপে উঠেছে এক দুর্বোধ্য
ও অলৌকিক উষ্ণতা।
এখনও ওর চোখের গভীরে হালকা একটু আলো
এখনও তুমি ওর কোমর ধরে আদর করতে পারো
এখনও তুমি ওখানে রাখতে পারো তোমার মাথা
আর
শান্ত করতে পারো তোমার ভয়।

(ছালছাড়ানো মাংস)

অন্তর্বাস তাড়াতাড়ি পচে না
তুমি কয়েকটিকে
ওখানে দেখতে পাচ্ছ,
জমে পাথর হয়ে আছে।

ওরা লুকোনো মাংসের কথা বলে
যা আরও কিছুক্ষণ
সহ্য করতে পারত।

(অস্থিঘর)

যে শূন্য তোমাদের আলাদা করে দিয়েছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেদিকে তাকিয়ে তুমি চিৎকার করে উঠলে
তোমাদের দু-আধখানা করে কেটে ফেলা
ঐ অন্য শূন্যের দিকে
তুমি এত জোরে চিৎকার করে উঠলে

যেন আবহমান কাল থেকে
তোমরাই একমাত্র
যাদের দেখা হয়নি।

(সমান্তরাল রেখা)

মুছে-যাওয়া মানব-সংস্পর্শ জীবনের উপরিতলে ফিরে ফিরে আসে। কিংবদন্তিচ্যুত, পুরাণহীন বস্তুকথা। এক অদৃশ্য শিকড়ে ডুব দিয়ে গোপনতায় ভারী এক অতীতে ফিরে যান গিলভিক। তিনি যেন এক সাক্ষী, যিনি যে কোনও সময় ঘুম থেকে জেগে উঠবেন। আর জেগে উঠবে বস্তুর বিদ্রোহের শক্তি, শক্ত মুঠো, চাপা আর্তনাদ।

এগুলো যেন স্টিল লাইফ। সম্পূর্ণ সফল কিংবা সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই সব থেমে যাওয়া চিৎকার। তাঁর কণ্ঠস্বরের বিশেষ ধরনের প্রক্ষেপণ রোমান্টিকতাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

স্যুররেয়ালিস্ত-দের সঙ্গে কি তাঁর মিল আছে? তাঁদের ঘৃণা করেছেন গিলভিক, এবং প্রকাশ্যে তাঁদের থেকে দূরত্ব রেখেছেন। তিনি ভালবেসেছেন সম্পূর্ণ অন্য মেজাজের দুই কবি, পল এল্যুয়ার আর লুই আরাগঁকে। জাঁ ফল্যাঁ, আঁদ্রে ফ্রেনো, রেমঁ ক্যনো আর জাঁ তারদিয়োর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু এঁদের কারুর সঙ্গে তাঁর প্রায় কোনও মিল নেই।

বিশৃঙ্খলাকে নিষিদ্ধ করে দেন গিলভিক, প্রতিটি শব্দ ও শব্দের অন্তর্গত স্পেস ওজন করে নেন। জ্যামিতিক বিন্যাসও তাঁর কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে। নৈঃশব্দ্যও যেন শব্দের শরীরে কান পেতে থাকে। প্রতিধ্বনিময় ন্যূনতম কথা।

তোমার নিতম্ব, তোমার ঠোঁট জন্ম দিচ্ছে গাছপালার,
জন্তুরা আশায় আর্তনাদ করতে করতে
চলে যায়
অতৃপ্ত মাংসের চিৎকারের অপেক্ষায়
তুমি চেটেপুটে অনুভব করছ লেগুনকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমার আঙুল উঠে এল বল্কল বেয়ে
তুমি তোমার ত্বকে মেখে নিয়েছ
মাটি।

(দিনরাত)

আমি হই-হট্টগোলের মধ্যে ছিলাম।

প্রত্যেকবার গর্ত খোঁড়ার আওয়াজ
আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।
আমি কান্নার জন্য অপেক্ষমাণ,
নতুন করে শুরু করার জন্য।
মুছে ফেলার জন্য,

নিস্তব্ধতায়
ফিরে যাওয়ার জন্য।

(হট্টগোল)

যা কিছু পাথরের মধ্যে নেই,
যা কিছু পাথর ও মাটির দেওয়ালের মধ্যে নেই,
এমনকী গাছের মধ্যেও নয়,
যা কিছু সব সময় একটু একটু কাঁপে,

আশ্চর্য, তা আমাদের মধ্যে রয়েছে!

(যা কিছু)

ঘুমের দরজা ঠেলে আমি দেখতে পাচ্ছি স্থূলকায় শরীরে যেন এক স্মৃতিস্তম্ভ হেঁটে চলেছে। ট্রিম করা সাদা দাড়ি, শ্বেত জ্যোতির্বলয়ের মতো চুল, ঘন গভীর ভ্রুযুগল এবং মা'র ভালবাসা না-পাওয়া শক্ত ঠোঁট ও চিবুক। কঠিন ও কোমল, হালকা ও স্বচ্ছ তাঁর শিলা-দৃষ্টি।

সেই দৃষ্টিতে এক শুদ্ধ, অনলংকৃত বিষণ্ণ উন্মুক্ততা।

উদ্ধৃত কবিতাংশের অনুবাদ [illegible]

১৬ জুন ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৩

প্যারিসের ত্যুইল্‌রি বাগানে লোকজনের ভিড়। বাচ্চারা খেলা করছে। ছোট জলাধারটির ধারে টিনের চেয়ারে বসে এক ভদ্রলোক একটি করে কবিতা পড়ে পাতাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছেন হাওয়ায়। কয়েকটি পৃষ্ঠা পায়রা হয়ে উড়ে গেল আকাশে। দু'-একটি পৃষ্ঠা নাচের ভঙ্গিতে জলে নামতে-না-নামতেই কাগজের নৌকো হয়ে ভাসতে লাগল।

আমি কান পেতে তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনি:

> Fille et mère et mère et fille et fille et mère et mère et fille et fille et mère et mère et fille et fille et mère et mère et fille et fille et fille et fille et mère.
>
> মেয়ে এবং মা এবং মা এবং মেয়ে এবং মেয়ে এবং মা এবং মা এবং মেয়ে এবং মেয়ে এবং মা এবং মা এবং মেয়ে এবং মেয়ে এবং মা এবং মা এবং মেয়ে এবং মেয়ে এবং মেয়ে এবং মেয়ে এবং মা।
>
> ('ঘুমপাড়ানি')

আরে! এ তো পল এল্যুয়ার! আমি মনে মনে বলি। ভালবাসার মুক্তোমালার মতো যাঁর কবিতা। আশপাশের লোকজনের পোশাকআশাক, টুপি, ছাতা, ভাবভঙ্গি দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল এটা আশি-পঁচাশি বছর আগের প্যারিস।

এল্যুয়ার পড়ছেন নিচু গলায়, অনেকটা অরুণ মিত্রের মতো করে:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাসির বাড়ির ওপর
একটি পাখি হাসে তার পালকে মুখ গুঁজে

('হাসির বাড়ির ওপর')

অথবা

বালক শব্দটা
একটা ছোট দ্বীপের মতো।

এই শব্দগুলির আর কটা বাকি
যা আমাদের কোথাও
পৌঁছে দেয় না।

('কয়েকটি রহস্যময় নিষিদ্ধ শব্দ' থেকে)

বা

পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো নীল

('নীল রঙের পৃথিবী')

কিংবা

রাস্তাটাকে আমি গেলাসের মতো করে ধরি
যা মুগ্ধ আলো
আর হালকা কথায় ভরা...
যারা হাঁটতে বেরিয়েছে তারা সব খড়ের মানুষ
নীল অনুপস্থিতির পাখিরা
উৎকণ্ঠিত একটি ফ্যাকাসে রোগা মেয়ে
বারবার ফিরে ফিরে আসে।

এ তো স্যুররেয়্যাল...! কী বিস্ময়কর। আমি বিড়বিড় করি, এই স্যুররেয়ালিস্ত্‌রা কোথা থেকে এলেন, কোথায় গেলেন!

তারপর একটা নাগরদোলার মধ্যে কখনও আঁদ্রে ব্রতঁ, ফিলিপ সুপো, পিয়ের রভের্দি, কখনও বাঁজাঁম্যাঁ পেরে বা লুই আরাগঁ...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWX
YZ

('আত্মহত্যা', আরাগঁ)

পারসিনী পারসিনী পারসিনী পারসিনী... ('পারসিনী', ঐ)

ভোরবেলার শাদা বাতাসে একটি জানলা খুলে গেল
কথা বলার জন্য
উঠোনে বেহালার কর্কশ শব্দ একটি চাবির মতো
('খেলোয়াড়েরা', রভের্দি)

ছাদের ওপর
একটুও আলো নেই
শুধু সূর্য
এবং তোমার আঙুলের সংকেত
('হাওয়া', ঐ)

বাথটবের মধ্যে একটি হাতি
তিনটি বাচ্চা ঘুমোয়
অদ্ভুত, অদ্ভুত ইতিহাস
ডুবন্ত সূর্যের ইতিহাস
('গোধূলি', সুপো)

ঝাঁটাগুলোকে নিয়ে এসো
পোনা[illegible] মতো রঙ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঐ যে ছোট ছোট গাড়ি
ঐ যে সেপ্টিপিন
ঐ যে উঁচু উঁচু টুপি
ঐ যে হরিদাসবাবু চলেছেন
খবরের কাগজের স্টলগুলো এখনও খোলা
লুটেপুটে নিতে শেখো

('সংগ্রহ', ঐ)

জামাকাপড়ের দোকানদার আয়নাবাবু
গত সন্ধেয় মারা গেছেন প্যারিসে
এখন রাত
এখন অন্ধকার
এখন প্যারিসে অন্ধকার রাত

('মৃত্যুময়', ঐ)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চেনা বাস্তবকে ভেঙে চুরমার করে দিল, তখন তার মোকাবিলা করার জন্য এক নতুন বেদ্যমানতা নিয়ে প্রস্তুত হলেন কবি ও শিল্পীরা, এমনকী কথাশিল্পী ও নাট্যকাররা। যুদ্ধের সময় যখন চতুর্দিকে নিহত হচ্ছে তরুণেরা, যখন প্রবীণরা কোনও ভরসা দিতে পারছেন না, তখন 'শিল্প-বিরোধী' হিসেবে রুদ্ররূপ নিলেন 'দাদাবাদী'-রা। সংবাদে প্রকাশ, ১৯১৬ সালের ৬ অক্টোবর (?) জুরিখের 'ক্যাবারে ভলতের'-এ রুমানীয় কবি ত্রিস্তাঁ ৎসারার উপস্থিতিতে দাদাবাদের জন্ম। ফরাসিতে 'দাদা' মানে 'খামখেয়াল', যেমন রুমানিতে 'হ্যাঁ হ্যাঁ'। কীভাবে বহুশতাব্দী প্রাচীন সাহিত্যভাষার কাপড় খুলে নিয়েছিলেন তার উদাহরণ ৎসারার বিখ্যাত কবিতা 'কী করে লেখা হবে দাদাবাদী কবিতা':

একটি খবরের কাগজ নাও
আর কাঁচি
সেই কাগজ থেকে তুমি যেমন মাপের কবিতা চাও
তেমন একটি নিবন্ধ বেছে নাও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যত্ন করে প্রতিটি শব্দ কেটে নাও
আর একটি বাক্সে রাখো,
এবং আস্তে আস্তে ঝাঁকাও।
তারপর প্রতিটি শব্দকে একটি একটি করে বের কর।
যেভাবে বেরিয়েছে সেভাবে কপি কর।
কবিতাটি তোমার মতো।
তুমি এক অনন্ত ক্ষমতাধর স্বতন্ত্র কবি,
অশিক্ষিতের দঙ্গল তার মূল্য না দিলেও।

দাদাবাদীদের ক্ষুব্ধ কোলাহলের অনতিদূরে একটি ঘরে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন রাশিয়াতে বিপ্লবের ছক তৈরি করছিলেন! এ নিয়ে টম স্টপার্ডের একটি নাটক আছে (যার তিনটি চরিত্র হলেন ৎসারা, লেনিন ও জয়েস)। ৎসারা ফরাসি আভাঁ-গার্দের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেছিলেন... আপোলিনের, আঁদ্রে ব্রতঁ, মাক্স জাকব...। ১৯২১ সালে প্যারিসের 'স্বাধীনচেতাদের চিত্রশালা'-য় প্রদর্শনী করেন দাদাবাদী শিল্পীরা। কিন্তু প্রকৃত নেতার অভাবে দাদাবাদ অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে মিশে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু স্যুররেয়ালিস্‌ম্‌-এর অভিযাত্রীরা?

নৈরাজ্যময় ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গির পরিবর্তে এঁরা আনলেন অবচেতনের গভীরে ব্যক্তিগত এক অন্বেষণ। দাদাবাদ থেকে স্যুররেয়ালিস্‌ম্‌-এর উৎপত্তি হলেও সুররেয়ালিস্তরা একটি দার্শনিক ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন তাঁদের ভাবনাকে। ফ্রয়েডকে তাঁরা তাঁদের অন্বেষণের অঙ্গ করে নিলেন। যুক্তিহীনতার উৎসবের আড়ালে ঘোষিত হল ফ্রয়েডীয় অবচেতনের যুক্তি।

এই আন্দোলনের প্রধান নেতা এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন সাহিত্যভাবুক আঁদ্রে ব্রতঁ। নরমাঁদির ত্যাঁশব্রে অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, ডাক্তারি আর মনস্তত্ত্বের ছাত্র। নাঁত-এর নিউরোলজি বিভাগে আলফ্রেদ জারি ও জাক ভাশে-র সঙ্গে দেখা। শিল্প-ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁদের বিতৃষ্ণা ব্রঁত-কে প্রভাবিত করে। ১৯১৯ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে যুক্ত হন বিশ শতকের ফরাসি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ মহারথীরা: সুপো, আরাগঁ, এল্যুয়ার, রনে এভেল, মিশেল লেরিস, বাঁজাম্যাঁ পেরে, আঁতোন্যাঁ আর্তো এবং রবের দেসনস।

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯২৪ সালে প্রকাশিত 'সুররেয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে অভিধানের ভঙ্গিতে এইরকম সংজ্ঞা দেওয়া হল সুররেয়ালিস্‌মের:

স্যুররেয়ালিস্‌ম্‌, বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ। বিশুদ্ধ মানসিক স্বয়ংক্রিয়তা, যার সাহায্যে মৌখিক বা লিখিতভাবে, অথবা যে কোনও ভাবে চেষ্টা করা হয় চিন্তার প্রকৃত পদ্ধতি প্রক্রিয়াকে প্রকাশ করতে। যুক্তির সমস্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, চিন্তার শ্রুতিলিখন।

দার্শনিক অর্থ: স্যুররেয়ালিস্‌ম্‌ কতগুলি অনুষঙ্গে প্রকাশিত এক উচ্চতর বাস্তবে বিশ্বাস করে, যাকে এর আগে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বিশ্বাস করে স্বপ্নের সার্বভৌমত্বে, চিন্তার নিস্পৃহ ক্রীড়ায়। সে চেষ্টা করে শেষ বারের মতো সমস্ত মানসিক পদ্ধতি-প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানে অংশ নিতে।

একদিকে এক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারণা, অন্য দিকে এক দার্শনিক একবাদ। 'মনে হয় মনের মধ্যে এক বিশেষ বিন্দু আছে যেখানে জীবন ও মৃত্যু, বাস্তব ও কল্পনা, অতীত ও ভবিষ্যৎ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, উচ্চ ও নীচকে আর পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয় না।' (ব্রঁত, 'দ্বিতীয় ম্যানিফেস্টো', ১৯২৯) কবিতাকে জীবনের মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা, যেখানে স্যুররেয়ালিস্‌মের সঙ্গে যুক্ত হয় ইতিহাসের এক নতুন মাত্রা।

কোথা থেকে এল এই 'বৈপ্লবিক' উদ্যোগ? পণ্ডিতরা মার্কি দ্য সাদ এবং ফ্রয়েড'কে তাঁদের পূর্বসূরি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কারণ তাঁরাই ছিলেন 'ইচ্ছে থেকে মুক্তির মহানায়ক'। অনেকে কবি র‍্যাঁবো, লোত্রেয়ামঁ এবং নাট্যকার আলফ্রেদ জারিকে স্যুররেয়ালিস্‌মের আদি উদ্‌গাতা বলে মনে করেন। আর এঁদের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ধরা হয় গিয়োম আপোলিনের, ব্লেজ় সাঁদ্রার্‌স্‌, পিয়ের রভের্দি, দে কিরিকো এবং সালভাদর দালিকে।

ফরাসি বিপ্লবের পর সমাজকে তোলপাড় করা এমন আন্দোলন আর হয়নি, এমনটাও ভেবেছিলেন এই নতুন অভিযাত্রীরা। ইউরোপীয় বিবেককে মুক্ত করার পিছনে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, মার্ক্সবাদের পাশাপাশি আগেই বলেছি অবচেতনের অন্ধকার মহাদেশের ভূমিকাও কম নয়। এ যেন এক নতুন মানবতাবাদ, যা বিভ্রান্তি, গতি আর অসম্পূর্ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ যেন নতুন এক নৈতিকতা, নতুন এক নন্দন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শোনা যায়, একরোখা ব্রঁত নাকি একবার তাঁদের সমালোচনা করার জন্য ও 'সমকামী' আখ্যা দেওয়ার জন্য প্যারিসের রাস্তায় ইলিয়া এরেনবুর্গকে কয়েকটি থাপ্পড় মেরেছিলেন!

বিদ্রোহ আর আত্মহত্যা-চিন্তার ভেতর দুলতে দুলতে, অবচেতনের ভূগোলকে বুঝতে চেয়ে, চিন্তার 'জঘন্য কয়েদখানা' থেকে মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে তাঁরা চিত্রকল্প আর কল্পনাশক্তির অবিসংবাদিত জয় ঘোষণা করেন, যা নাটক ও চলচ্চিত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল!

অনেক স্যুররেয়ালিস্তই, যেমন এল্যুয়ার ও আরাগঁ, স্বতঃশ্চল লিখনের মায়া ত্যাগ করে কমিউনিস্ট হয়ে যান। কিন্তু ইতিহাসের এক জাদু-মুহূর্তে সাধারণ বাস্তবকে খুঁড়ে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব অসাধারণকে আবিষ্কার করার জন্য ব্রঁত এবং প্রতিভাবান সহযোগীরা চেষ্টা করেছিলেন।

এই পোড়ারমুখো পৃথিবীতে, এক অন্ধকার আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে, স্যুররেয়ালিস্তরা আশ্চর্যকে খুঁজেছিলেন।

আশ্চর্যকে।

৩০ জুন ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৪

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।

কলকাতার রফি আহ্‌মেদ কিদোয়াই রোডে 'প্রভু যিশুর গির্জা'-র সামনে, ট্রামলাইনের ধারে, এক গরিব মুসলমানের দোকানের সামনে রাস্তায় পা ছড়িয়ে বসে পরমানন্দে খাবার খাচ্ছেন এক দীর্ঘকায় প্রবীণ শুভ্রত্বক ধর্মযাজক। তাঁর সূক্ষ্ম রসিকতায় দিনদুপুরে জ্বলে উঠছে আলোর ফুলঝুরি।

কে ওই সৌম্যকান্ত রসিক?

ঘুমের মধ্যে এমন হয়। 'শতভিষা' নক্ষত্রের সঙ্গে খেলা করতে করতে আকাশ পৃথিবীকে বিনির্মাণ করে স্বাধীনভাবে প্রজাপতির মতো ওড়ার অবাধ অধিকার অর্জন করে নেয় মন।

আমি সেই মানুষটিকে দেখছি শ্যামপুকুরের তেলিপাড়া লেনে, পাড়ার বাচ্চারা তাঁর ঘরে খেলা করছে। তিনি টর্চ দিয়ে তাঁদের সিনেমা দেখাচ্ছেন। সাইকেল চালিয়ে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর দিকে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখছি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গোথ্যেল্‌স গ্রন্থাগারে অথবা উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে। এত একাগ্রচিত্তে কী নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি?

খুঁজছেন। অনন্তকাল ধরে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যা করেছেন, খোঁজা। বাংলা সাহিত্যের পুষ্পোদ্যানে গাছ থেকে গাছের সমীপে গিয়ে গভীর যত্নে ফুল চয়ন করছেন তিনি। ৪৮৫ জন বাঙালি গদ্যকারের সেই সব রচনা অঞ্জলিতে ভরে নিয়ে আসছেন 'গদ্যপরম্পরা' নামে ফুলদানির মতো একটি সংকলন বানানোর জন্য। অথবা দেখছি, গভীর রাত পর্যন্ত গবেষণা করছেন উইলিয়াম কেরি-র 'ইতিহাসমালা' নিয়ে। যে-কাজ আমাদের করার ছিল, তা সম্পূর্ণ করলেন তিনি।

কে ওই নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী? যিনি পৃথিবীর আরেক প্রান্ত থেকে ছুটে এসে খুঁজে চলেছেন পরশপাথর?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি দেখতে পাচ্ছি, বেলজিয়ামের ফরাসিভাষী দক্ষিণাঞ্চলের মাঠ-জঙ্গল-পাহাড়ের কোলে একরত্তি হিরের মতো শহর রশফরে বই হাতে এক সুদর্শন মেধাবী বালককে। দেখছি ম্যজ় নদীর ধারে দিনাঁ শহরের বেলভ্যু স্কুলে, তাঁকে দেখছি সন্ন্যাসব্রত নিচ্ছেন আরলঁ-র এক আশ্রমে। মা দুঃখ পেলেন ছেলে দূরে চলে যাবে, কিন্তু বাধা দেননি। নামুরে ভারততত্ত্ব পড়ছেন, পড়ছেন সংস্কৃত। শংকর আর রামানুজ বিশেষজ্ঞ তাঁর গুরু ফাদার জোহান্‌স তাঁকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন 'ভগ্‌বদগীতা'-য়, 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', 'উত্তররামচরিত' আর 'রত্নাবলী'-তে। পড়ছেন হঠাৎ হাতে পাওয়া জে ডি অ্যান্ডারসনের বাংলা ব্যাকরণ। তাতে পড়ছেন রোমান হরফে 'মেজদিদি' 'নৌকাডুবি', 'স্বর্ণলতা', 'মেঘনাদবধ কাব্য'-র উদ্ধৃতি, আর রবীন্দ্রনাথের গান 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।'

১৯৪৯ সাল। লন্ডনের টিলবেরি পোর্ট থেকে বোম্বাই পর্যন্ত ষোলো দিন জাহাজে, তারপর দু'দিন ট্রেনে চেপে কলকাতায়। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে ভিড়ের মধ্যে গলা ফাটিয়ে ২৫ বছরের বেলজিয়াম যুবক চেঁচাচ্ছেন, 'জয় হিন্দ'।

কেরি-স্মৃতির রেণু-মাখা শ্রীরামপুরে বসে শুরু করছেন বাংলা শেখার সাধনা। হাঁড়ি-কলসি-কুঁজো-গামলার তফাত শিখছেন, মুখস্ত করছেন মশলাপাতির নাম। পড়ছেন অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল', 'শকুন্তলা', রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' পরশুরামের 'গড্ডলিকা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', সৈয়দ মুজতবা আলী-র 'চাচা-কাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী'। পুথি-পড়া বাংলাকে বাস্তবে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য সুন্দরবনের বাসন্তীতে চলে যাচ্ছেন তিনি।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬। থিওলজি পড়ার জন্য কার্শিয়ঙে থাকতে থাকতে প্রকাশিত হল 'লেখকের লেখনী' বলে একটি রচনা ক্যাথলিকদের কাগজ 'আমার জীবন'-এ। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৮, শান্তিনিকেতনের ছাত্র। সেখানে দেখা হল ইন্দিরা দেবী, অন্নদাশংকর, লীলা রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, ক্ষিতীশ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ, আলী সাহেবের সঙ্গে।

১৯৬১ সালে কলকাতায় এসে প্রথম কালীঘাটে, তারপর তেলিপাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে চলছে পশ্চিমী এই ভাষা-ভাবুকের ভাষানির্মাণের সাধনা।

১৯৫৯ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গায়ে কাঁটা দেওয়া এক সহজতা নিয়ে। যে ভাষা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের চেনা, যে ধুলোমাটিমাখা বাংলার গায়ে রোদ্দুরের ঝিলিক, কখনও-বা বৃষ্টিভেজা আকাশে রামধনুর সাত রং। কয়েক শতাব্দীর বাংলা ভাষার নির্যাস যেন মিশে যাচ্ছে কথ্য ভাষার ছন্দের সঙ্গে।

জোসেফ কনরাড পোলিশ হয়ে ইংরেজিতে লিখেছিলেন, কাফকা চেক হয়ে জার্মানে, কিংবা মিলান কুন্দেরা চেক হয়ে ফরাসিতে, কিন্তু সেগুলো ছিল পাশ্চাত্যেরই ভাষা। অন্য এক গোলার্ধের, অন্য এক সমাজ ও সংস্কৃতির ভাষাপ্রবাহকে হাড়েমজ্জায় আত্মস্থ করার এমন আশ্চর্য উদাহরণ সারা পৃথিবীতে ক'টি আছে আমার জানা নেই। কখন তিনি নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছিলেন আমাদের অন্দরমহলে।

আমরা সবিস্ময়ে দেখছি, বেহালার ছড় নিয়ে খেলা করছেন ফাদার দ্যতিয়েন। গদ্যছন্দ আর শৈলী থেকে মন্দ্রিত হচ্ছে এক লঘুসংগীত।

১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ১০০টি কিস্তিতে প্রকাশিত 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা' থেকে নির্বাচিত ৩৬টি নিয়ে বেরল বইটি। 'অমৃত' পত্রিকায় 'রোজনামচা' প্রকাশিত হল ১৯৭৩ সালে।

ছেঁড়া পাতার জনৈক বিদঘুটে চরিত্রের মুখে মজা করে প্রস্তাব দিয়েছিলেন হগ মার্কেটের নাম হোক 'বউঠাকুরানীর হাট', আর রাইটার্স বিল্ডিংসের নাম হোক 'লিপিকা'। (সেই সঙ্গে পোস্ট অফিসের নাম হোক 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', আর পাসপোর্ট অফিসের নাম হোক 'যেতে নাহি দিব'।) খ্রিস্টান নামের বাংলা করেছিলেন অ্যান্টনি-অনন্ত, অ্যাঞ্জেলা-অঞ্জলি, ডেনিস-দিনেশ, সিমন-সোমেন।

আচার্য সুনীতিকুমারের ভাষায়, 'It is remarkable how you have made a complicated language like Bengali so much your very own and I thank you for drawing out some of the hidden powers of my mother-tongue in such a beautiful and convincing way, that Bengali is such an expressive language is once again demonstrated by your perfect little notes and observations.'

স্বরগ্রাম থেকে উঠে আসছে উষ্ণ আলোর পরিরা।

বিস্মৃতির কুয়াশা ছিঁড়ে ২০০৬ সালে কলকাতা থেকে সুদূর বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌সে ফোন করে এমন একজন, ১৯৬৯ সালে ডায়েরির প্রকাশ মুহূর্তে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যার বয়স ছিল দশ-এগারো। তারপর প্যারিস থেকে একদিন সে ট্রেন ধরে সোজা হাজির হয় ব্রাসেল্‌সে। ফাদার নিজে অভ্যর্থনা করেন তাকে। মরক্কোর অভিবাসীদের কাছাকাছি কয়েকজন পাদ্রির সঙ্গে বাস করেন তিনি। আরবি আর তুর্কি বলেন, টেবিলের ওপর ইতালীয় অভিধান রাখা, ফরাসিতে পুস্তক-সমালোচনা লেখেন, কে জানবে তিনি বাংলা গদ্যের সেরা রূপকারদের একজন?

১৯৭৮ সালে দেশে ফেরার পর প্রায় তিরিশ বছর বাংলা বলেননি, শোনেননি, লেখেননি। যখন কলকাতা থেকে সেই লোকটির ফোন এল ২০০৬-এর অক্টোবরে, সারা দিন শুধু রবীন্দ্রসংগীত শুনলেন যাতে অবচেতন থেকে ফিরে আসে সুর। 'তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না, ফিরিব না।'

আবার কলম ধরলেন তিনি।

কাচের মতো স্বচ্ছ জল কথকের ছন্দে ঘুরে ঘুরে কথা বলে। তমাল তরুটির ছায়ায়, যখন সূর্য সোনার রং ধরে, তখন নিচু গলায় যন্ত্রণার কথা কম বলেন না ফাদার দ্যতিয়েন। কিন্তু সেই যন্ত্রণাকে সূক্ষ্ম রসিকতার গুণে অশ্রুসজল রামধনুতে বদলে নিতে জানেন সাহেব।

ফাদার দ্যতিয়েনের 'গদ্যসংগ্রহ' (আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২)-র ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'দেশ' পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম এবং ফাদার দ্যতিয়েনের লেখাটিই প্রথম পড়তাম।... তাঁর লেখাগুলো এতই জীবন্ত যে, মনে হত যেন তিনি আমাদের পাশের বাড়ির লোক! কিংবা যে কোনও দিন তাঁকে দেখা যাবে শ্যামপুকুরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে।'

> শ্রীরামপুরের অর্পণা আর অপর্ণা দু'টি বোন— যমজ বোন, বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন homozygous, অর্থাৎ কিনা চেনার উপায় নেই। আমার এই মন্তব্য শুনে তাদের মা অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করে বলতে লাগলেন: 'দেখতে পাচ্ছেন না? কুটকুটের কান একটু বড় আর নাক একটু চওড়া; টুকটুক ওর চেয়ে সিকি ইঞ্চি লম্বা। এছাড়া, সেদিনের পরীক্ষায় কুটকুটের চেয়ে টুকটুক দেড় নম্বর কম পেল, তার অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছিল বলে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

...জিটি রোডের দু'ধারে সাইকেল করে যমজেরা আসছিল। মিষ্টি গলায় সুপ্রভাত জানাল। মাথা লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট রাইট করে নাক-কানের দিকে তুলনাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। ব্যর্থ চেষ্টা... পুঁতির মালা পর্যন্ত দেখা গেল না।

এখনও ভাবি: অ্যাপেন্ডিক্সহীন মেয়ে কোনটি?

(কুটকুট আর টুকটুক, 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা')

আমার এই ডায়েরির উড়ন্ত পাতাগুলো উইয়ে যদি না খায়, কোনও এক আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে তা কেউ যদি পায়, বিশ্রী হাতের লেখা আর উৎকট বাংলা দেখে বুঝবে— সাহেবের রচনা বটে।

বুঝবার আরও আছে। বাংলায় এসে প্রথম যে-চিঠি পেলাম তাতে দীপুর বাবা লিখেছিলেন, 'পরকে করেছ আপন।' হাত দিয়ে ভাত খেতে শিখেছি, দরজার সামনে জুতো রাখতে শিখেছি (দু'বার কুকুরে নিয়ে গিয়েছে), পদ্মাসন শিখতে গিয়ে পায়ে ব্যথা ধরিয়েছি, যে চা-কে দু'চোখে দেখতে পারতাম না, তা গ্যালন গ্যালন গলাধঃকরণ করেছি, চারটের সভায় ছ'টায় আসতে শিখেছি, খোলা মুখে স্বীকার করেছি যে, রসগোল্লা শ্রেষ্ঠ মিষ্টি (আমার মতে কিন্তু একটু বেশি মিষ্টি) আর ইলিশকে বলেছি মৎস্যের সম্রাট (আমার মতে কিন্তু কাঁটা কম থাকলে চলত), বিনিময়ে কিছু চাই নি, পেয়েছি কিন্তু অসীম ভালবাসা।

(উইয়ে যদি না খায়, ঐ)

খাতা থেকে চোখ তুলে দেখি, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ডুবু। সে এসেছে কাশী-থেকে-আসা-মাসির কেনা নতুন জামা ফাদারকে দেখাতে। আমি বললাম, 'বাটিক না কি?' ডুবু অবজ্ঞামিশ্রিত সহানুভূতির সঙ্গে উত্তর দিল, 'আপনি একদম কিছু জানেন না...'। তারপর আমার খাতা দেখে 'এত হিজিবিজি মাথামুন্ডু কি সব লিখছেন?' বলে জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে, বানান করে পড়ল 'দন্ত্য স দন্ত্য নয় নয়ে য-ফলা আ-কার দন্ত্য স দীর্ঘ ই সন্ন্যাসী... বাঃ, দুর্বাসার কথা লিখছেন না কি?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'নিজের কথা লিখছি।'

'রাম... আপনি সন্ন্যাসী? আপনার জটা কই? কোথায় আপনার কমন্ডলু?'

(মালতী-মাধবী, ঐ)

'আপনাকে কী বলে ডাকব?...' সম্বন্ধ পাতানো শিলুর যেন একটা রোগ। পাড়ার সমস্ত প্রতিবেশী তার কাকা, প্রতিবেশিনী মাত্রেই তার মাসি। তার বাড়িতে যত পুতুল আছে তারাও শিলুর খুড়তুতো ভাই, মাসতুতো বোন। আমি বুড়ো মুচির ফাদারবাবু, হিন্দুস্তানী নাপিতের ফাদারজি, হয়ে উঠলাম শিলুর ফাদার-দাদা। ...বাব্বাঃ... ফাদারদা... সম্বোধনটি পাড়াময় ছড়িয়ে পড়ল। বুবুন কিন্তু নাছোড়বান্দা; বুবুনের কাছে আমি 'মেমসাহেব' না, আমাকে বলতে বলবেন না বুবুর কথা; ওর জন্য 'মেমসাহেবে'র বড় কষ্ট হয়। মেয়েটি গত পুজোর ছুটিতে টাইফয়েডে মারা গিয়েছে, বিধমা মা'র একমাত্র সন্তান।

(ফাদার-দা, ঐ)

সুনীলদা ঠিক বলেছেন। ফাদার দ্যতিয়েন আমাদের পাশের বাড়ির লোক।

১৪ জুলাই ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৫

কত দিন, কত মন্থর, দীর্ঘ দিন
কত গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

('মদনভস্মের প্রার্থনা', সমর সেন)

সমুদ্র ডাকছে। বালিকাঁকড়ায় কামড়ে ধরেছে আমার পা, তবু সমুদ্রের প্রবালপঞ্জর থেকে উৎসারিত আলোর গুঞ্জন আমায় ডাকছে। ওই তীব্র আর অনন্ত প্রবাহ কি গভীর নীলাভতম স্বপ্ন মানুষের? ঘুমের মধ্যে টার্নারের ছবিতে আলো আর সমুদ্রঝড়ের অনুপম রূপবিভা দেখে মনে হয় আমার। বোদল্যের-এর কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে:

মুক্ত মানুষ, তুমি সমুদ্রের জন্য তৃষিত
সমুদ্র তোমার আয়না...

('মানুষ ও সমুদ্র')

শহুরে মালিন্য আর ক্লিন্নতার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর মনে হয়েছিল ('আমার নগ্নায়িত হৃদয়') কোনও এক সুদূর বন্দরের জাহাজগুলো যেন নিঃশব্দে বলছে, 'Quand partons-nous vers le bonheur?' (কবে আমরা সুখের অভিমুখে যাব?)

সমুদ্রের মাদকতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'L'invitation au voyage' (ভ্রমণের আমন্ত্রণ)-এর কবি লিখেছেন:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমুদ্রের রূপ কেন অনন্ত আর আবহমান? কারণ সমুদ্র একই সঙ্গে জাগিয়ে তোলে বিশালতা আর গতির অনুভূতি।

মানুষের কাছে ছ-সাত ক্রোশ হল অনন্তের পরিধি। এ অনন্ত ক্ষুদ্রাকার— কিন্তু যদি পূর্ণ অনন্তের কথা বলতে হয়? বারো-চোদ্দো ক্রোশ প্রবহমান তরল মানুষের এই অস্থায়ী জগতে সৌন্দর্যের মহত্তম ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

কবিতার অন্তঃমানচিত্রকে তছনছ করে দিয়ে যে-কিশোর লিখেছিলেন:

আমি নৈঃশব্দ্যকে লিখেছি, আমি রাত্রিকে লিখেছি। আমি অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করেছি। আমি মস্তিষ্কের অস্থিরতাকে সর্বক্ষণের জীবনরেখায় বদলে নিয়েছি।

সেই র‍্যাঁবো কুড়ি বছর বয়সের আগেই কবিতাকে চিরকালের মতো পরিহার করে সমুদ্রযাত্রায় যাওয়ার কথা লিখেছিলেন:

আমি ইউরোপ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সমুদ্রের হাওয়া আমার ফুসফুস পুড়িয়ে দিক।

('নরকে এক ঋতু')

জাভা, এডেন আর আবিসিনিয়া-র হারার-এ ভিনদেশি অভিজ্ঞতার পর র‍্যাঁবো-কে ফিরতে হল স্বদেশে (প্যারিস তখন তাঁর দিব্যোন্মাদ আবিষ্কারমালা নিয়ে পাগল, অথচ তিনি তা জানেনই না) ডান পা'র অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে। ২৭ মে ১৮৯১ ডান পা কেটে ফেলার পর আবার আফ্রিকা ফিরতে চাইছেন তিনি। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু এসে তাঁকে যেতে দেয়নি আর।

একেই কি ১৯২৭ সালে ফরাসিতে রচিত এক প্রবন্ধে 'বাস্তবের বিস্তার' বলে অভিহিত করেছিলেন টি এস এলিয়ট, যেখানে দান্তে আর বোদল্যেরকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি? বাস্তব যন্ত্রণা থেকে মুক্ত সমুদ্রযাত্রাই কি তবে নঙর্থক থেকে সদর্থকের পূর্ণ পথরেখা?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

This form, this face, this life
Living to live in a world of time beyond me; let me
Resign my life for this life, my speech for that unspoken—
The awakened, lips parted, the hope, the new ships.

('Marina')

এই জীবন এক হাসপাতাল যেখানে প্রত্যেক রোগী বিছানা বদলাতে চায়।

শেষ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে বিস্ফোরণ হয়, আর শান্ত ভাবে বলে:
যে-কোনও খানে! যে-কোনও খানে! যদি সেটা পৃথিবীর বাইরে
হয়, তবুও।

('প্যারিসের বিতৃষ্ণা', বোদল্যের)

কোন সে সমুদ্র যা বোদল্যেরকে হাতছানি দেয়? তিনি কোলরিজের সমুদ্রকে চেনেন না যেখানে মৃত্যু আর অসহায়তা!

The very deep did rot: O Christ!
That ever this should be!
Yea, slimy things did crawl with legs
Upon the slimy sea.

About, about, in reel and rout
The Death-fires danced at night;
The water, like a witch's oils,
Burnt green, and blue and white.

('The Rime of the Ancient Mariner')

তিনি চেনেন না সেই সমুদ্রকে যেখানে তাঁর ৩০তম জন্মদিনের আগেই ভেসে আসে শেলি-র শব! বোদল্যেরকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে টানে সমুদ্রপারের টিউলিপ আর নীল ডালিয়ার দেশ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমন অসম্ভব দেশ আছে কি কোথাও? প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে, যেমন ভূগোল-বিশারদ ফরাসি ভাবুক মারিও সেরভিয়াব্‌ল। 'উষ্ণ আর নীল' দেশগুলোতে তাঁর ভ্রমণের স্বপ্নিল মানচিত্রকে রূপকথায় ভরিয়ে দিয়েছেন বোদল্যের। ১৮৪১ সালে ভারত মহাসাগরে প্রথম এই সংঘবদ্ধ রূপকথার সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। সেটি জাগিয়ে তুলেছিল এক পূর্ণতার ইশারা। মালাবার-কন্যার মতো তাঁর কল্পনার ভারতবর্ষ— যেখানে তাঁর যাওয়া হয়নি— হল বর্ণময় বুরবঁ দ্বীপ, যার নতুন নাম লা রেয়্যুনিয়ঁ।

কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়ে (কলকাতা আর বোদল্যেরের যন্ত্রণা-কুসুম কী তীব্রভাবে মিলে যেত তা হলে!) অন্য দিকে চলে যাওয়া বোদল্যেরের এই রোমান্টিক সমুদ্রযাত্রা ছিল মোট ২৬৪ দিনের, ফ্রান্সের বর্দো থেকে শুরু হয়ে যার পরিসমাপ্তি বর্দোতে। সমুদ্রে ২০০ দিন, ডাঙায় ৬৪। আফ্রিকা মহাদেশের পায়ের কাছে ছিন্ন নূপুরের মতো মরিশাস দ্বীপে ১৯ দিন, আর খানিক দূরে লা রেয়্যুনিয়ঁ দ্বীপে রহস্যাবৃত ৪৫ দিন। উনিশ শতকের আরেক বিখ্যাত ফরাসি কবি ল্যকঁৎ দ্য লিল একবার সেখানে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু নামেননি। বোদল্যের নেমেছিলেন। আন্তঃসাংস্কৃতিকতার বিতর্ক কি সূচিত করলেন সেই দ্বীপের প্রথম বিশিষ্ট পর্যটক? রবের কপ-এর ভাষায় বোদল্যের 'আধুনিকতার কালো সূর্য' ('le soleil noir de la modernité')। কোনও কাজে নয়, বেড়াতেই এসেছিলেন তিনি। কতিপয় ধনী ক্ষমতাবান শ্বেতাঙ্গ সেখানে সংখ্যালঘু, সংখ্যাগরিষ্ঠ এক বহুসাংস্কৃতিক কৃষ্ণাঙ্গ জনতা। যেখানে শুধু কালো আফ্রিকা নয়, দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব ভারত থেকে আসা ক্রীতদাস কারিগররাও আছেন। গবেষকেরা মনে করেন কোনও নৃত্যরতা দেবদাসী ভারতীয় নারীই বোদল্যেরের কবিতার মালাবার-রমণী।

ভারত মহাসাগরে বোদল্যেরের যাত্রা বদলে দিল তাঁর কবিতা এবং সেই সঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের গতিপথ। মরিশাসের সমুদ্রতীরে পাঁপল্‌মুস বাগানে লেখা 'করেসপঁদাঁস' কবিতা (যা তাঁর কাব্যভাবনার কেন্দ্রকোরক) ধ্বনি, সুগন্ধি আর রঙকে গ্রথিত করল একসঙ্গে। হয়তো প্রকাশদ্যোতনায় ফরাসি কবিতা অতিক্রম করে গেল সংগীত আর ছবিকে। দ্যলাক্রোয়া-র ছবির একান্ত অনুরাগী বোদল্যের চিত্রকর আর সংগীতশিল্পীকে মিলিয়ে দিলেন।

এই অবিশ্বাস্য সমুদ্রমন্থনে বোদল্যের চিনলেন অন্য এক উজ্জ্বল ট্রপিকাল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নীল রঙের আভাকে, যার নাম ইন্ডিগো, যা ফ্রান্সের কাচশিল্পে খুঁজে পাননি তিনি। শুনলেন ভারতীয় ও মাদেবাসীয় সংগীত। শিখলেন মাদকের সাহায্যে অবচেতনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে। 'দাবামেস্ক' নামে স্থানীয় মাদকের অভিজ্ঞতা ভারতীয় মহাসাগরেই হল তাঁর। শিল্পীবন্ধু গ্যুস্তাভ কুর্‌বে-কে লিখলেন কালো বোর্ডের ওপর মাদকের উচ্ছ্বাসকে ধরে রাখতে।

কবিতার দর্শন আমূল বদলে যাচ্ছে বোদল্যেরের হাতে। 'আপনি আকাশ আর শিল্প থেকে কোন এক বীভৎস রশ্মি ছেঁকে নিতে পেরেছেন! আপনি সৃষ্টি করছেন এক নতুন শিহরন,' তাঁকে লিখলেন ভিক্‌তর য়্যুগো। 'আপনি কারুর মতো নয়', জানালেন গ্যুস্তাভ ফ্লবের।

শুধু এডগার অ্যাল্যান পো, দ্যলাক্রোয়া বা ভাগনার নয়, 'উষ্ণ আর নীল দেশগুলি' তাঁকে ভিতর অবধি বদলে দিল। দারুচিনি দ্বীপের মতো সেই ক্রান্তীয় দেশ দু'টি না দেখলে তিনি হয়ে থাকতেন শুধুই এক অবিস্মরণীয় নগর-প্রহেলিকার কবি। 'Fourmillante cité, cité pleine de rêves'...।

তাতে থাকত না ইন্ডিগো, অ্যাল্‌ব্যাট্রস কিংবা সবুজ স্বর্গের সারি-সারি তেঁতুল গাছ। সমকালীন জীবনের ক্লিন্নতার বিপরীতে ধ্বনি, সুগন্ধি আর রঙের গোপন রাগমালা। একই সঙ্গে ছন্দশৃঙ্খলার অধরা 'luxe, calme et volupté' (বিলাস, শান্তি আর ইন্দ্রিয়ময়তা), যা সমুদ্রপারের কোনও নবদূর্বাদল অচিন দেশের। থাকত না ভিতরে ভিতরে সেই নীল জলধারা যা বোদল্যেরকে র‍্যাঁবো-র ভাষায়, 'কবিদের রাজা, প্রথম দ্রষ্টা' করেছে।

৪ অগাস্ট ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৬

ঘুমের ভিতর দেখতে পাচ্ছি সুদূর ইতালির লেরিচি উপসাগরে ভেসে আসছে এক অবিশ্বাস্য রূপবান যুবকের শব! ঢেউয়ের মাথায় সাপের মণিতে ফসফরাসের মতো ঝলসে উঠছে তার মুখ। এত রূপ?

গত ৪ অগাস্ট শেলি-র জন্মদিন ছিল। আর সেই দিনই ফরাসি কবি বোদল্যেরের সঙ্গে সমুদ্র-অভিযানে বেরিয়ে ইংরেজ-কবি শেলির মৃতদেহকে আবিষ্কার করলাম আমি? অথচ শেলির মৃত্যুর সময় বোদল্যেরের বয়স মাত্র এক। ঘুমের মধ্যে এমন হয়!

তাঁর ৩০তম জন্মদিনের আগেই ১৮২২ সালের ৮ জুলাই লিভোরনো-তে দুই কবি-বন্ধু বায়রন আর লি হান্টের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময়, উলটে গিয়েছিল তাঁর পালতোলা নৌকা 'এরিয়েল'। 'প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ড'-এর কবিকে কি জলের গুল্মগুহায় টেনে নিল দেবতার গ্রাস?

ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার পাঁচ ক্ষণজন্মা রাজকুমারের একজন (উইলিয়াম ব্লেক-কে ধরলে ছয়)। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর চেয়ে বাইশ, কোলরিজ-এর চেয়ে কুড়ি, বায়রন-এর চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট ও কীট্স-এর চেয়ে তিন বছরের বড়। পার্সি বিসে শেলি (১৭৯২-১৮২২) জন্মেছিলেন সাসেক্সের ফিল্ড প্লেসে। বাবা স্যর টিমোথি ছিলেন বিশিষ্ট 'হুইগ' সাংসদ, পরে ব্যারনেট। সাংসদের সন্তান সংসদীয় রাজনীতির কদর্য ধাষ্টামিকে প্রত্যাখ্যান করে ('Power, like a desolating pestilence,/ Pollutes whate'er it touches.') হাতে তুলে নিয়েছিলেন কবিতার বিদ্রোহী জাদু-আয়না। দুর্দান্ত, কল্পনাপ্রবণ, বিষণ্ণ এই স্বপ্নদ্রষ্টা পড়াশোনা করেছিলেন ইটনের এক নামকরা স্কুলে আর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে। স্কুলে-কলেজে তাঁর পিছনে-পিছনে ছুটত ভেংচিকাটা সহপাঠীর দল, যারা তাঁকে 'পাগলা শেলি' আর 'ইটনের নাস্তিক' বলে খ্যাপাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কৈশোরে ভৌতিক (পোশাকি নাম 'গথিক') উপন্যাসিকা আর কবিতা লিখে গোপনে ছেপে লেখা শুরু করেছিলেন শেলি। অক্সফোর্ডে পড়লেন বৈপ্লবিক লেখকদের রচনা: টম পেন, কঁদরসে, উইলিয়াম গডউইন...। পরনে নানারকমের বিদঘুটে পোশাক: কলার-খোলা জামা, জ্যাকেট, মাথায় টুপি। অবশেষে 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা' নামে এক বিপজ্জনক ইস্তাহার লিখে কলেজে কলেজে, দোকান বাজারে আর বিশপ-দের কাছে বিলি করার জন্য অক্সফোর্ড থেকে বিতাড়িত হলেন তিনি। পিতার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে ১৮১১ সালে উনিশ বছর বয়সে হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক নামে এক ষোলো বছরের কিশোরীকে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন তিনি। এবং ধর্ম ও বিবাহে বিশ্বাস না-থাকা সত্ত্বেও এডিনবরায় পৌঁছে তাকে বিয়ে করলেন।

ভবঘুরের মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ালেন তিন বছর। ইয়র্কে পৌঁছে হ্যারিয়েটকে ভাগ করে নিতে চাইলেন বন্ধু টমাস জেফারসন হগের সঙ্গে। কবি রবার্ট সাদি-র সঙ্গে তর্ক করলেন, ডাবলিনে গণমঞ্চে বক্তৃতা দিলেন, গডউইনের সঙ্গে পত্রবিনিময় করলেন, প্রকাশ করলেন 'অ্যান অ্যাড্রেস টু দ্য আইরিশ পিপ্‌ল', মুক্ত গণমাধ্যম নিয়ে ইস্তেহার বিলি করলেন, লিখলেন, 'মানুষের অধিকার'। শেলি যে আসলে ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকারী সেটা স্পষ্ট হল।

ম্যাথু আর্নল্ড তাঁকে অকরুণভাবে 'দুর্বল আর নিষ্ফল এক দেবদূত' বলে অভিহিত করলেও, শেলি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে কবিরা পারেন, শুধু কবিরাই পারেন এক ন্যায়হীন, নিপীড়নছিন্ন পৃথিবীকে দিশা দেখাতে। তাঁরাই মানবজাতির পতাকাহীন বিধায়ক।

দু'টি সন্তান সত্ত্বেও ১৮১৪ সালের মধ্যে হ্যারিয়েটের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হতে চলেছে। এরই মধ্যে শেলি তাঁর গুরু গডউইন ('এনকোয়ারি কনসারনিং পলিটিকাল জাসটিস'-এর লেখক) এবং নারীবাদের অন্যতম উদ্‌গাতা মেরি ভোলস্টোনক্রাফ্‌টের মেয়ে মেরি গডউইন-কে নিয়ে উধাও হলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন মেরি-র সৎ বোন জেন 'ক্লের' ক্লেরমন্ট-কে। আট বছর ধরে চলল তাঁদের ত্রিকোণ প্রেম। যুদ্ধ-পরবর্তী ফরাসি দেশ, সুইজ়ারল্যান্ড এবং জার্মানিতে বেড়াতে বেড়াতে তাঁদের যৌথ দিনপঞ্জিতে (১৮১৭) সেসব কথা লিখলেন তাঁরা। শেলিও তা লিখলেন তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস 'হত্যাকারীরা'-তে (১৮১৪)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮১৬ সালে হ্যারিয়েট সারপেন্টাইন লেকে ডুবে আত্মহত্যা করলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শেলি বিয়ে করলেন মেরিকে। নানা রক্তমেঘ পার হয়ে অবশেষে শেলি মেরিকে নিয়ে এসে উঠলেন লন্ডনে। জন্ম হল প্রিয় সন্তান উইলিয়ামের। বায়রনের সঙ্গে রৌদ্রদীপ্ত প্রহর কাটালেন জেনিভা লেকের কোলে। তত দিনে স্ত্রী মেরি লিখতে শুরু করেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' আর শেলি শেষ করেছেন তাঁর সুরেলা অঙ্গুলিস্পর্শে 'হিম টু ইন্টেলেকচুয়াল বিউটি'।

শেলির নতুন বন্ধুরা ভাসিয়ে দিচ্ছেন রোমান্টিক সাহিত্যের মনপবনের নাও: লি হান্ট আর জন কীট্স। টেমস নদীর পাশে গ্রেট মার্লোতে এসে উঠেছেন শেলিরা। শেলি লিখছেন 'ইসলামের বিদ্রোহ'।

কিন্তু ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য, পাওনাদারদের তাড়া, লোকের ঘৃণা ও ক্রোধের আক্রমণে দিশাহারা শেলি'কে ইংল্যান্ড ছেড়ে ইতালিতে পাড়ি দিতে হল ১৮১৮ সালে। স্বতঃস্ফূর্ত সংগীতস্নাত গীতিকবিতার রাজা পার্সি শেলি পিছনে ফেলে গেলেন ওজ়িম্যান্ডিয়াসের মতো পাথরে খোদাই সনেট, ঘনত্বে আর ক্লাসিকাল নিরপেক্ষতায় যা ইংরেজি রোমান্টিক কবিতায় অবিস্মরণীয়। যে 'ক্ষমতা'-কে সারা জীবন ঘৃণা করেছেন শেলি, এখানে সেই 'ক্ষমতা'-রই ভবিতব্য তুলে ধরেছেন নিষ্করুণ ভাবে।

I met a traveller from an antique land
Who said: Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert... Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them, and the heart that fed:
And on the pedestal these words appear:
"My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!"
Nothing beside remains. Round the decay

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.

গ্রিক ভাস্কর্যের মতো রূপোচ্ছল এই যুবক যেন এক ঝড়। তিনি কখনও থেমে থাকতে পারেন না। ইতালিতে গিয়ে তিনি গ্রিক থেকে অনুবাদ করলেন প্লেটো-র 'সিম্পোজিয়াম', স্প্যানিশ থেকে কালদেরন, জার্মান থেকে গ্যোয়েটে, ইতালিয়ান থেকে দান্তে, এমনকী আরবি থেকেও! প্রাচীন গ্রিকদের নিয়ে এক দুঃসাহসিক প্রবন্ধ লিখলেন এবং বায়রনের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে একটি কবিতা, 'জুলিয়ান অ্যান্ড ম্যাডালো'। এই সময় সম্ভবত তাঁর নিজের এক রহস্যময় কন্যাসন্তানের দত্তক নিলেন তিনি, লিখলেন বিষাদদীর্ণ কবিতা 'স্ট্যানজ়াজ় রিট্‌ন্ ইন ডিজেকশন', ১৮১৯-এর বসন্তকালে শুরু করলেন তাঁর বিদ্রোহের মহাকবিতা 'প্রমেথিউস আনবাউন্ড।'

ছোট্ট মেয়ে ক্লারা আর প্রিয় সন্তান উইলিয়ামের মৃত্যু। মেরির স্নায়ুবিপর্যয়। লিভোরনো আর ফ্লোরেন্স হয়ে পিজ়ায় এসে উঠলেন শেলিরা। ১৮১৯ থেকে শুরু হল লিরিক কবিতার ফোয়ারা। মৃত্যু পর্যন্ত তিন বছর তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো লিখবেন শেলি। 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড', 'টু লিবার্টি', 'টু নেপল্‌স', 'টু আ স্কাইলার্ক', 'দ্য ক্লাউড'। এরই পাশাপাশি ক্রুদ্ধ রাজনৈতিক কবিতা 'সঙ্ টু দ্য মেন অফ ইংল্যান্ড'। চমক দেওয়া ছন্দের ঐশ্বর্যে ভরপুর কাব্যনাটক 'দ্য চেঞ্চি'।

মন ভাল নেই। এত করেও সাহিত্যের অগুকোষহীন বড়বাজার তাঁকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তাঁর খুব একা লাগে। স্নায়ুতে কী যেন কাঁপে।

২৯ বছর তাঁর বয়স। লিখছেন কবিতার সপক্ষে বিখ্যাত প্রস্তাবনা 'ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি', হিংস্র এক সামাজিক নিবন্ধ 'এসে অন দ্য ডেভিল' এবং স্ফটিকের মালার মতো কয়েকটি ছোট ছোট লিরিক।

মৃত্যুপথযাত্রী, যক্ষ্মাগ্রস্ত কীট্‌সের রোমে পৌঁছনোর সংবাদ পেয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন শেলি, কীট্‌স বললেন আসবেন, কিন্তু তাঁর আগেই অন্ধকার হয়ে গেল তাঁর পৃথিবী। তিন বছরের ছোট, হয়তো-বা শ্রেষ্ঠতর কবি জন কীট্‌সের মৃত্যুর খবর পেয়ে শেলি লিখলেন রক্তদীপ্ত এক শোকগাথা 'অ্যাডোনেস'। 'I weep for Adonais—he is dead!/O, weep for Adonais! though our tears/ Thaw not the frost which

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

binds so dear a head.' সেই মৃত্যুকবিতা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে শিশির।

ক্লের নেই, অস্থির হয়ে পড়ছেন শেলি। পিজ়ার এক সতেরো বছর বয়সি ইতালীয় রূপসি এমিলিয়ার প্রেমে পড়লেন তিনি। এবার আর তাঁকে নিয়ে কোথাও উধাও হলেন না। লিখলেন শুধু কবিতা 'এপিসাইকিডিয়ন'।

লি হান্ট আর বায়রন এসে হাজির পিজ়াতে। শেলি আবার নতুন করে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হচ্ছেন। লিখলেন গ্রিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রভাবিত তাঁর সর্বশেষ কবিতা 'হেলাস' (১৮২২)।

সমুদ্র তাঁকে ডাকছে। গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে... লেরিচি-র সমুদ্রবেলায় নির্জন এক বাড়িতে গিয়ে উঠলেন তিনি। ও কে? ও কে যায়?

দেখলেন বালুতটে হেঁটে যাচ্ছে একটি শিশু।

মেরি-র একটি সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ক্লের ভেঙে পড়েছেন বায়রনের ঔরসজাত তাঁর কন্যা আলেগ্রা-র মৃত্যুর পর, সমস্ত অশ্রু জমে হয়ে উঠছে তুষার। শেলি তখন সুর বেঁধেছেন বেহালায়:

When the lamp is shattered
the light in the dust lies dead-
When the cloud is scattered
The rainbow's glory is shed.
When the lute is broken,
Sweet tones are remembered not:
When the lips have spoken,
Loved accents are soon forgot.

তাঁর চিঠিতে তখন রঙ-তুলি দিয়ে সমুদ্রের জলছবি আঁকছেন শেলি। আর তাঁকে পেয়ে বসেছে এক মারণ-নেশা: তাঁর বিশেষ ভাবে তৈরি 'স্কুনার'-নৌকায়, যার নাম প্রথমে ছিল 'ডন জুয়ান', পরে 'এরিয়েল', বিদ্যুৎগতিতে ('like a witch') সমুদ্রবক্ষে নৌকাবিহার করা!

তারপর লিভোরনো থেকে ফেরার সময় একদিন এল ঝড়। আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে। উত্তাল ঢেউয়ের ভেতর শেলির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পালতোলা নৌকা দেখতে পেয়ে একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'চলে আসুন, অথবা পাল নামিয়ে নিন।' শেলি ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দেন, 'না।' তিনটি পালসমেত নৌকা ডুবে গেল শেলি, বন্ধু এডওয়ার্ড উইলিয়ামস আর এক কিশোর নাবিককে নিয়ে। যে প্রকৃতিকে নিজের প্রতিবিম্ব মনে করে নার্সিসাসের মতো ভালবেসেছিলেন তিনি, সেই প্রকৃতিই লিখল তাঁর সেনোটাফ।

হয়তো একমাত্র শেক্সপিয়রের লেখা গান ছাড়া, স্বতোৎসারিত গীতিমূর্ছনায়— স্কাইলার্ক যার প্রতিনিধি— ইংরেজি কবিতায়, সম্ভবত ইউরোপীয় কবিতায়, তিনি একক। গ্রিকরা যাকে বলত 'মেলোপিয়া' সেই চেষ্টাহীন সংগীত ছিল শেলির শক্তির উৎস। সাহস আর স্বাতন্ত্রে, অত্যাচার আর অবিচারের প্রতি ঘৃণায় কম্পমান ওই অনিন্দ্যসুন্দর আত্মা ঘুমঘোরে আমাকে বীণার তারের মতো মন্দ্রিত করে দিচ্ছে।

১৮ অগাস্ট ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৭

রাত আটটা।

ছোট একটি মেয়ে ঘুমিয়ে আছে বইপত্রের মধ্যে।

সীমাহীন অন্ধকারের কালো জল পার হয়ে আপার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে তার শেষ শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে আমি পাথরের উৎকীর্ণ মৃত্যুশব্দ পড়ি:

TORU DUTT
Youngest daughter of
Govin Chunder Dutt
BORN 4 MARCH 1856
DIED 30th AUGUST 1877

BE THOU FAITHFUL UNTO DEATH AND I
WILL GIVE THEE A CROWN OF LIFE.
Rev. ii 10

গোবিন চন্দ্র দত্ত মেয়ের বন্ধু মেরি মার্টিন-কে লিখছেন 'রক্ষাকর্তা যিশু খ্রিস্টের প্রতি গভীর আস্থা রেখে এই পৃথিবী থেকে তরু চলে গেছে। সে গেল রাত আটটার সময়। তার সমাপ্তিতে ছিল গভীর শান্তি।'

তরুর আরেক বন্ধু ক্লারিস-কে লিখেছেন: 'সে চলে গেছে সেই দেশে যেখানে মৃত্যু আর দুঃখ অজানা।... There has never been a sweeter child.'

১৮৭৬ সালে [illegible] অসুস্থ হল, মেডিকেল কলেজের ডা.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্মিথ এসেছেন দেখতে। গলা থেকে রক্ত পড়া থামে না যে। শিরার মধ্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হল তরুকে। ডাক্তারের হঠাৎ চোখে পড়ল ফরাসি থেকে তরুর অনূদিত কমলা রঙের 'আ শিফ গ্লিনড্ ইন ফ্রেঞ্চ ফিল্ড্স'-এ। 'তোমার বই?' মৃত্যুপথযাত্রী তরু লিখেছিল মেরিকে, 'এই যক্ষারোগিণী এইরকম একটা বই লিখেছে! তিনি বিস্মিত, কৌতূহলী, আনন্দিত। তবে দেখ, বইটা অন্তত কিছু করেছে!'

ফরাসিনী ক্লারিস বাদের-কে তরু লিখেছিল, 'আমার শরীর খারাপ। তোমার একটা ছবি পাঠালে ভাল হয়। সমস্ত প্ল্যান পালটাতে হচ্ছে। এপ্রিলে ইওরোপে যাওয়া হয়ে উঠবে না।'

দিদি অরু-র মৃত্যুর পর তরু লিখেছিল: 'Of all sad words of tongue and pen/ The saddest are these-it might have been'—যা হতে পারত।

প্রপিতামহ নীলমণি দত্ত কেরি সাহেবকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। ঠাকুরদা রসময় দত্ত ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ভাল ছাত্র। তিনি হিন্দু কলেজ কমিটি-র সেক্রেটারি হন। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন রসময়ের ভাই পীতাম্বরের নাতি। আর তরুর বাবা গোবিন চন্দ্র দত্ত হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ১৮৩৬ সালে এবং মধুসূদন দত্তের সঙ্গে অচিরেই হয়ে ওঠেন বিখ্যাত অধ্যাপক ডেভিড রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র। তিনি কম বয়স থেকে কবিতা লিখতেন। 'ব্ল্যাকউড্স' ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতার বইয়ের প্রশংসা করা হয়। সরকারি চাকরিতে ঢুকে তিনি শেষে 'অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টস' হন। বাঙালিদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ করায় তাঁর পদোন্নতি হয়নি। ফলে পদত্যাগ করে তিনি ধর্ম ও সাহিত্যচর্চায় মন দেন। দত্ত পরিবারের সৃজনশীলতার ছবি ধরা আছে ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত 'ডাট ফ্যামিলি অ্যালবাম'-এ।

রমেশচন্দ্র দত্ত বাগমারির বাগানবাড়ি প্রসঙ্গে লিখেছেন ফলগাছের ছায়াঘেরা অনেক একর জমির কথা, যেখানে ছিল জলের ওপর ছোট একটি সাঁকো। ফলগাছের অরণ্যের মাঝে বিরাট একতলা বাংলো— শান্তির প্রতিচ্ছবির মতো। লাইব্রেরিতে ছিল গোবিন চন্দ্রের সুনির্বাচিত বই।

অজু (১৮৫১-১৮৬৫), অরু (১৮৫৪-১৮৭৪), আর তরু (১৮৫৬-১৮৭৭)-র কথা বলতে গিয়ে গোবিন চন্দ্র এইরকম বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর ছোট মেয়ের: 'Puny and elf-like, with dishevelled tresses,/ Self-willed

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

and shy, ne'er heeding that I call,/ Intent to pay her tenderest addresses/ To bird or cat,—but most intelligent...'

বাবা চেয়েছিলেন মেয়েদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। ফলে তরু-অরুকে নিয়ে কালাপানি পার হলেন তিনি। ১৮৬৯ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সেই বন্দরে নেমে তাঁরা নিস্-এ পৌঁছন। উঠলেন রু্য দ্য ফ্রাঁস-এর এলভেতিক হোটেলে। সেখানে কাটল তিন-চার মাস। এক ফরাসি ইস্কুলে ফরাসি শিখল দুই বোন। আর কোনও ইস্কুলে তো তারা কখনও পড়েনি। তারপর আলাদা করে ফরাসি-চর্চা করল মাদাম শোয়াইয়ের কাছে।

ক্রমশ হৃদয়মনে ফরাসি হয়ে উঠছে উনিশ শতকের দুই বিস্ময়-বালিকা। তারা শুষে নিতে চাইছে ফরাসি-মনের বিশ্ব-জিজ্ঞাসাকে।

ভূমধ্যসাগরের নীল জল, রং করা পরিপাটি ভিলাগুলো, সর্বোপরি ফরাসিদের জীবনযাপনের দর্শন তরুকে মোহিত করে রাখে। সে কি ভিতরে ভিতরে খুঁজছিল এক গভীরতর সংযোগ? যা আমরা দেখব তার লেখা ফরাসি উপন্যাস 'ল্য জুর্নাল দ্য মাদমোয়াজেল দারভের' (কুমারী দারভেরের জার্নাল)-এ। যার মুখ্য চরিত্র মার্গ্যরিৎ যতটা ফরাসি, ততটাই বাঙালি। কান আর মনাকো'তে বেড়াতে যায় দুই বোন। ফরাসি সংস্কৃতিকে স্নায়ু-শিরা দিয়ে, অন্তর দিয়ে অনুভব করে।

নিস্-এ একটি বাড়ির টেবিলে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি দেখে পারিবারিক বন্ধু মি. বার্টন প্রশ্ন করেন সেটি কার মূর্তি। সকলকে বিস্মিত করে তরু-অরু পত্রপাঠ বলে, এ তো নিশ্চয় 'ডাইং গ্ল্যাডিয়েটর'! তৃতীয় নেপোলিয়নের কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে ফরাসি বিধানসভায় ভিক্তর য়্যুগো-র ১৮৫১ সালের মানবতাবাদী বক্তৃতা অনুবাদ করে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশ করে তরু। প্যারিসের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ। প্যারিসের দুঃখে, ফ্রান্সের দুঃখে সে ভেঙে পড়ে। ১৮৭০ সালে ফ্রান্সের পরাজয়ের সময় সে লিখল, 'Not dead,-oh no,-she cannot die!/ Only a swoon, from loss of blood'!

ফরাসি আবহাওয়ায় অরুর শরীর খারাপ হচ্ছিল। দত্তরা বিলেতে গিয়ে উঠল চেয়ারিং ক্রস হোটেলে, পরে ব্রম্প্টনে। পূর্বতন বড়লাট লর্ড লিটন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসে অরুকে জিজ্ঞেস করেন, 'হাতে কী বই?' অরু জানায়, সেটি একটি উপন্যাস। বড়লাট বলেন, 'উপন্যাস নয়, ইতিহাস পড়ো।' অরু থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। তরু হাসতে হাসতে বলে, তারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস পড়তে ভালবাসে, কারণ উপন্যাস সত্যি, ইতিহাস মিথ্যে। তরু যে ভারতবর্ষের মেয়ে, সে জানে পুরাণকথার শক্তি। তাই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান-কে বোঝাতে পেরেছিল উপন্যাসের জনপ্রিয়তা আর শিল্পোৎকর্ষের পার্থক্য।

সব কিছু বাদ দিলেও, শুধু কবি হিসেবে তরুর স্থান অনেক উঁচুতে। সম্ভবত আরেক দত্ত-কবির ইংরেজি কবিতার চেয়েও। এমন চিত্ররূপময়তা, জীবন ও প্রকৃতির এমন উৎসব, রঙের এমন খেলা, রং এবং ধ্বনির চমকপ্রদ ভারসাম্য আর সমন্বয়, এক অন্তর্লীন বিষাদময়তা, পাশ্চাত্যের আঙ্গিকের আত্মবিশ্বাসী ব্যবহারের সঙ্গে গভীর প্রত্যয় ও মমতায় ভারতীয়ত্বের বুনন তাকে করে তুলেছে একক। 'আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি', 'বাগমারি', 'আ মঁ পের' ('আমার বাবাকে')-র মতো কবিতা অনেক সেরা ভিক্টোরীয় ইংরেজি কবিতার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

তরু ফরাসি, ইংরেজি আর সংস্কৃত অভিধান তন্নতন্ন করে খোঁজে। শব্দ নিয়ে অর্থযুদ্ধে বারবার হেরে যান পিতা গোবিন। লেখে বিদ্যুৎদীপ্ত ইংরেজিতে আশ্চর্য মায়াময় সব কবিতা। আর অনুবাদ করে ফরাসি কবিতা। ভিক্তর য়্যুগো-র ৩১টি কবিতা বেছে নেয় সে, কারণ সে বুঝেছিল য়্যুগো-ই শ্রেষ্ঠ। অনুবাদ করে দ্যু বেলে, স্কারঁ, কর্নেই, ভলতের, নেরভাল, লামার্তিন, গোতিয়ে, আঁদ্রে শেনিয়ে, বোদল্যের, ল্যকঁৎ দ্য লিল, বেরাঁজে, স্যাঁৎ-বভ্..., ১৬৫টি অনুবাদের মধ্যে অরু করেছিল আটটি। তরু স্যুলি প্রুদম-এর কবিতাও অনুবাদ করেছিল, যিনি তরুর মৃত্যুর অনেক দিন পরে বিশ্বে প্রথম নোবেল পুরস্কার পাবেন! ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নোটগুলি সবচেয়ে বিস্ময়কর। ভবানীপুর থেকে কমলা রঙের মলাটে বিশ্রীভাবে ছাপা 'আ শিফ্ গ্লিন্ড ইন ফ্রেঞ্চ ফিল্ডস' পরে কেগান পল থেকে প্রকাশিত হয়।

তরুর ফরাসি উপন্যাসটির মুখবন্ধে ক্লারিস বাদের (যাঁর ফরাসি গ্রন্থ 'প্রাচীন ভারতের নারী' অনুবাদ করার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখে তরু পরে তাঁর বন্ধু হয়ে যায়) লিখেছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে এমন আরেকটিও উদাহরণ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ যেখানে এত স্বল্প সময়ে কেউ একটি বিদেশি ভাষাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নিখুঁত শৈলীতে সম্পূর্ণ একটি বই লিখেছেন।

তরুরা কেমব্রিজ থেকে ফিরে এলে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয় বালিকার সঙ্গে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলাপ হয়েছিল। পরে মেরিকে লেখা ৫৩টি চিঠিতে এক অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর কিশোরীর জীবনবোধ ফুটে ওঠে। সেখান থেকে লেনার্ড অন সি-তে যান দত্ত পরিবার। সেখানে চলে ম্যসিয়ো জিরার-এর কাছে তরুর ফরাসি পাঠ।

উনিশ শতকের শেষার্ধের ব্রিটেন নয়, ফরাসি দেশ দুই বোনের মনে গভীর রেখাপাত করে। 'Poor, poor France, how my heart bleeds for thee!' ফরাসি-প্রুশিয় যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের পরাজয়ে তরুর হৃদয়ে রক্তপাত হয়।

উনিশ শতকে বিশ্বসমুদ্র মন্থন করে বিষের সঙ্গে যে মধু উঠেছিল, তা প্রথম যারা পান করে তাদের একজন তরু। তার হৃদয়ের জমি ছিল ভারতীয়, আর আকাশ ছিল সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। মায়াবীর মতো জাদুবলে এই স্বপ্নিল মিশ্রণ কী করে যেন ঘটে গিয়েছিল রামবাগানের ১২ নং মানিকতলা স্ট্রিটে!

বিলেত থেকে প্যাকিং বাক্সে তাদের মা এনেছিলেন হাজারটা গাছের বীজ আর চারা। তাদের পুকুরে শ্বেতলিলি আর রক্তপদ্মের কথা লেখে তরু। লেখে হায়াসিন্থের কথা। 'ইংরেজদের বাগানের ফুলে সুগন্ধ নেই, আমাদের ফুলের যেমন আছে।' হাঁস, মুরগি, বেড়াল, বানর, ঘোড়া, শজারুকে নিয়ে তরুর জগৎ। ক্যানারি পাখির জন্য সে মশারি টাঙায়। এগারো বছরের মাজা বেড়ালটা মরে গেলে পুকুরপাড়ে ঝাউ গাছটার নীচে কবর দেয় তারা। তরুর বেড়ালের নাম বাগেৎ। ঘোড়া দু'টির নাম জানেৎ আর জাঁতিই। মেরিকে তরু লিখেছে, অরু মাছ ধরতে ভয় পায় পাছে বিরাট বড় মাছটা তাকে টেনে নিয়ে জলে ফেলে দেয়। তার তো শরীর ভাল নয়। তরুও মাছ ধরে না একই কারণে।

যখন অরু চলে গেল চাঁদের দেশে, তরুর শরীর দুর্বল, নীচে এসে পিয়ানো বাজাতে কষ্ট হয়। কিন্তু বইয়ের কোনও অভাব নেই। রামবাগানের বই পাঠানো হয়েছে বাগমারিতে, যেখানে অনেক বেশি পরিসর। খাওয়াদাওয়া, টেনিস, পিকনিক সব বন্ধ। এখন শুধু পড়া, লিখেছে তরু।

জীবনীকার হরিহর দাস (হা ঈশ্বর! কেমন করে এমন জীবনীকারও সে পেয়েছিল) লিখেছেন, তরু যেন অর্ধস্ফুট একটি গোলাপের কুঁড়ি। সে বোঝে না কেন হান্টারের মতো পণ্ডিত তার সঙ্গে দেখা করতে চান। 'আমি খুব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছি। ড. হান্টার আমাকে আর আমার ক্ষমতাকে নিয়ে এমন করলেন যে আমার লজ্জা হচ্ছে। আমার তো শুধু একটা অনুবাদের বই। ড. হান্টার কত বই লিখেছেন!'

১৮৭৪ থেকে তরু যেন ঘোরের মধ্যে সৃষ্টি করে চলে। মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভঙ্গুর শরীরে কী করে তরু এমন অসীম শক্তি পেল! সে যখন সংস্কৃত পড়ে, অথবা বিলেত থেকে আনানো কোনও সাতরঙা বই, বিছানার পাশে বসে থেকেছেন তার বাবা, যাঁর স্নেহস্পর্শ আর বিদ্যাবত্তা ছাড়া কালপুরুষের আশীর্বাদ ঝরে পরত না তার মাথায়। বন্ধুকে সে লিখেছে, 'Papa is so careful. I tell him he should keep me under a glass case...

তার ফরাসি উপন্যাস 'কুমারী দারভেরের জার্নাল' কি লুকিয়ে লুকিয়ে লিখেছিল সে? মেরি-কে লেখা কোনও চিঠিতে সে একবারের জন্যও উল্লেখ করেনি এটির কথা। দুই ভাই ভালবাসে একটি মেয়েকে। যাদের একজন ঈর্ষান্বিত হয়ে খুন করে অন্যজনকে। পদ্মিনী সেনগুপ্ত মনে করেছেন, তরু এখানে পুনর্নির্মাণ করেছেন মা'র কাছে শোনা শুম্ভ-নিশুম্ভ'র কাহিনি। মার্গ্যরিৎ-এর চরিত্রের বেদনা, সংসার করা, সন্তানধারণের স্বপ্ন আর অকালমৃত্যু এই অতিনাটকীয় প্রেম-কাহিনিকে কুয়াশার মতো ঘিরে রেখেছে।

যখন তরু চলে যাওয়ার পর ফ্রান্সে ছাপা হল সেই উপন্যাস, জেমস ডার্মস্টেটর লিখলেন, 'কিছুতেই বোঝার উপায় নেই এটি এক বিদেশিনীর লেখা।... এটি তুলনাহীন ও অসাধারণ এক সাফল্য।' ইংরেজিতে লেখা তরুর দ্বিতীয় উপন্যাস 'বিয়াঙ্কা অর দ্য স্প্যানিশ মেডেন'-ও বিষাদমাখা এক অসমাপ্ত টুকরো। এক শীতার্ত দিনে বিয়াঙ্কার দিদির মৃত্যু নিয়ে কাহিনি শুরু। অতিনাটক সেখানেও কম নয়। প্রেমের পথে এত অগণন বাধার কথা তরু জানল কী করে?

তাড়া, তার খুব তাড়া। অনুবাদের বইটি ছাড়াও সে লিখেছে 'এনশিয়েন্ট ব্যালাড্‌স অ্যান্ড লেজেন্ডস অফ হিন্দুস্তান', একদিন যার ভূমিকা লিখবেন এডমান্ড গস। 'গ্রিকের মতো সংস্কৃতও এক প্রাচীন ও মহান ভাষা!' বন্ধুকে লিখেছিল সে।

মৃত্যু আসছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাঝরাতে তার খুব শীত করে। ঘুম ভেঙে সে দেখে জানলা দিয়ে মেঝেয় পড়েছে অদ্ভুত ম্লান আর স্বচ্ছ এক জ্যোৎস্না। জানলার শিকের কালো ছায়া দেখে সে মেরিকে লেখে, 'It reminds me of convents of nuns'। বাংলায় মা'র গান শুনে কি নির্জনে কেঁদেছে তরু?

৪ঠা মে ১৮৭৬ মেরিকে লিখেছিল সে: 'I am getting old, *n'est-ce pas*?' সে লিখেছিল চব্বিশ বছরে ভারতীয় মেয়েরা ঠাকুমা হয়ে যায়। 'বাবা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, আমিও, মাঝে মাঝে নিজেকে কী বুড়ি লাগে!'

মিস মার্টিনকে একটি ছোট ফুল পাঠিয়ে সে লিখেছিল, 'ছোট্ট একটা ফুল পাঠাচ্ছি। আমারই নামে এর নাম, তরুলতা। আমি জানি তোমার ভাল লাগবে।'

মানিকতলায় ঘাসের জঙ্গল আর গাছে ঢাকা তার অবহেলিত সমাধিতে কয়েকটা ভেজা পাতা উপুড় হয়ে কাঁদছে। তারা কি জানে তরুলতা এখন রূপকথার দেশের রানি হয়ে গিয়েছে?

১ সেপ্টেম্বর ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮

সামনে এক বোতল আবস্যাঁৎ।

মোমাঁর্ত্র-এর 'দুরন্ত খরগোশ' রেস্তোরাঁর চেয়ারে বসে শিস দিচ্ছেন এক যুবক। ডান হাত নেই, বাঁহাত দিয়ে মদের বোতলটি খোলার চেষ্টা করতে করতে রুশ ভাষায় একটি গানের কলি ভেঁজে নিলেন তিনি। দু'টি জলকন্যা পাশ দিয়ে যেতে যেতে জলপ্রপাতের মতো হেসে উঠে বলল, 'Tu es fou!' (তুমি একটা পাগল!)

ফ্রান্সের বাইরে বেশি করে কেউ তাঁকে চেনে না। কিন্তু সত্যিকারের শিল্পীর মতো তিনি তোয়াক্কা করেন না। তাঁর নাম ফ্রেদেরিক লুই সোজে, যদিও কবি ও শিল্পীরা তাঁকে চেনেন ব্লেজ নামে, ব্লেজ সাঁদ্রার্স্ (১৮৮৭-১৯৬১)।

পাশেই অন্য একটি টেবিলে বসে যিনি কয়েকটি তুলি পরীক্ষা করছেন তাঁকে দেখে এতক্ষণে চিনতে পেরেছি, মার্ক শাগাল। অনতিদূরে বোর্ড টাঙিয়ে একাগ্রচিত্তে নিচু হয়ে রং লাগাচ্ছেন একজন, তাঁর আঁকা লম্বাটে নারীমুখের দুই-তৃতীয়াংশ দেখেই স্বপ্নের মধ্যে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'এ তো মদিল্লিয়ানি!' তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একবার তাকালেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা আপোলিনের আর কতক্ষণ দেরি করবে? পিকাসো পিগালের মোড়ে অপেক্ষা করছে!'

তারপর কোন্ রসাতলবাহী অন্ধকারে হারিয়ে গেল সবাই। শুধু জ্বলতে থাকল একটি চুরুটের লাল বৃত্ত, আগ্নেয়গিরির মতো। ব্লেজ সাঁদ্রার্স্-এর।

তিনি কবিতা পড়ছেন। সেই কবিতা বদলে দিয়েছিল বিশ শতকের কবিতার কঙ্কাল। বদলে দিয়েছিল এমনকী গিয়োম আপোলিনের-কেও, বিশ শতকে যিনি প্রায় উনিশ শতকে বোদল্যেরের মতো যুগান্তকারী। শতাব্দী-গোধূলি সাঁতরিয়ে কবিতা হয়ে উঠেছিল নতুন শতাব্দীর উপযোগী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কালপুরুষ

ওটা আমার তারা
হাতের তালুর মতো
আমার তালু যা আকাশ পর্যন্ত উঠেছে
গোটা যুদ্ধের সময় আমি কালপুরুষ দেখেছি একটা
ফুটোর ভেতর থেকে
যবনেরা যখন প্যারিসে এল বোমাবাজি করতে
ওরা কালপুরুষ থেকেই এল

আজও সে আমার মাথার ওপর
বিরাট এক মাস্তুল যন্ত্রণাক্ত হাতের তালু ভেদ করে
চলে যায়

যেমন আমার কাটা হাতে যন্ত্রণা করে
কারণ এক অন্তহীন তীর তাকে বিদ্ধ করেছে

ঝিনুক

আমার ভাল লাগে বানানভুল আর ঝিনুক
কোনও কোনও দিন আমি ইচ্ছে করে ভুল করি
একে বসে প্রতারণা
আমার অসম্ভব ভাল লাগে ভুল উচ্চারণ দ্বিধাকম্প্র জিব
আর দশ দিগন্তের স্বরাঘাত

বিরোধিতা

আমার কবিতার জানলাগুলি বুলভার আর শোকেসের ওপর খোলা
জ্বলজ্বল করছে
আলোর মণিপাথরগুলি
শোনো লিমুজিনের বেহারা আর লাইনোটাইপের জাইলোফোন
আকাশের হাত মোছার তোয়ালেতে স্নান করে নিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সব কিছু রঙে রঙে ছয়লাপ
আর পথচারিণী মেয়েদের টুপিগুলি সন্ধ্যার আগুনে
ধূমকেতুর মতো
...আমি শ্রীযুক্ত শুয়োরের বাচ্চাকে বললাম
তার আশ্রিতদের
আইফেল টাওয়ারে ঘর দিতে।

সুইজ়ারল্যান্ডের ছেলে, দার্শনিক রুসো-র মতো। চলচ্চিত্র-পরিচালক জাঁ-ল্যুক গদারের মতো। আধুনিক ফরাসি কবিতার অঘোষিত রাজকুমার ফ্রেদেরিক লুই সোজে'-র জন্ম নয়শাতেলের লা শো-দ্য-ফঁ'তে ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭। অর্থাৎ আমেরিকায় সেন্ট লুইসে টি এস এলিয়টের জন্মের ঠিক এক বছর আগে।

ফরাসিভাষী ধনী পরিবারের সন্তান ফ্রেদেরিক-কে পাঠানো হল এক জার্মান ইস্কুলে, যেখান থেকে পালালেন তিনি। এরকম একাধিকবার হল। শেষ পর্যন্ত সতেরো বছর বয়সে ট্রান্স-সাইবেরিয়া রেলগাড়িতে চেপে ইস্কুল-পালানো ছেলেটি রাশিয়ার এক ঘড়ি-নির্মাতার শিক্ষার্থী হল। সেন্ট পিটার্সবার্গে থাকার সময় জাতীয় গ্রন্থাগারের এক গ্রন্থাগারিকের অনুপ্রেরণায় লেখালেখি শুরু করলেন। এ সময় লেখা প্রথম কবিতা 'লা লেজাঁদ দ্য নভাগোরোদ'-এর চোদ্দোটি হাতে লেখা কপি করেছিলেন তিনি। সব ক'টি কপিই হারিয়ে যায়।

তিন বছর পর দেশে ফিরে বার্ন শহরে ডাক্তারি পড়া শুরু করলেন তিনি। ডাক্তারির পেশার বদলে জন্ম হল নতুন এক কাব্যভাষার।

সুইজ়ারল্যান্ড, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস।

এরপর প্রকাশিত হল 'লে পাক্ আ নিউ ইয়র্ক' (নিউ ইয়র্কে ইস্টার, ১৯১২), 'লা প্রোজ দ্যু ত্রাঁসিবেরিয়াঁ এ লা প্যতিত জেয়ান দ্য ফ্রাঁস' (ট্রান্সসাইবেরিয়ান গদ্য আর ফ্রান্সের ছোট্ট জেয়ান, ১৯১৩), 'সেকাঁস' (পারম্পর্য), 'লা গের দ্যু ল্যুকসাঁবুর' (ল্যুকসাঁবুরের যুদ্ধ), 'ল্য পানামা উ লে জাভাঁত্যুর দ্য মে সেত অঁকল্' (পানামা অথবা সাত মামার অভিযান), 'জে ত্যুয়ে' (আমি হত্যা করেছি) এবং 'দিজ়-ন্যফ পোয়েম এলাস্তিক' (উনিশটি ইলাস্টিক কবিতা)। ভাঙচুরময়, ধ্বসাংত্মক এক নতুন বাস্তবের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ আর প্রযুক্তি বিস্ফোরণের মাঝখানে বিভ্রান্ত মানুষের প্রথম নতুন কথক ফ্রেদেরিক, যাঁর কবি নাম ব্লেজ় সাঁদ্রার্স্।

আপোলিনেরের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া— ইংরেজি কবিতার জগতে দুই তরুণ মার্কিন কবি এজরা পাউন্ড আর টি এস এলিয়টের সাক্ষাতের মতোই— ফরাসি কবিতার ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ এঁকে দিল। পরস্পরকে তাঁরা উপহার দিলেন অনাস্বাদিত সৃজন-বারুদ। যতিচিহ্ন তুলে দিলেন তাঁরা। আপোলিনেরের আঙ্গিকগত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে যুক্ত হল সাঁদ্রার্সের বেপরোয়া শব্দতন্তুজাল।

একটি ভাঁজ করা দু' মিটার লম্বা কাগজে সোফি দোলোনের ছবির সঙ্গে ছাপা হল বিশ শতকের প্রথমার্ধের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা 'ট্রান্সসাইবেরিয়ান গদ্য আর ফ্রান্সের ছোট্ট জান'। যা ছিন্ন হতে থাকা মানচিত্রে এক চলমান চিত্রমালার মন্তাজ।

সাঁদ্রার্স্‌কে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল। 'কাটা হাত' আর 'আমি খুন করেছি' গ্রন্থে যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন তিনি। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর সাঁপান-এর যুদ্ধে ডান হাত খোয়া যায় তাঁর। কিন্তু তিনি দমে যাননি। এই বাঁ-হাতি কবি জাঁ কক্‌তো'র মধ্যস্থতায় ইউজিনিয়া নামে যে ধনী রমণীর বাড়িতে আশ্রয় নেন, তাঁর ঘরের দেওয়ালচিত্র আঁকেন স্বয়ং পাবলো পিকাসো, আর বাড়ির ডিজ়াইন করেন জর্জ ব্রাক।

ডান দিকে পিন দিয়ে আটকানো জামার ঝুলন্ত হাতা, বাঁ হাতে সিগারেট, নাক-ভাঙা ব্লেজ় সাঁদ্রার্স্। মদিল্লিয়ানি তাঁর ছবি আঁকেন। হেমিংওয়ে গভীর আগ্রহে তাঁর বর্ণনা করেন, হেনরি মিলার তাঁকে 'লেখকের আদর্শ' মনে করেন কারণ তাঁর কাছে জীবন ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর ছিল না। মডার্নিজ়মের প্ল্যাকার্ড বহন করার অধিকার যদি ইওরোপে কারও থাকে তিনি ব্লেজ় সাঁদ্রার্স্।

'সত্য একটি কল্পনা', লিখেছিলেন তিনি। তিনি কখনও 'নির্মাণ' করতে চাননি। খেলাচ্ছলে নতুন সময়ের চাবিকাঠিটি যেন তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল। গতি, বিশৃঙ্খলা আর স্মৃতি যে আধুনিকতাবাদের ভবিতব্য তা তিনি সকলের আগে বুঝতে পেরেছিলেন। একে কেউ কেউ বলেছেন, 'Poésie-flash', যার মধ্যে ধরা আছে ক্ষীয়মাণ জীবনের আর্তচিৎকার, 'এক বিপুল প্রলাপ'।

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোটরগুলি সোনার ষাঁড়ের মতো ডাক ছাড়ে
গোধূলির গোরুগুলি সাক্রে-কর-এর ডাল ভেঙে খায়
ওগো প্যারিস

আমার কিছু কিছু বন্ধু আমাকে পাঁচিলের মতো ঘিরে রাখে
ওদের ভয় কখন আমি চলে যাই হয়তো আর ফিরব না

যেসব নারীর আমি দেখা পেয়েছি তারা সবাই দিগন্তে দিগন্তে
দাঁড়িয়ে পড়ে
করুণ ওদের অঙ্গভঙ্গি আর বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার আলোকস্তম্ভের মতো
বিষণ্ণ ওদের চাউনি...
কিছু কিছু সাইরেনের আর্তনাদ আছে যা আমাদের অন্তরকে বিদীর্ণ করে
আজ রাতে এক দারুণ প্রেম আমায় কষ্ট দিয়েছে
আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ফ্রান্সের ছোট্ট জেয়ানের কথা ভাবছি
বিষণ্ণতা ভরা এক সন্ধ্যায় তার সম্মানে
এই কবিতা আমি লিখেছি

জান বেঁটেখাটো বারবনিতা
আমার মন খারাপ আমার মন খারাপ
আমি 'দুরন্ত খরগোশ' রেস্তোঁরায় যাব
আমার হারানো যৌবনকে স্মরণ করতে
আর কয়েকটা ছোট পেগ মদ খেতে
তারপর আমি একা একা ফিরব
প্যারিস
নির্যাতন-চক্র ফাঁসিকাঠ আর একমাত্র টাওয়ারের নগরী

(অনু. পুষ্কর দাশগুপ্ত)

স্যুররেয়ালিস্তদের আবির্ভাবের পর— যাঁদের ওপর তাঁর ও আপোলিনেরের প্রভাব কম নয়— বিশের দশকের মাঝামাঝি সাঁদ্রার্স্ কবিতা লেখা বন্ধ করে উপন্যাস রচনায় মন দেন। সে এক ভিন্ন পর্যটন-বৃত্তান্ত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠিক একশো বছর আগে, যে-বছর প্রকাশিত হয়েছিল, আপোলিনেরের কাব্যগ্রন্থ 'আল্‌কল' (সুরা), আর প্রকাশিত হতে শুরু করল মার্সেল প্রুস্তের মহাগ্রন্থ 'হারিয়ে যাওয়া সময়ের সন্ধানে', পাশ্চাত্য কবিতার অন্তঃশরীর বদলে গেল ব্লেজ় সাঁদ্রার্‌সের হাতে। কেউ তাঁকে মনে রাখেনি।

শুধু মাঝে মাঝে মোঁমার্ত্র থেকে মধ্যরাতে শোনা যায় এক ডানহাত-কাটা ফরাসি কবির অট্টহাসি, আর কবিতাপাঠ:

কেন লিখি

কেননা...

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯

শব্দের শরীর থেকে রক্ত পড়ছে।

আমি রাতের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সেই অন্তর্ঘাত দেখি।

বাইরে মৃত্যুকর্দমের ভেতর কাদের বাসরঘরি নাচ চলছে, বাঘেদের হালুম-হুলুম।

'এখানে না, চল্, আমরা অন্য কোথাও যাই।'

লাঠি ঠুকে ঠুকে এসে কে আমার কাঁধে হাত রাখল। 'ও আপনি!' ঠিক সেই উনিশশো ছেষট্টি-সাতষট্টি সালের মতো লাগছে। আমার মাস্টারমশাই জ্যোতিবাবু, জ্যোতিভূষণ চাকী।

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

'রায়বাহাদুর খেতাব দেওয়া হচ্ছে।' বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে খুব জোরে কোন্ নক্ষত্রলোকে হাঁটা দিলেন।

আকাশপাতালের ঢেউ গুনতে গুনতে ছায়াপথের ভেতর বিনিঃশেষে মিশে গিয়ে উনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমায়! একটা বারান্দা। জ্যোতিবাবুর কাঁকুলিয়া রোডের সেই বারান্দা না? লম্বা টেবিলের পাশে নির্জনে হাতলওলা চেয়ারে বসে আছেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত আর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ছায়ান্ধকারে আরও কারা।

ওঁরা নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কী বলছেন আমি শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু চারিদিকে কী অপরিসীম প্রশান্তি! বাইরে শিশির পড়ার শব্দ। না কি সময় বয়ে যাচ্ছে...! আ—

ভাষাভাবুক, বৈয়াকরণ, অভিধানকার, অনুবাদক, সংগীতবিদ, ছড়াস্রষ্টা ও সর্বোপরি শিক্ষক জ্যোতিভূষণ চাকী (১৯২৫-২০০৮) এক বালকের কানে কী ফুসমন্তর দিতে দিতে স্কুলের দীর্ঘ করিডর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। রেডিয়ো-র বিদ্যার্থীদের আসরে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর এক নতুন আবিষ্কারকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছাত্রদের নাটকের তালিম দিচ্ছেন শিশুর মতো আনন্দে। বিতর্কের আসরেও প্রধান উদ্যোক্তা তিনি।

ঢাকা-বারান্দার সেই টেবিলে বসে মাথা নিচু করে কাজ করছেন, পরনে ময়লা পুরনো গেঞ্জি, উশকোখুশকো চুল উড়ছে। পাশে অনেক জাদু-লণ্ঠন, অভিধান। সংস্কৃত, হিন্দি, আরবি, ফারসি, ইতালিয়ান...। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস আর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অভিধানে পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে 'চলন্তিকা' খুলে মিলিয়ে নিচ্ছেন জ্যোতিভূষণ। বাইরে অন্ধকার, কিন্তু ভাঙা বারান্দার চারপাশে আলোর ফুল ফুটছে।

জ্যোতিভূষণের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের দিনাজপুরে মামাবাড়িতে। বাবা অহিভূষণ, মা জ্যোৎস্নারানি। মামাবাড়ি তাঁকে অনেক দিয়েছিল। সংগীত, ছবি, সাহিত্যচর্চার আবহাওয়া। মামা অরুণেন্দু নন্দী ছিলেন গিরিজাবাবু, যামিনী গাঙ্গুলির ছাত্র। তিনি যখন দিনাজপুরে এলেন সাত সুরে লাগল রং। আট-ন' বছরের বালকের হল সংগীতের জগতে অভিষেক। আরেক মামা বিমলেন্দু নাচের সূচনা করলেন। দিদিমা রাধারানি পাবনার মালঞ্চ গ্রামের মেয়ে, গীতা আর পুরাণকথা তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি রূপকথার দেশে নিয়ে গেলেন জ্যোতিকে।

দিনাজপুরের পল্লিতে ইঁদারার ধারে বড়দের আড্ডা শুনতে ভাল লাগত তাঁর। ইস্কুলে সিমেন্টে গাঁথা পাহাড়-নদীর রিলিফ ম্যাপ দেখতে, ভূগোল শিখতে খুব উত্তেজিত লাগত। ভাল লাগত কাঞ্চন আর পুনর্ভবা নদীর মিলনকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে।

খেলতেন হাডুডু, আতার ব্যাটে আর লেবুর বল নিয়ে ক্রিকেট। লাঠির আগায় লাফ দিয়ে পোল ভল্টে অনেক উঁচুতে উঠে যেতেন তিনি। এরই পাশাপাশি ব্রহ্মপদ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শেখা। যে সংস্কৃত তাঁর হাতে তুলে দেবে কল্পলোকের চাবি।

দিনাজপুরে কলেজ নেই বলে বাবার সঙ্গে পাবনা গিয়ে এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হলেন। অধ্যক্ষ হিসাবে পেলেন 'বোস অ্যান্ড স্টার্লিং'-খ্যাত রাধিকানাথ বোসকে। ইংরেজির অধ্যাপক অমিয়ভূষণ এসে শোনালেন কবিতার মতো গদ্যও কেমন সুখপাঠ্য হতে পারে। ছেলেবেলার সাথী ছিল কাঞ্চন নদী, এখন ভাঙনমুখী পদ্মা। সেখানেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে দেখা।

১৯৪৫ সালে কলকাতায়। এমন স্বার্থপরতা তিনি দেখেননি কখনও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্তঃকলেজ সংগীত প্রতিযোগিতার জন্য হারমোনিয়াম ধার দিল না কেউ। পূর্ববর্তী গায়কও নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এক হৃদয়হীন পরিবেশ। মির্জাপুর পাইস হোটেলে বারোজন একসঙ্গে চিতল-কাত হয়ে শোওয়া, কারণ চিৎ হয়ে শোওয়া যেত না। এক কাপ চা অনেকে ভাগ করে খাওয়া। গোলদিঘিতে কাপড় কাচতে কাচতে বাড়ির কথা মনে পড়ে তাঁর। সিক্সথ ইয়ারে গিয়ে ভাগ্য প্রসন্ন হল। লিন্ডসে স্ট্রিটের আন্তোনিও উবেরের কাছে ফরাসি, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান পাঠ। দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে নিয়ে গেলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তিনি হারমোনিয়ামের ওপর ভাতের থালা রেখে, ভাত খেতে খেতে রিহার্সাল করাচ্ছিলেন!

অবশেষে ১৯৫৪ সালে মডার্ন স্কুলে চাকরি। চার বছর পর সেকালের বিখ্যাত স্কুল জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে। তখন ভাষা তাঁকে টেনে নিচ্ছে গহন চোরাবালির মতো। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, তিনি 'গোরু-খোঁজা করে খুঁজছেন শব্দের মানে'! লিখছেন ছড়া। যা মাটি থেকে ভাষা পেয়েছে। এত আলো, এত আকাশ! লিখছেন ব্যাকরণ, যেখানে ব্যাকরণ আর বাগর্থ দুই ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে। 'বাগর্থকৌতুকী'-র মতো বই তিনি ছাড়া আর লিখবেন কে?

আনন্দমুগ্ধ এক বিদ্যার্থী এক গাছ থেকে অন্য এক গাছের পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন ফুল। তাঁর দেবতা তো জ্ঞান নয়, জ্ঞানের সুন্দর। ক্লাসরুমে স্পষ্ট উচ্চারণে সূক্ষ্ম হাস্যরস মিশিয়ে পড়ানোর সেই ভঙ্গিতে মনে হত মনের গভীর থেকে টেনে আনছেন মোক্ষম কোনও কথা। মাটির খুব কাছে আসছেন, উষ্ণতাকে ছুঁচ্ছেন, অথচ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তিনি মুক্ত আকাশের বিহঙ্গ।

হিন্দি থেকে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' অনুবাদ করছেন, কী আনন্দ! 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার' জাদুকাঠিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর হাতে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এত বিদ্যুৎবহ্নিময় হয়ে উপস্থাপিত হতে পারে? অথবা ভারবি-র 'কিরাতার্জুনিয়ম'? এমন আনন্দময় উপাসক কি দেখেছি কখনও? উর্দু, ফারসি আর আরবি তাঁর মাতৃভাষা, না সংস্কৃত? না কি তাঁর মাতৃভাষা শিশুদের সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটা? জৌলুশ আর চটক থেকে বহু দূরে তাঁর পথচলা।

অন্নদাশংকরের ছড়ার বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক আমরা উপভোগ করেছি, কিন্তু জ্যোতিভূষণ চাকীর ছড়ার দেশজ কোমলতা আর মায়া কি পৌঁছল এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পোড়া দেশে? কেন পড়বে না সমস্ত বাঙালি শিশু 'সোনাঝুরি', 'ছড়া পিদ্দিম জ্বলে', 'উলুকুট ডুলুকুট' কিংবা 'ছড়ার আঙিনায়'?

হাতে পিদ্‌দুম

হাতে পিদ্‌দুম চোখে পিদ্‌দুম
পিদ্‌দুম করে আলো,
ও রাঙাবউ এঘর ওঘর
একশো মানিক জ্বালো।
চিকনচাকন ঘরের ভাঙন
চিত্তির আঁকে বউটা,
কুলো ছপ্ ছপ্ ঢেঁকি ধপ্ ধপ্
ভরে লক্ষ্মীর কৌটা।

(সোনাঝুরি)

গুড়ুক গুড়ুক

গুড়ুক গুড়ুক
তামাক পুড়ুক।
ঠাকুরদাদা
গল্প জুড়ুক।
ধোঁয়ার চাকা
হাওয়ায় ঘুরুক।

গুড়ুক গুড়ুক
তামাক পুড়ুক।
খুশির নেশায়
মনটা উড়ুক।
গুড়ুক গুড়ুক
তামাক পুড়ুক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরদাদা
গল্প জুড়ুক।

(ঐ)

মেলার ডাক

ঘোড়া হব গাড়ি হব।
পুতুল হব, মাটি বলল।
ঘোড়া হয়ে গাড়ি হয়ে
পুতুল হয়ে মেলায় চলল।

হাসি এল আকাশ থেকে
খুশি এল বাতাস থেকে।
'মেলায় যাব' ওরা বলল,
হাসি এবং খুশি দুজন একসঙ্গে মেলায় চলল।

খোকা বলে মেলায় যাব,
খুকি বলে মেলায় যাব—
একসাথে সব মেলায় চলল।
'তোদের জন্য বসে আছি,
আয় তোরা আয়', মেলা বলল।

(ঐ)

শরতে

পাখিটা কোথা ছিল
বুঝিনি,
তেমন করে তো তাকে
খুঁজিনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকাশের নীল ছিল
গায়ে,
আলোর নূপুর ছিল
পায়ে।

(অগ্রন্থিত)

পায়ে 'আলোর নূপুর' ছিল বলেই হিন্দি আর উর্দু থেকে কিষণ চন্দর বা কৈফি আজমি অনুবাদ করেছেন মহানন্দে।

পেনশন পাননি। স্ত্রী-র অসুখের খরচ মেটাতে পারছেন না। ফলে কুড়ি হাজার দুর্মূল্য বই বিক্রি করে দিতে হল তাঁকে। ১৪৩ টি অভিধানের প্রদর্শনী করেছিলেন, তাও বেচে দিতে হল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে একটি-দু'টি বাণীকে জীবনের পাথেয় করে রেখেছিলেন: 'নানা শ্রান্তস্য শ্রীরস্তি'— যে শ্রান্ত না, তার শ্রী নেই। আর 'যখন ক্লান্ত বোধ করবে সূর্যের দিকে তাকাও!'

পিজি হাসপাতালের অপরিষ্কার ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডে অপরিচিতদের পাশে অবহেলায় মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন তিনি।

চারপাশে বিশ্বজুড়ে নিতম্বনৃত্য চলছে। কুমির-জিব থেকে লোভের লালা গড়িয়ে পড়ছে। মাঝখানে জ্ঞানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন এক নিঃসঙ্গ তাপস।

এক আকাশ-মানুষ।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২০

জাহাজের ডেকে একটি চেয়ার পাতা। সামনে অনন্ত রাত ডানা মেলে উড়ছে। চেয়ারের মানুষটি বিড়বিড় করে পড়ছেন একটি ইংরেজি কবিতা। ভাসমান সেই ছবি মিলিয়ে যাওয়ামাত্র আমি মনে মনে বললাম, 'আরে! এ তো বোদল্যের! শার্ল বোদল্যের, কবিদের রাজা!'

অন্ধকারে একটি মোমবাতির আলোয় গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছেন অন্য একটি লোক। মনে হল মালার্মে। মানে-র ছবিতে তাঁকে দেখেছি।

পাশে একটি ঘরে আরেকজন, ভের্লেন। তার পাশের ঘরে ভালেরি।

এঁরা সকলেই পড়ছেন একজনেরই কবিতা! আকাশের তারারা স্ফটিকের মতো গলে গলে পড়ছে সেই পৃষ্ঠার ওপর। আমি ঘুমের মধ্যেই বলছি, 'এমনও হয়? সবাই শুধু একজনের কবিতা পড়ছে!'

তারপর এক ডুবসাঁতারে অতলান্তিক পেরিয়ে অতীতে চলে এসেছি কখন!

আজ ৩ অক্টোবর ১৮৪৯। আমেরিকায় বল্টিমোরের ফুটপাথে পড়ে আছে একটি মাঝবয়সি লোক। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নায় ঝলসে উঠছে তার শরীর। গায়ে দুর্গন্ধ, ত্বক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, পোশাকটি তার নিজের নয়। প্রলাপ বকছে। জোসেফ ওয়াকার বলে একটি লোক তাকে চিনতে পেরে ওয়াশিংটন মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। তিনদিন বাদে ৭ অক্টোবর ভোরে সে মারা যাবে।

মৃত্যুশয্যায় সে নাকি রেনল্ড্স বলে কাউকে ডেকেছিল। রেনল্ড্স, রেনল্ড্স। কে রেনল্ড্স? মৃত্যুর আগে সে বলেছিল, 'Lord help my soul.'

এর দু'দিন পরে নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে একটি শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়। 'Edgar Allan Poe is dead. He died in Baltimore the day before yes-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

terday. This announcement will startle many, but few will be grieved by it.'

কেউ জানে না তার কী অসুখ করেছিল। রক্তচাপের কারণেই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ? খবরের কাগজগুলিতে মৃত্যুর নানা কারণ দেখানো হয়েছিল—মৃগি, সিফিলিস, কলেরা, জলাতঙ্ক। রাফাস উইল্‌মট গ্রিসওল্ড নামে এক সমালোচক তার নামে নানা গুজব-সহ এক রোমহর্ষক জীবনী লেখেন, যা দীর্ঘকাল ধরে পাঠককে শিহরিত করেছে।

মার্কিন রোমান্টিক কবি, কথাশিল্পী ও সমালোচক এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) রহস্যরচনার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত, ভৌতিক ও গোয়েন্দা কাহিনির এক প্রধান পুরোধা তিনি, বিজ্ঞানসাহিত্যের এক পথিকৃৎ। এমনকী কস্‌মোলজি ও সংকেতবিদ্যায় তাঁর অপরিসীম উৎসাহ। কিন্তু কবি হিসাবে আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান নগণ্য বলা চলে। 'দ্য র‍্যাভেন'-এর মতো সাফল্য সত্ত্বেও ইংরেজি কবিতার কোনও নক্ষত্রতালিকায় তাঁর নাম ভুলেও উচ্চারণ করবে না কেউ। কীট্‌স, শেলিদের পাশে এডগার অ্যালান পো'র নাম করলে হা হা করে হেসে উঠবেন অনেকে। শুধু বোদল্যের, ভের্লেন, মালার্মে আর ভালেরি ছাড়া।

তিনি তো অন্ধকারের সূত্রধর। যুক্তি দিয়ে, তথাকথিত আধুনিক মন নিয়ে এগোন তিনি। তারপর অন্ধকারের স্থাপত্য তাঁকে জলপাতালের ভেতর টেনে নেয়। সমকালের অন্য সাহিত্যিকরা যখন অধিকাংশই বাস্তবের বর্ণনায় মুখর, তিনি তখন স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন এবং অকথিতের ভাষ্যকার হতে চেয়েছেন।

পো-র জন্ম ১৮০৯ সালে বস্টনে। এক বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেত্রী এলিজাবেথ আর্নল্ড হপকিন্স এবং অভিনেতা ডেভিড পো-র দ্বিতীয় সন্তান। এক দাদা ও একটি ছোট বোনও ছিল। ১৭৫০ সালে তাঁর ঠাকুরদা আয়ারল্যান্ড থেকে আমেরিকা এসে উপস্থিত হন। এডগারের জন্মের সময় তাঁরা শেক্সপিয়রের 'কিং লিয়ার' অভিনয় করছিলেন, তাই তাঁর নামকরণ হয় নতুন প্রজন্মের সদর্থক চরিত্র এডগারের নামে। পরের বছর তাঁর বাবা তাঁদের ছেড়ে চলে যান। এক বছর পর মা'র মৃত্যু হয় যক্ষ্মায়। শিশু এডগারের প্রতিপালনের ভার নেন জন অ্যালান নামে ভার্জিনিয়া-র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রিচমন্ডের এক ধনী ব্রিটিশ ব্যবসায়ী। তাঁকে সরকারিভাবে দত্তক না নিলেও তাঁর নাম দেওয়া হয় এডগার 'অ্যালান' পো।

ছ' বছর বয়সে তাঁকে অ্যালান-পরিবারের সঙ্গে ব্রিটেন যেতে হল। কিছু দিন অ্যালানের জন্মস্থান আরভিনে গ্রামের স্কুলে পড়ে লন্ডনে পরিবারের সঙ্গে যোগ দেন এডগার। এবার চেলসি ও লন্ডনের উপকণ্ঠে স্টোক নিউইংটনের স্কুলে পড়াশোনা। ১৮২০ সালে অ্যালানদের সঙ্গে রিচমন্ডে ফিরতে হল। সেখানেও পড়াশোনায় গাফিলতি করেননি এডগার। ১৮২৬ সালে প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা পড়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন তিনি। কিছু দিনের মধ্যে অ্যালানের সঙ্গে পয়সাকড়ি নিয়ে বিবাদ বাধে। জুয়ার নেশায় গলা পর্যন্ত ধার। প্রেমিকা সারা এলমিরা রয়স্টার অন্য একটি লোককে বিয়ে করে। পো এক বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা ছেড়ে বস্টনে চলে যান। কাগজে লেখালেখি করে অর্থাভাব না মেটায় চার বছর বয়স বাড়িয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, এবং দু' বছরে আর্টিলারির সার্জেন্ট মেজর পদে উন্নীত হলেন। কিন্তু তত দিনে এডগারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও কেউ তা পড়েনি। সেনাবাহিনী থেকে এবার তিনি অব্যাহতি চাইছেন। অ্যালানকে জানিয়ে কোনও লাভ হল না। পালিকা মা ফ্রান্সেসের মৃত্যুর পরের দিন এডগার সেখানে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন।

অবশেষে অ্যালান এডগারকে মার্কিন সেনাদল থেকে মুক্তি পেয়ে ওয়েস্ট পয়েন্টে যুক্তরাষ্ট্রীয় মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে যোগ দিতে সাহায্য করলেও, তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের পর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৮৩১ সালে বাল্টিমোরে ফিরে যান পো। তত দিনে তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। এবার তিনি গদ্যের দিকে ফিরলেন। 'বোতলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া পাণ্ডুলিপি' নামে একটি ছোটগল্প লিখে একটি পুরস্কারও পেয়ে গেলেন। সেই ছোটগল্পের জোরে রিচমন্ডের একটি কাগজ 'সার্দান লিটরারি মেসেঞ্জার'-এ চাকরি হল তাঁর। মাতলামির জন্য চাকরি গেলও একবার, ফেরতও পেলেন। সেই সময় তেরো বছর বয়সি এক সম্পর্কের বোন ভার্জিনিয়াকে বিয়ে করলেন।

ছোটগল্প, কবিতা, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পো 'বার্টন্‌স্ জেন্টলম্যান্‌স ম্যাগাজিন' এবং 'গ্রাহামস ম্যাগাজিন'-এ সহ-সম্পাদকের কাজ করেছেন। তাঁর শ্বাসরোধকারী ছোটগল্পগুলির জন্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও আর্থিক সুবিধে হচ্ছে না। প্রাণপণে চেষ্টা করছেন সরকারি চাকরির।

ভার্জিনিয়া অসুস্থ। পো-র মদ খাওয়া বাড়ছে। পুরনো কাগজ ছেড়ে তিনি নিউইয়র্কে 'ইভনিং মিরর' ও 'ব্রডওয়ে জার্নাল'-এ কাজ নিলেন। ক্রমশ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছেন তিনি। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছেন লংফেলো-র মতো প্রতিষ্ঠিত কবিকে। ১৮৪৫ সালে 'ইভনিং মিরর'-এ প্রকাশিত হল তাঁর কবিতা 'দ্য র‍্যাভেন', যা মুহূর্তের মধ্যে সারা দেশে পরিচিত করে তুলল তাঁকে।

'দ্য ব্রডওয়ে জার্নাল' ব্যর্থ হওয়ার পর পো চলে গেলেন নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কস অঞ্চলের সেই বাড়িতে, যা আজ 'পো কটেজ' নামে পরিচিত। ১৮৪৭ সালের জানুয়ারিতে ভার্জিনিয়ার মৃত্যু হল। ভার্জিনিয়ার মৃত্যু কি পো-র 'সুন্দরী নারীর মৃত্যু' বিষয়ক অবসেশনের ('একজন মৃত সুন্দরীর চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই') বাস্তব প্রতিচ্ছবি?

পো বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন, অন্ধকারের ডানা ঝাপটিয়ে উড়ছেন। মত্ত অবস্থায় সারা হেলেন নামে এক কবিকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন। ফিরে যাচ্ছেন ছেলেবেলার বিবাহিত প্রেমিকার কাছে। না, না।

তারপর এক হেমন্তের রাতে মুখ থুবড়ে শুয়ে থাকেন ফুটপাথে।

কী ছিল তাঁর ছোটগল্পে, যা তাঁকে করে রেখেছে সকলের চেয়ে আলাদা? যা ফরাসিতে অনুবাদ করে ফ্রান্সে অমর করে রেখেছেন স্বয়ং বোদল্যের? পো লিখেছিলেন, 'যে সীমারেখাগুলি জীবন ও মৃত্যুকে বিভাজিত করে দেয় তা আসলে ছায়াচ্ছন্ন আর আবছা। কে বলবে কোথায় একটির শেষ, আর অন্যটির শুরু?'

> Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before.
>
> I became insane, with long intervals of horrible sanity.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলেন, 'যারা দিনে স্বপ্ন দেখে তারা এমন কিছু দেখতে পায়, যা যারা শুধু রাতে স্বপ্ন দেখে তারা পাবে না।'

'দ্য টেল-টেল হার্ট' (১৮৪৩) গল্পের কথক এক শকুন-চোখ বৃদ্ধের শরীরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে শোওয়ার ঘরে লুকিয়ে রাখে। পুলিশ বৃদ্ধের আর্তচিৎকারের তদন্ত করতে এলে কথক শান্ত থাকে, কিন্তু তার কানে আসে বৃদ্ধের হৃৎস্পন্দনের শব্দ... হয়তো কথক স্বীকারোক্তি করে। 'লিজিয়া' (১৮৩৮) গল্পে একজন নারীর স্মৃতি অন্য আরেকজনের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করে। 'দ্য ফল অফ দ্য হাউস অফ আশার'-এ জীবন্ত মাদলেন-কে কবর দেওয়া হয়। 'উইলিয়াম উইলসন' (১৮৩৯) গল্পে আরেকজন একইরকম মানুষ, একই নাম। তাকে খুন করা নিয়ে গল্প। 'দ্য ব্ল্যাক ক্যাট' (১৮৪৩) গল্পে মৃত্যুর দেশ থেকে ফিরে আসে একটি কালো বেড়াল। 'দ্য পিট অ্যান্ড দ্য পেন্ডুলাম' (১৮৪২) গল্পে ক্ষুধার্ত ইঁদুর আর নেমে আসা ধারালো পেন্ডুলামের ব্লেড, 'দ্য মাস্ক অফ দ্য রেড ডেথ' (১৮৪৫)-এ লাল মৃত্যু নামে এক রক্তাক্ত অসুখ, 'ম্যানাসক্রিপ্ট ফাউন্ড ইন আ বট্‌ল' (১৮৩৩)-এ ঝড়, জাহাজডুবি, পরিপূর্ণ অন্ধকার ও বিরাট ঢেউ... নাবিকরা কথককে দেখতে পায় না। মানুষের চিন্তাকে অতিক্রম করে যাওয়া এ এক অজানা জীবনের ইশারা, যা কোলরিজের 'প্রাচীন নাবিকের পাঁচালি'-কে মনে করিয়ে দেয়। 'দ্য মার্ডার্স ইন দ্য রু্য মর্গ' (১৮৪১)-এ গোয়েন্দা অগুস্ত দ্যুপ্যাঁ-কে দিয়ে মা ও মেয়ের জোড়া খুনের মামলার নিষ্পত্তি করেন পো।

জন আরউইনের মতে, পো ফ্রয়েডের সত্যিকারের পূর্বসূরি। তাঁর 'দ্য পারলয়েন্ড লেটার' (১৮৪৪) ছোটগল্পটি নিয়ে কাটাছেঁড়া করেছেন লাকাঁ ও দেরিদা। কিন্তু কবিতা? পো-র সৃষ্ট আরেক বিস্ময়? যা থেকে তৈরি হল প্রতীকবাদীদের কাব্যভাষা, যা শাসন করল উনিশ ও বিশ শতকে ফরাসি কবিতার নানা অভিযানকে?

একদিকে, অলডাস হাক্সলি-র মনে হয়েছিল পো-র কবিতা 'অশ্লীল', 'ঠুনকো', যার বাড়াবাড়ি প্রতি আঙুলে আংটি পরার মতো। হেনরি জেম্‌স-এর মনে হয়েছিল পো-কে প্রশংসা করা মানে 'decidedly primitive stage of reflection'। আর অন্যদিকে, আধুনিক কবিতার পুরাণপুরুষ স্তেফান মালার্মের মতে, পো শুদ্ধ করে দিয়েছিলেন কবিগোষ্ঠীর ভাষা: 'Il a purifié

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

les mots de la tribu'। কবিতা খুঁজে পেয়েছিল তার নিজ-ভাষা। শুধু পো পড়ার জন্য ইংরেজি শিখেছিলেন তিনি!

আর বোদল্যের? তিনি বন্ধু তেওদোর দরে-কে লিখেছিলেন, 'প্রথমবার যখন খুলে পড়লাম তাঁর বই, আমি আনন্দ ও ভয়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম সেখানে রয়েছে সেইসব জিনিস যার কথা আমি স্বপ্নে ভেবেছি, সেইসব বাক্য যেগুলোর কথা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু যা কুড়ি বছর আগেই তিনি লিখে ফেলেছিলেন!' বোদল্যের-এর পো-বিষয়ক রচনা শুরুই হবে এভাবে: 'Il a étonné, surtout étonné...'। তিনি আশ্চর্য করেছেন, সত্যিই আশ্চর্য করেছেন...!

গত একশো বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত বাংলা কবিতা জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এর নির্মাণকে উসকে দিয়েছিল যে-কবিতাটি, তা পো-র 'টু হেলেন'

Helen, thy beauty is to me
Like those Nicéan barks of yore,
That gently over a perfumed sea,
The weary, way-worn wanderer bore
To his own native shore.

On desperate seas long wont to roam,
Thy hyacinth lair, thy classic face,
Thy Naiad airs have brought me home
To the glory that was Greece,
And the grandeur that was Rome...

বল্টিমোরের রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা একটি লোক! যাঁর রক্তাক্ত ডানা দু'টি থেকে স্ফটিক ঝরছে।

২০ অক্টোবর ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২১

আকাশ থেকে নক্ষত্রের জল পড়ছে। আর তার স্নিগ্ধ চুম্বন ভিজিয়ে দিচ্ছে কবিতার হাড়।

অক্ষরের স্তূপ পেরিয়ে, অন্ধকারের মরা খাত পেরিয়ে, তিনি হাঁটছেন রক্তপায়ে। 'যদি দু'-একটা বীজ ভিজে ওঠে/হাঃ হাঃ যদি দু'-একটা'।

প্রতিষ্ঠানের মেকি, সংগঠিত মহত্ত্বের বাইরে, বিজ্ঞাপনের ঢাকের কাঠি থেকে দূরে শুভ্রকেশ, পাখির পালকের মতো নরম একটি রক্তিম ঋজু রেখা, অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০)। গতকাল তাঁর জন্মদিন ছিল।

তাঁর 'উৎসের দিকে', 'ঘনিষ্ঠ তাপ', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে', 'প্রথম পলি শেষ পাথর', 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর', আজ মাঝরাতে চলচ্ছবির মতো ভাসছে আমার সামনে। আমার হাতের চেটো আমি মেলে ধরেছি, যাতে অন্ধকারের জরায়ু ছিঁড়ে ঝরে পড়া আলো আমি ধরতে পারি অঞ্জলিতে। অরুণ মিত্রর কবিতা পড়তে পড়তে আমি বুঝতে পারছি বন্ধ্যা-মুখ খুলে যাচ্ছে। আর আমি কখন এসে উঠেছি নতুন এক চরে।

> আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে? আমার দিন আর রাতগুলোয় বাঘনখ বসা।
>
> ('স্বস্তির কথা কে বলে')

> এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
> আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনে ভালবাসার ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠবিড়ালীর মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা-ভাসা [illegible] এক জলমোছা দৃষ্টি দুপুরের সূর্য হয়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
আমার কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে।... ঝাঁক ঝাঁক বর্শার বিষ
উত্তাল করল তার তিন সমুদ্র।

('এ জ্বালা কখন জুড়োবে')

তারা চেটোগুলোকে খুলে হাতের রেখা আমার সামনে ধরল। কোনো
রেখা যে এমন বিষণ্ণ দেখাতে পারে আমি জানতাম না। আমার
ভয়ানক ইচ্ছে হল তাদের সমস্ত হাতের ওপর আমার হাত রাখি।
তারা সব আমার রক্তের দোসর।

('অন্তরঙ্গ')

সমস্ত ঘৃণা ও কান্নাকে করস্পর্শে সোনা করে দিয়েছিলেন অরুণ মিত্র। তাঁর ক্ষতমুখ থেকে উঠে এসেছিল আলোর ফোয়ারা। মাথা উঁচু করে তিনি খোলনলচে বদলে দিতে চেয়েছিলেন বাংলা কবিতার। ইতিহাসের এক ব্রাহ্মমুহূর্তে খুলে দিতে চেয়েছিলেন হাত-পায়ের বেড়ি। কবিতার ত্বক থেকে ঝরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সব ভান, সব মিথ্যে প্রসাধন।

আমি একজন বাঙালি কবিকেও চিনি না যিনি পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে সমবয়সিদের প্রাক-নিয়ন্ত্রিত, কৃত্রিম ভাষাভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে লিখতে পারতেন:

আমার কপালের ঘাম নিঃসাড়ে শিশির হয়ে ফুটছে

অথবা

দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম
তোমার স্পন্দন থমথমে রাতের মতো
তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া
অনুভব করলাম।

অথবা, সেইসব অবিশ্বাস্য পঙ্‌ক্তি, যা অরুণ মিত্রকে করে তুলল সম্পূর্ণ এককভাবে স্বত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিশিরের রূপোর মাঠ খানখান হয়ে গেল এই মুহূর্তে।

কবে আমার এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে?

কিংবা

আমার প্রত্যাশা পাথর হয়ে থাকল।

অরুণ মিত্রর কবিতা যে সম্পূর্ণ আলাদা, এটা তাঁর কবিতার স্নায়ুতন্তুধমনীতে কান পাতলে বোঝা যায়। যেন অনেক দিন পর আমি ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটছি! ১৯০৯ সালে জন্মানো (অর্থাৎ নজরুল ও জীবনানন্দের দশ বছর, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর আট বছর আর বুদ্ধদেব বসুর এক বছর পর এবং বিষ্ণু দে'র জন্মের বছর) এই কবি— জীবনানন্দের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বাংলা কবিতায় যাঁর জাদুমন্তর— আধুনিক কবিতার ভাষায় নিয়ে এল এক অনাস্বাদিত-পূর্ব ভানহীন সহজতা ফরাসিতে যাকে বলে 'désinvolture', যা বাঁধা গৎ ভেঙে দেয়।

পরে ষাটের দশকের শেষে কবিতার অন্তঃশরীরের ঘনিষ্ঠ তাপকে শুষে নেওয়ার পর তিনি লিখেছিলেন দেয়ালে খড়ি দিয়ে লিখে রাখার মতো একটি কথা: 'প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো করে বলো'।

অন্ধের ছুঁয়ে দেখা? সেই ছুঁয়ে দেখা যে কী অপরিসীম অনুধ্যান দিয়ে তৈরি, আমি ঘুমের মধ্যে বলি। অক্ষর কতবার এত মায়াবী ও সাবলীল হয়েছে গত কয়েক দশকে?

তোমার মূর্তি আমি গড়ছি আদ্ধেক গড়ে গুঁড়িয়ে আবার গড়ছি
হাড়ভাঙা রাস্তার মাঝখানে তোমার মূর্তি আমি নগরবাসীরা দেখুক
ঘামে পাথরে আমি কীভাবে আমার পরাজয়কে ছানি
ভালবাসাকে ছানি।

('তোমার মূর্তি আমি')

কবিতাকে জীব[illegible] চারি[illegible] দিতে গিয়ে অরুণ মিত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে মুছে দিতে চেয়েছিলেন গদ্য-পদ্যের সীমা। যেন জীবনযন্ত্রণাকে প্রকাশের পথে কোনও বাধাই তিনি মানতে রাজি নন।

এই আপোসহীন প্রকাশ তিনি শিখেছিলেন ফরাসি কবিদের কাছে। শুধু উনিশ শতকে আলোয়াজিয়্যুস বেরত্রাঁ, বোদল্যের ('Petits poèmes en prose'), লোত্রেয়ামঁ বা র‍্যাঁবো নন, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসি কবিরা— মাক্স জাকব, পল এল্যুয়ার, আঁরি মিশো, রনে শার, স্যাঁ-জন পের্স— টানা গদ্যে কবিতা লিখেছেন, যা ইংলন্ড বা আমেরিকায় কবিরা সাহস পাননি। (টি এস এলিয়ট দু'টি গদ্য কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, বাকি কয়েকটি ফাইলবন্দি থেকে যায়।) এই বিপজ্জনক অনিশ্চয়তার রাস্তায় নেমে তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন নতুন দিশা।

১৯৫৫ সালে রনে শার-র এর শব্দ বাহুল্যবর্জিত, ঠাসবুনোটময় কাব্য সম্পর্কে অরুণ মিত্র লিখেছেন: 'জীবনের প্রতি ভালবাসায় তা ধ্বনিত। কিন্তু সে ভালবাসার মূলে আছে জীবনের যন্ত্রণা সম্বন্ধে তাঁর চেতনা। তাঁর অনুভূতি সরলরেখায় আঁকা নয়, ছায়া আলো শূন্যতা উচ্ছলতার জটিল রেখায় মূর্ত।' আমরা আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, এ কি অরুণ মিত্রর নিজের কবিতার কথা? অথবা তাঁর প্রিয়তম কবি পল এল্যুয়ার— যাঁর সবচেয়ে বেশি কবিতা অনুবাদ করেছেন তিনি— সম্পর্কে পিয়ের সেগের্স্ লিখেছেন, 'বাগ্মিতা নেই, জোর করা কারুশৈলী নেই, তিনি গভীর বিশ্বাসের (conviction profonde) কবি, যিনি মুগ্ধ করেন তাঁর কাচ-স্বচ্ছতা, তাঁর ভালবাসা আর উষ্ণতা দিয়ে!' 'C'est le monde du cristal, un univers de la transparence', এক স্বচ্ছ কৃস্টালের পৃথিবী, জীবনের আগুন যাঁকে ছুঁয়ে আছে।

গভীরভাবে বামপন্থী মানবভাবনা তাঁর বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ছিল তা আমরা জানি। কিন্তু উচ্চকিত ভাষা (তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'-য় যা পরিব্যাপ্ত) তাঁর পোষায়নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 'নিশ্বাস চাই, হাওয়া চাই, আরও হাওয়া।' সেই হাওয়া এল স্বপ্ন-ষড়ভুজ ফরাসি দেশ থেকে।

ফরাসি কবিতাকে জানার আগে ও পরের কবিতা পড়লে বাংলা কবিতার এই মহীরুহের আত্ম-আবিষ্কার স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আগে ছিল 'প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার?/ লাল অক্ষর আগুনের হলকায়/ ঝলসাবে কাল জানো!' আর তার বদলে এল এইরকম অনুরণন:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটি কথাও থিতোয় না,
কেবল প্রতিধ্বনি তামাশা।

অথবা,

আঁকাবাকা সুতোলি নদী সাপের মতো মোচড়ায়।

অথবা,

সমস্ত তারের ঝনঝন যেন একটা দীর্ঘ স্থির রেখা
সমস্ত বিক্ষোভ এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
সমস্ত অশ্রু জমাট তুষার।

জ্যুল স্যুপেরভিয়েল-এর সাবলীল ও সূক্ষ্ম পঙ্‌ক্তি 'মানুষ এক সুতোর ডগায় কাঁপছে' মিশে গেল অরুণ মিত্রর আত্মানুসন্ধানের পথরেখায়, কিংবা অরুণ মিত্রর অসামান্য অনুবাদে পিয়ের র‍্যাভের্দি-র পঙ্‌ক্তি: 'আমি ভস্মের স্তম্ভের নিচে শুয়ে রয়েছি/ আর তুমি উঠেছ সোনার মিনারে.../ আমার মুখের চিহ্ন আমি লবণে ঢেকেছি...'। ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে তাঁর প্রিয় কবি র‍্যাঁবো, এল্যুয়ার, স্যাঁ-জন পের্স এবং স্যুপেরভিয়েল অন্তঃস্যূত হয়ে গেলেন তাঁর কাব্যভাষায়। সেই বিদ্যুৎময় ভাষাজালকে ভেঙে-চুরে তিনি খোদাই করে দিলেন জীবনের গায়ে।

আমরা যখন অরুণ মিত্রের কবিতায় পড়ি:

> ন্যাতাপড়া ছেলেমেয়ে গলির এখানে-ওখানে এসে জড়ো হয়। আমার সঙ্গে তারা সোজাসুজি কথা বলতে পারে না, যদিও কথা তাদের বুক ঠেলে আসে। আমাকে দেখে তাঁদের ঠোঁট একটু খোলে, গোল হয়, ছড়িয়ে যায়। একটা নাম সেখানে পরিষ্কার আঁকা হয়।

বা

> আমরা গিয়েছিলাম ইস্পাতের নদী দেখতে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অথবা,

> এবার যদি সমস্ত মাটি সীসের মতো হয়, তবুও কি বিকশিত হওয়ার কথা শুনব?

কিংবা,

> বাসনগুলো একসময় জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়ত এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল।

তখন বুঝতে পারি, কবিতা ও অগ্নিবলয়ের মধ্যে আমাদের তীব্র দৈনন্দিন বাঁচাকে তিনি এক বাণ-বেঁধার বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, তিনি অরুণ মিত্রর কাছে শিখেছেন প্রাত্যহিক আটপৌরে শব্দ ব্যবহার। এই কাব্যিক অনুসন্ধানের মূল শক্তি নিশ্চয়ই তাঁর বিশ্বাস, যা 'ন্যস্ত ছিল পাথরে, এক অনমনীয় পাথরে।'

চারপাইয়ের ওপর

চারপাইয়ের ওপর ছটফটাচ্ছে পিয়ারিয়া
এতকাল খাটাখাট্‌নির পর ওর ছুটি মঞ্জুর হোক,
ছুটি ছুটি ক'রে ওর চোখ ঘুরছে
এপাশ ওপাশ করলে কাঁটায় চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে
ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রার্থনার শব্দগুলো
পেটবুকের জ্বলুনি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে কাপড়চোপড়ে,
তবু চারপাই কি চিতা হয় কখনো?
তার জন্যে শ্মশান লাগে হিসেব করা কাঠ লাগে আর মন্তর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর-একটু সবুর করো পিয়ারিয়া
ভালোবাসার কথা ভাবো,
বালবাচ্চা এন্ডিগেন্ডি ভালোবাসা থেকেই এসেছে
মালিক মাল্‌কানি ভালোবাসার মুখ চেয়েই
তোমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন রাত্তিরে
নেশার ঝাঁঝে উবিয়ে দিয়েছেন দিনের বেলাটা।
আর একটু সবুর করো পিয়ারিয়া
তোমার ছাই উড়বে ছুটির আকাশে।
তুমি পরী হয়ে যাবে, পরী।

কবিতার এই ভাঙচুরময় রূপবিভার সামনে আমার হাত-পা হিম হয়ে যায়। আর খাঁটি অক্ষরের আলো আমার শিরা-ধমনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এই রক্তছাপময় সময়ে আমি খুব সন্তর্পণে এই আশ্চর্য কবিতাগুলোকে ছুঁয়ে থাকি।

৩ নভেম্বর ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২২

ঘুমের ছায়াভূমির ভিতর কোনও এক সুদূর অতীতের শীতার্ত লাইব্রেরির ঘ্রাণ। সেই অলীক সংগ্রহে হাত বুলিয়ে এক বিলুপ্ত পৃথিবীর ধুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে শুনতে পেলাম বাবা বলছেন, "তুমি 'সত্যাসত্য' পড়নি?"

আমি এক ভাঙাচোরা, রক্ত-হিম বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে, বইগুলোর দিকে নীলকণ্ঠ পাখির মতো ঘাড় কাত করে থাকা মানুষটিকে বললাম, 'সে তো অনেক খণ্ড—'

"তোমায় 'বিনুর বই' নামে একটা ছোট বই দিয়েছিলাম... সেই কবে..." বলে লাইব্রেরি-ঘরের কোন নির্জন চোরাপথের কুয়াশার ভেতর সেই বইটা খুঁজতে চলে গেলেন।

আমি ভলতের, রুসো আর রম্যাঁ রলাঁ-র বইগুলোর পাশে রাখা 'বিনুর বই' (১৯৪৪) তুলে নিয়ে ওলটাই। আমার দশ বছর বয়সে দেখা ডি এম লাইব্রেরি-র সেই ক্রাউন সাইজের বইয়ের অপরূপ হরফ স্থাপত্যের পাশে চিত্রার্পিত হয়ে থাকি। এমন স্ফটিক-স্বচ্ছ শব্দের মেরুদণ্ডী, দৃপ্ত উদ্ভাস কি বাংলা ভাষা দেখেছে কখনও? এ তো ভলতের-এর কাচকাটা হিরে! বইয়ের প্রথম অনুচ্ছেদটি ছিল:

> জল না পেলে গাছ শুকিয়ে যায়, রস না পেলে মানুষ।
> বিনুর জন্ম অবধি রসের অনাবৃষ্টি হয়নি। বলতে নেই, কিন্তু সত্যি বলতে কি, যা হয়েছে তা অতিবৃষ্টি। অতিবর্ষণেও গাছ মরে। বিনুরও মরণ হতো।

১৯৪৪ সালে গাঁধীজির জন্মদিনে যখন বেরিয়েছিল এই আশ্চর্য বই, ভূমিকায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) তাঁর নিজেরই একটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন, 'আমি প্রবীণদের মহলে নবীন, নবীনদের মহলে প্রবীণ।... নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি পরস্পরকে পরিচিত করাতে পারি।... আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্তি আছে, আমি চেষ্টা করব নিরসনের। আধুনিকদের কাছে অত্যাধুনিকদের নানা জিজ্ঞাসা আছে, আমি উত্তর দানের চেষ্টা করব।... আমি যার কাহিনি বলতে যাচ্ছি তার নাম দেওয়া যাক বিনু।' লিখেছিলেন, 'কাহিনি যদি হয়ে থাকে, তবে জীবনের নয়, মনের। কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে নয়।'

কয়েক বছর আগে ১৯৪১ সালে অন্নদাশঙ্করের 'জীবনশিল্পী' বইতে বিনুর আবির্ভাব। অর্থাৎ ইউরোপ ভ্রমণকাহিনি 'পথের প্রবাসে'-র দশ বছর পরে। ১৯৩২ সালে শুরু করা 'সত্যাসত্য' উপন্যাস তখন শেষ হওয়ার মুখে। প্রথম আবির্ভাবেই সত্যি কথা দিয়ে বিনু মন জয় করল।

> ভীরু। ভীরু। ভয়ানক ভীরু সে। তবে তাকে আমি কাপুরুষ বলব না। সে পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে জীবনের অনেক পরীক্ষায়। কাপুরুষ নয়, ভীরু সে। সাগরতীরে জলকেলি করে দিনের আলো অপচয় করল। এখন আসছে আঁধার। শুধু যে তার নিজের জীবন আঁধার অর্থাৎ পাকা চুল, তাই নয়। দেশের জীবনেও আঁধার, অর্থাৎ অনিশ্চয়তা। ইউরোপের জীবনে তো মহা তমসা, ঘোর বর্বরতা। এই ঘনায়মান সন্ধ্যায়— যুগসন্ধ্যায়— যৌবনসন্ধ্যায় বিনুর পাত্রে সুধা কই? কই সেই জীবনসার যা মৃতকেও নবজীবন দেবে, মুমূর্ষুকে দেবে সঞ্জীবনী আশা?
>
> মুক্তা নেই, আছে গুটিকতক নানা রঙের ঝিনুক। সাগরতীরে বসে বসে বালুর ঘর গড়েছে আর এই সব কুড়িয়েছে বিনু। সেই বালুর ঘরেও ভাঙন ধরেছে। আর সেই সব ঝিনুকও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। তা হলে, বিনু, তুমি করলে কী।

এমন আত্মানুসন্ধানের হ্যান্ডবুক আমাদের শ্রেষ্ঠ বিবেকী শিল্পী (এদিক থেকে তিনি হয়তো বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম নন) ছাড়া কে লিখবে? শিবনারায়ণ রায় লিখেছিলেন, 'অন্নদাশঙ্করের বিবেকিতা তাঁকে নীরব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থাকতে দেয়নি। এই বিবেকিতা তাঁর জীবনের চরিত্রের গদ্যরীতির কেন্দ্র। বিবেকিতা, যুক্তিশীলতা, মমতা, সুবেদিতা, চিত্তের উন্মুক্ততা।' ('ঘনায়মান অন্ধকারে আলোকস্তম্ভ') কিন্তু 'বিনুর বই' বিবেকিতার ইতিকথা নয়, বিনুর মানসজীবনের ইতিকথা। এ বইয়ের কয়েক বছর আগে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন,

> বিনুকে যেতে হলো জীবনের কাছে। সাহিত্যের সূর্যস্বরূপ জীবন। জীবন যে তার একেবারেই অজানা ছিল তা নয়, জীবনের কাছেই সে নিয়েছে প্রেমের পাঠ। কিন্তু সেই বিদ্যা যথেষ্ট নয়। কী করে আরও গভীরভাবে
> বাঁচবে এই জিজ্ঞাসা তাকে অধীর করল।

বিনু যেভাবে নিজেকে, নিজের কাল এবং মহাকালকে বুঝতে চেয়েছে এমনটা তার সময়ে কি আর কেউ পেরেছে অমন তীব্রতায়? 'সত্যাসত্য'-র অনুসন্ধান সেখানে বিনুর সঙ্গে এক রাগিণীরেখায় গিয়েছে মিশে।

সে বুঝতে চেয়েছিল কোনটা সাধন আর কোনটা প্রসাধন। অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন:

> মহামানবের সাগরতলে ডুব দিতে হবে। তবে যদি পায় মানবজীবনের অমৃত। বিনুর কি এত সাহস আছে যে সে ডুব দিতে পারে?

সে নিজেকে জিজ্ঞেস করে, লিখব, না বাঁচব? দু' পৃষ্ঠা লিখতে-না-লিখতেই তার মনে পড়ে যায়, ওই যা বাঁচতে ভুলে গিয়েছি। আর এই দু'য়ের মিলনে আর সংঘাতে উঠে আসে যুগজিজ্ঞাসা, প্রত্যয় আর সংশয়।

দ্বন্দ্বকাতর বিনু জানে, 'বাজে লেখায় হাত খারাপ করলে সে হাত দিয়ে ভাল লেখা বেরোয় না। প্রকৃতির প্রতিশোধ।'

বিনু লিখেছে প্রথম বিশ বছর তার সাধনার শামিল, যেমন যুদ্ধের শামিল তার উদ্‌যোগ। সাধনার শেষ কথা মোক্ষ। বিনু জানে, ভারসাম্য হারালে চলবে না, তার সাধনা রসমোক্ষণের। কবে সেখানে পৌঁছবে, আদৌ পৌঁছবে কি না কেমন করে জানবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> কিন্তু সেই তার পথ। নান্যঃ পন্থা। পরবর্তী বয়সে আবার সে সংশয়ে পড়েছে, আলো হারিয়েছে, আলোর দিকে চলেছে। কিন্তু মার্গভ্রষ্ট হয়নি...

জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, মানিক, সতীনাথরা লেখা নিয়ে ভেবেছিলেন, কিন্তু আর কেউ কি তুলাদণ্ডে নিজের পরিমাপ করেননি বিনুর মতো করে! জীবন নিয়ে সে কী করবে? কেমন করে কাটাবে?

বিনুর বড় হওয়া যেন এক আবহমান বাঙালির বড় হওয়া! তার ছিল সাত খুন মাফ। রাতে আর সবাই পড়া মুখস্থ করে। কিন্তু বিনু তার ঠাকুমাকে কবিকঙ্কণের চণ্ডী পড়ে শোনায়, কিংবা বেরিয়ে যায় কীর্তনে। মাসিকপত্র আর থিয়েটারে তার শখ। বিনু লিখেছে:

> খেয়াল বা শখ দু'দণ্ডেই নিবে যায়। তাকে সারা রাত জ্বালিয়ে রাখতে হলে বাইরের উস্কানিও যথেষ্ট নয়। ভিতরে থাকা চাই জ্বালা। লিখতেই হবে এমন কোনো ব্যাকুল ব্যগ্রতা তার ছিল না। অন্তরে রস যা ছিল তা উপচে পড়ার মতো নয়। রস জমতে জমতে এক সময় ছাপিয়ে পড়ে, তখন বাইরের চাহিদা থাক বা না থাক ভিতর চায় ভারমুক্ত হতে। বিনু জানত তখন রসমোক্ষণ না হলে মানুষ বেদনাবোধ করে। তখন যদি তার হাতে লেখনী থাকে সে লিখবেই।
>
> লিখবেই, না লিখে মুক্তি নেই। কিন্তু লিখলেও মুক্তি নেই, যদি না জানে কেমন করে লিখতে হয়।
>
> বিনু জানত, যার এ শিক্ষা হয়নি তার রসোদ্ধার অন্যকে পীড়া দেয়। এ সত্য আবিষ্কার করতে বিশ বছর কেন তার বেশি লাগল।

বিনু বুঝেছিল, যোগসূত্র ছিন্ন করা চলবে না। তাই প্রথম থেকে তার স্বকালের দিকে টান। 'যার জীবন সত্য নয়, তার লিখন সত্য হয় কোন জাদুবলে?'

সে নাড়া বেঁধেছিল তলস্তয়ের কাছে, যিনি 'দ্বিতীয় ধূম্রলোচনের মতো নিজের লেখার সমালোচনা করেছিলেন।' বিনু ধীরে ধীরে একমত হল যে সবচেয়ে সার্থক সৃষ্টির লক্ষ্য হবে জনসাধারণ বা 'পিপ্‌ল'। পুঁথির ভাষা ও পুঁথিগত ভাবের ওপর বিতৃষ্ণা এসেছিল। তার মনে হয়েছিল কেমন করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাঁচতে হয়, রম্যাঁ রলাঁ-র 'জাঁ ক্রিস্তফ' তার 'নিঃশব্দ জবাব'। কিছুকালের জন্য এটাই হল তার জীবনবেদ। সে নাড়া বেঁধেছিল রবীন্দ্রনাথ, গ্যোয়েটে, গাঁধী আর বীরবলের কাছেও।

দুই বিনু।

অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না-করা বিনু।

সেই সঙ্গে আরেক বিনু যে রণছোড়। যে খেলা করতে ভালবাসে, হাসতে ভোলে না। জীবনটা তার চোখে দ্বন্দ্ব নয়, লীলা। বিনু বোঝেনি শুঁয়োপোকা মরে প্রজাপতি জন্মায় কত দুঃখে! সে লিখেছে, মৃত্যু ও জন্মান্তরের মেটামরফোসিসের পর যে মরল সে সাংবাদিক, যে জন্মাল সে সাহিত্যিক। নিজের লেখা সে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে।

যেটা গেল সেটা কাঁসি, যেটি এল সেটি বাঁশি।

বিনু ঠিক করেছিল সে চাকরি করবে না। যদি সে সাংবাদিক হয় সে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো স্বাধীন হবে। একদিকে অন্তহীন অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে সীমাহীন প্রত্যয়।

বিনু ভাবে, জীবিকার বাইরে বা জীবিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনের কতটুকু বাকি থাকে? যেটুকু থাকে সেটুকু অবশ্য অকিঞ্চিৎকর নয়, অমূল্য। কিন্তু বিনুর তাতে সন্তোষ নেই। সে চায় আরও, আরও, আরও জীবন। আরও যৌবন, আরও অবসর। আরও খেলা। আরও সাধনা। আরও বেদনা। আরও সৃষ্টি। আরও অমৃত। এককথায়, জীবিকার ভাগ পনেরো আনা নয়, চার আনা। জীবনের ভাগ এক আনা নয়, বারো আনা।

আগেই বলেছি, বিনু যে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি তোলে, সেটি হল লিখব না বাঁচব? সে বুঝেছে, যে বাঁচে সে ঠকে না। যে বাঁচে না সে হাজার লিখলেও ঠকে।

তাই বিনু প্রেমে পড়ে নিজেকে চিনল। পরবর্তী জীবনে বিনুর ধর্মে বিশ্বাস টলেছে, আর্টে বিশ্বাস টলমল করেছে। কিন্তু প্রেমে বিশ্বাস অটল রয়েছে। বুঝেছে শক্তি সবচেয়ে প্রেমেরই বেশি। বিনু তার সাক্ষী।

আর বিনু বুঝেছে অরণ্যে রোদন করা, মানুষের কাছে কাঁদুনি গেয়ে বেড়ানো, যেমন হাস্যকর তেমনই নিষ্ফল। তার চেয়ে বেশি মহিমা এগিয়ে গিয়ে দায়িত্ব নেওয়ার।

বিনু বলে, [illegible] তা [illegible] স্বীকার করলুম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই আশ্চর্য বইটি বানার্ড শ'-র 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান'-এ 'রিভলিউশনারি হ্যান্ডবুক'-এর মতো বিস্ফোরণময় এক দীপমালা?

বিনুর জীবনের তরী, তার সাহিত্যের তরী যখন বিশাল সিন্ধুতে, বিষাদ-সিন্দুতে ভাসল, তখন শেষ হল এই বই। প্রথম বই 'তারুণ্য' (১৯২৮)-তে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন, রম্যাঁ রলাঁ-র মন্ত্রের মন্ত্রণার কথা: 'Always to seek, always to strive, NEVER to find, never to yield.'

শেষ নয়, অশেষ। তবু এখনকার মতো শেষ।

'বিনুর বই'-এর সমাপ্তির মতো সমাপ্তি বাংলা কেন বিশ্বসাহিত্যে কোথাও দেখেছি কি না মনে পড়ছে না আমার:

> ভুলে যেয়ো না, চার দিকে অন্তহীন নৈঃশব্দ্য। বিরাট জগৎ মহামুনির মতো মৌন। যদি কিছু জানাতে চায় তো ইশারায় জানায়। মানুষকে শব্দ দেওয়া হয়েছে শব্দ করবার জন্যে নয়। নিঃশব্দতাকে আরো নিঃশব্দ করবার জন্যে নয়, ছন্দ মেলাবার জন্যে। যেমন চলার ছন্দ পা ফেলা ও পা তোলা তেমনি বলার ছন্দ বলা ও না-বলা।
>
> বিনু তুমি কথা বলার আর্ট শিখেছ। না-বলার আর্ট শেখো।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় বেরল 'বিনুর বই' দ্বিতীয় খণ্ড। পঞ্চাশ বছর পরে লেখা সেই বই ডানা মেলে উড়তে পারেনি প্রথমটির মতো।

সাহিত্যের মেছোহাটায় 'বিনুর বই'-এর নতুন সংস্করণটি এত অসুন্দর যে ঘুমের মধ্যেও অস্ফুট চিৎকার করে উঠি আমি। তার আকার ও প্রকার ডি এম লাইব্রেরির বইটির সুখ ধ্বংস করে দিতে পারে এক মুহূর্তে। ব্যাখ্যাতীত এই সুখ, বিনুর বড় হয়ে ওঠার মুহূর্তে যাকে সে মস্তিষ্কানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছিল।

১ ডিসেম্বর ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৩

অক্সফোর্ডের পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন ডিউক হামফ্রি লাইব্রেরিতে কয়েকটি সতেরো শতকের হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি ঘাঁটতে ঘাঁটতে কখন সব অস্পষ্ট হয়ে এল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে রিমঝিম। বৃষ্টির জল কি মাটিতে পড়ে মায়ামুকুর হয়ে যায়?

আমি দেখতে পাচ্ছি, অক্সফোর্ডের ব্ল্যাকওয়েল্‌স বুকশপ-এর সামনে দিয়ে ব্রড স্ট্রিটের বুক চিরে হেঁটে যাচ্ছেন পাঁচ ফুট উচ্চতার একজন মানুষ। তাঁর পিছন পিছন ছুটছে কয়েক জন তরুণ ছাত্রছাত্রী, যাঁরা চিনতে পেরেছে তাঁকে।

'Ah noh!' তাঁর ফরাসি শুনে আমি চমকে উঠেছি! তিনি শেলডোনিয়ান থিয়েটার দেখতে চাইছেন না, বদলেয়ান লাইব্রেরি নয়, বেলিয়ল বা মার্টন কলেজ নয়, ক্রাইস্ট চার্চ মেডোজ নয়। তিনি খুঁজছেন হতদরিদ্র মানুষদের ডেরা।

অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের শেক্সপিয়রীয় টীকাকারদের গালে বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় মেরে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলা মানুষটিকে এবার বেশ চেনা যাচ্ছে: সার্ত্র, জাঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০)! কী আশ্চর্য! এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

ক্ষমতা ও ক্ষমতার দালালদের থেকে দূরে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর তিনি দাঁড়িয়ে। সাহিত্যিক-দার্শনিকের গজদন্তমিনার ভেঙে বেরিয়ে আসা, সমাজের মুখোশ টেনে হিঁচড়ে খুলে ফেলা একক, অপ্রতিরোধ্য সার্ত্র।

আমি দেখতে পাচ্ছি প্যারিসের ঝলমলে ফুটপাথ। ব্যানার হাতে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী। অসম্ভব ঠেলাঠেলি, কেউ কেউ দৌড়চ্ছে, পাশে দু'-তিনটি 'স্যালাডের [illegible] যার অর্থ পুলিশ ভ্যান। ভিড় সরিয়ে আমি ব[illegible], আমায় দেখতে দাও। অবশেষে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক ঝলক দেখলাম নিষিদ্ধ মাওবাদী কাগজ 'লা কোজ় দ্যু প্যপ্‌ল' ('দ্য পিপল্‌স কজ়') বিক্রি করছেন জাঁ-পল সার্ত্র আর সিমন দ্য বোভোয়ার।

দেখতে পাচ্ছি র‍্যনো মোটর কারখানার বাইরে একটি পিপের ওপর দাঁড়িয়ে সার্ত্র বলছেন, 'আসুন, এবার বুদ্ধিজীবীদের সময় হয়েছে শ্রমিকদের কাছ থেকে শেখার।' ওই কারখানার শ্রমিক পিয়ের ওভেরনে নিহত হলে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিচ্ছেন, এবং তদন্তে অংশগ্রহণ করছেন। নির্বাচনকে বলছেন, 'piège à cons', উজবুকদের জন্য ফাঁদ।

তিনি নোবেল পুরস্কার কমিটিকে লিখছেন তাঁর প্রস্তাবিত নাম বিবেচনা না-করতে এবং তা সত্ত্বেও বিবেচিত হওয়ায় তিনি নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করছেন ছেঁড়া কাগজের মতো। একে কী বলব? প্রাচীন গ্রিকে যাকে বলত 'পারেজিয়া'? খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন নাট্যকার এউরিপিদেস? যার অর্থ 'সব কিছু বলা'। একজন 'পারেজিয়াস্ত' যা সত্যি বলে মনে করেন তা বলতে দ্বিধা করেন না। তিনি স্বাধীনতাকে বেছে নিয়েছেন। মিথ্যে বা নীরবতার চেয়ে স্পষ্টবাদিতা তাঁর প্রিয়, নিজের স্বার্থের চেয়ে কর্তব্য, কারণ তিনি কাপট্যজনিত নিশ্চিন্ততাকে বর্জন করেছেন।

দার্শনিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, জীবনীকার, সাহিত্য-সমালোচক সার্ত্র সব সময়ই মনে করেছেন সমকালীন সংস্কৃতির আমূল প্রত্যাখ্যান ছাড়া তরুণদের গত্যন্তর নেই। তিনি অন্তহীনভাবে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ (engagé) থাকতে চেয়েছেন, জীবন ও জীবন-ভাবনাকে এক ধনুকের ছিলায় বাঁধতে চেয়েছেন। 'বুর্জোয়া ফ্রান্সের সীমাহীন পচনের মধ্যে, যাবতীয় বৈপ্লবিক চিন্তার অভাবের মধ্যে, সেকেলে ও মধ্যমেধার শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে' নিরন্তর জীবনের প্রকৃত রূপ খুঁজতে চেয়েছেন তিনি। 'এই নরম কাদা (Cette pâte molle), ঢেউ-খেলানো, ভবিষ্যৎহীন, যেখানে শুধু দেখা হওয়া'— তাকে সদর্থক দিশা দেওয়ার এমন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এই অস্তিত্ববাদীর মতো করে ক'জন করেছে?

আমরা কেউ সম্পূর্ণ মানুষ নই। আমরা মানুষের সংজ্ঞার দিকে যাচ্ছি। আমরা être, being, আমরা 'হয়ে উঠছি।' অতীত আমাদের বাঁচাতে পারবে না, কোনও প্রাক-নির্ধারিত ধারণাও নয়। ঈশ্বর বলে অবশ্যই কেউ নেই। আছে অপার শূন্যতা, সেইসঙ্গে সীমাহীন স্বাধীনতা। চারপাশে মিথ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসের (mauvaise foi) ফাঁদ, যা আমাদের 'হয়ে ওঠা'-কে নঞর্থক করে দেবে, যা আমাদের মনুষ্যত্বকে নির্মাণ করতে দেবে না। আমরা কি সদর্থক কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ হব, না শূন্যতায় পর্যবসিত হব?

ফরাসি নৌবাহিনীর অফিসারের একমাত্র সন্তান জাঁ-পল সার্ত্র-এর মা ছিলেন ফ্রান্সের আলজ়াস অঞ্চলের মানুষ, অ্যালবার্ট শোয়াইৎজারের খুড়তুতো বোন। সার্ত্র-এর দু' বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর মা আন-মারি তাঁকে ম্যদঁ-তে বাপের বাড়ি নিয়ে যান। সেখানে তাঁর জার্মানবিদ দাদামশাই অঙ্ক শেখানোর পাশাপাশি তাঁকে বইপত্রের জগতে নিয়ে যান। তাঁর বারো বছর বয়সের সময় মা আবার বিয়ে করেন। মা'র সঙ্গে লা রশেলে গিয়ে খর্বকায় এক-চোখ অন্ধ ছেলেটিকে হতে হয় সমবয়সিদের নির্যাতনের শিকার।

বিশ্ববিখ্যাত একোল নর্মাল স্যুপেরিয়্যর-এ দর্শন-পাঠ। কান্ট, হেগেল, কীর্কেগার্দ, হুসের্‌ল, হাইডেগার তাঁকে প্রভাবিত করতে শুরু করেন। সেখানেই দেখা হল তাঁর প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ছাত্রী, আড়াই বছরের ছোট সিমন দ্য বোভোয়ার-এর সঙ্গে। সেই অনুভূতিসম্পন্ন, চিন্তাশীল, সুন্দরী মেয়েটি অন্তত তিনবার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত এক মুক্ত যৌথ জীবন যাপনের আমন্ত্রণে রাজি হন। তাঁদের দু'জনের অনিশ্চিত শৈশব, স্বতন্ত্র চিন্তার প্রাখর্য এবং পারস্পরিক প্রয়োজন এই বিশিষ্ট যৌথ জীবনযাপনকে সম্ভব করে তুলেছিল।

'বিবমিষা' উপন্যাস এবং 'দেয়াল' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর দু'বছর সেনাবাহিনীতে আবহাওয়া বিভাগে কাজ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি জার্মানদের হাতে বন্দি হন, এবং ন' মাস যুদ্ধবন্দি থাকাকালীন প্রথম নাটক 'বাড়িওলা' লেখেন এবং সেই সময়েই মন দিয়ে পড়েন হাইডেগারের 'সত্তা ও সময়'। ১৯৪১-এ মুক্তি পেয়ে লিসে পাস্তর এবং লিসে কঁদরসে-তে পড়াতে শুরু করেন। তারপর যুদ্ধ তাঁকে পালটে দেয়। দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য ও ইতিহাস মিলে যায় এক রক্তবিন্দুতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 'সত্তা ও শূন্যতা' লেখার মুহূর্ত থেকেই থিয়েটারে সরাসরি মানবাবস্থার ছবি তুলে ধরতে উৎসাহী ছিলেন তিনি। কিন্তু উপন্যাস নিয়ে তাঁর দার্শনিক পরীক্ষা 'ব্যর্থ' হওয়ার পর (চার খণ্ডে পরিকল্পিত 'স্বাধীনতার পথগুলি' তৃতীয় খণ্ডের পর পরিত্যক্ত হয়) শিল্পমাধ্যম হিসেবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থিয়েটারই তাঁকে স্বস্তি দিয়েছিল। উপন্যাস লেখার 'ইচ্ছে'-ই হারিয়ে ফেলেন তিনি। কারণ তা অতিমাত্রায় 'সরল', মার্ক্সবাদ ও মনো-বিশ্লেষণের প্রকোপে উপন্যাস 'অদৃশ্য' হয়ে যায়। কিন্তু থিয়েটারও যে শেষ পর্যন্ত একটি 'কৃত্রিম ও প্রতারক নির্মাণ' তা তাঁর কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়। অতঃপর তিনি সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের আগে নিজেকে জানার প্রয়োজনে আত্মজীবনী 'শব্দেরা' লিখতে শুরু করেন। এবং সেটি নোবেল পুরস্কার পাওয়ামাত্র বুঝতে পারেন তাঁর অন্বেষণ ব্যর্থ হয়েছে। এবার আর প্রাক-নিয়ন্ত্রিত আত্ম-প্রবঞ্চনা নয়। সার্ত্র নিজেকে দাঁড় করাবেন, সাক্ষাৎকারীর প্রশ্ন-তুরপুনের সামনে। কারণ সবচেয়ে গভীর কথোপকথন হতে পারে দুই চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে।

নিজের বোদল্যের-বিষয়ক বইটিকে মনে হয়েছিল 'অতি নিকৃষ্ট'। আত্মকথাটিকেও তাঁর মনে হয়েছিল আসলে একটি উপন্যাস মাত্র। যে-উপন্যাসটিকে তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছেন। একবার মনোবিশেষজ্ঞ বন্ধু পঁতালিসকে তাঁর সাইকো-অ্যানালিসিসের কথাও বলেন। কিন্তু পঁতালিস রাজি হননি। তাঁর ভাষায়:

> র‍্যাডিকালিজ়মের শেষ ধাপ পর্যন্ত আমি যেতে পারিনি। স্বাভাবিক ভাবেই আমি সারা জীবন নানা কারণে অনেক ছোট-বড় ভুল করেছি, কিন্তু আসল কথা হল প্রতি ক্ষেত্রেই আমি যথেষ্ট র‍্যাডিকাল হতে পারিনি।

পাঁচের দশকের শেষে তাঁর দ্বিতীয় মহাগ্রন্থ 'দ্বান্দ্বিক যুক্তির সমালোচনা' লেখার সময় সারা দিন ধরে লিখেছেন। করিডন ট্যাবলেট খেতে হচ্ছিল, দিনে কুড়িটি পর্যন্ত। অ্যাম্ফেটামাইন তাঁর চিন্তার গতি তিন গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল, তিনি তিন গুণ বেশি লিখতে পারছিলেন। 'সেটি ছিল একটি মার্ক্সবাদী গ্রন্থ, যা কমিউনিজ়মের বিরুদ্ধে রচিত।' তাঁর মতে, কমিউনিস্টরা 'মার্ক্সবাদকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে মিথ্যেয় (falsifié) পরিণত করেছে।'

এক বছরের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাত থেকে হুইস্কির গেলাস পড়ে যাচ্ছে, হাতের লেখা অস্পষ্ট। সিমন ভয় পেলেন, কিন্তু জানতেন সার্ত্র-এর যা বলার তা তিনি বলবেনই। পরে ফ্লবের-বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সময় সার্ত্র একই রকম পরিশ্রম করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, হাঙ্গেরির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, রুশ ইহুদি বিরোধিতার বিরুদ্ধে, প্রতিবাদকারীদের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। আলজিরিয়ায় ফরাসি শাসনের নির্যাতন-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ১২০ জন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে সই করেছেন, শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন। ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'জাতিবিনাশ'-এর অভিযোগ তোলেন, পরের বছর প্যারিসে বার্ট্রান্ড রাসেলের উদ্যোগে গঠিত বিশ্ব যুদ্ধাপরাধ বিচারসভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬৮-র ছাত্র আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের বহিষ্কারের বিরোধিতা করেছেন। প্রতিবাদীদের পাশে দাঁড়িয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। যদিও রাষ্ট্রপতি দ্য গোল সেদিনই তাঁকে মুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'ভলতেরকে কি বন্দি করে রাখা যায়?'

স্তাঁদাল ও স্পিনোজা-কে একসূত্রে মিলিয়ে দিয়ে যিনি নেমে এসেছিলেন অংশগ্রাহকের ময়দানে, সেই সার্ত্র-এর ফ্ল্যাটে ১৯৬১-'৬২ সালে দু'বার বোমা পড়ে।

যখন ১৯৭৫ সালে নিভে এল তাঁর দ্বিতীয় চোখের আলো, সার্ত্র তাঁর লেখক-জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। শেষ হল না তাঁর ফ্লবের-বিষয়ক গ্রন্থ কিংবা 'দ্বান্দ্বিক যুক্তি সমালোচনা'-র দ্বিতীয় ভাগ। মিশেল কঁতা-কে বললেন, সাহিত্যকর্ম অথবা দর্শনগ্রন্থ তো শেষ হয় না। বললেন:

> আমার বার্ধক্যকে আমি অনুভব করছি আমার অর্ধ-অন্ধতা দিয়ে (যেটি একটি দুর্ঘটনা, অন্য রকম দুর্ঘটনাও ঘটতে পারত), মৃত্যুর পদধ্বনি দিয়ে, যাকে অস্বীকার করার একেবারেই কোনও উপায় নেই। আমি তার কথা ভাবি না, কখনও ভাবি না, কিন্তু আমি জানি তা আসছে।

১৯৮০ সালের এপ্রিলে মৃত্যুর পঁচিশ দিন আগে শিষ্য বেনি-লেভি'কে সার্ত্র বললেন:

> আমাকে আবার গ্রাস করছে নৈরাশ্য। ভয় হচ্ছে এই দুর্গতির অবসান হবে না। কোনও লক্ষ্য নেই, শুধু রয়েছে ছোট ছোট উদ্দেশ্য... এমন কিছু নেই যা মানুষকে আগ্রহী করতে পারে, শুধু আছে বিশৃঙ্খলা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আমি প্রতিরোধ করছি এবং আমি জানি আমি আশা নিয়েই মরব, কিন্তু এই আশাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

একথা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে কেন এখনকার এই বীভৎস পৃথিবী দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে শুধু একটা মুহূর্তমাত্র। ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে যে, আশা বরাবর বিপ্লব ও বিদ্রোহের এক প্রধান চালিকাশক্তি এবং আমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার ধারণারূপে আশাকে কেমনভাবে এখনও অনুভব করি।

(অনু: অরুণ মিত্র)

আমি চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাচ্ছি ফুসফুসের ইডিমায় মৃত সার্ত্র-এর দেহ বয়ে নিয়ে চলেছে হাজার হাজার মানুষ, মঁপারনাস সমাধিক্ষেত্রের দিকে। ফ্রান্সের নক্ষত্রখচিত ইতিহাসে ১৮৮৫ সালে প্রয়াত ভিক্তর য়্যুগো-র পর একশো বছরে একবারও এমন হয়নি।

'এই নরম কাদা, ঢেউ খেলানো, ভবিষ্যৎহীন...'

তার মধ্যে দিয়ে সোজা হেঁটে চলেছেন জাঁ-পল সার্ত্র। পাশ্চাত্যের অগ্নিদগ্ধ বিবেকের শেষ প্রতিনিধি।

৫ জানুয়ারি ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৪

Feathered dark in thought, I stalk like a rook,
brooding as the winter night comes on.
(Winter Landscape, with Rooks)

অনেক রাতে যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম আমি কাঁদছি।

কোন সে দূর দেশের বনলতা, সুচেতনা, অরুণিমা সান্যালের জন্য ভিজে যাচ্ছে আমার শিথান? কোন সে হারিয়ে যাওয়া নারী যে বিড়ালির মতো নিঃশব্দে এসে এত রাতে আমায় কাঁদায়? যার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না, খুঁজি না। কার জন্য আমি দেওয়ালে মাথা ঠুকছি আর বলছি 'সিলভিয়া, সিলভিয়া...'। একটা রক্তের ধারা গড়াতে গড়াতে দেওয়ালের মাঝখানে শিশির হয়ে থাকল।

গ্যাস আভেনের ভেতর অনেক দূর মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই মেয়েটি। দু' বছর দশ মাস আর এক বছরের শিশু দু'টির ঘর আর নিজের ঘরের মাঝে গুঁজেছিল ভেজা তোয়ালে আর ন্যাকড়া। যন্ত্রণার এমন দোমড়ানো-মোচড়ানো রূপ কি শুধু কবিদের ভবিতব্য?

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩।

জীবন থেমে আছে মৃত্যুর শীৎকারের সামনে। 'A squeal of brakes'

মেয়েটির নাম সিলভিয়া প্লাথ (১৯৩২-১৯৬৩)।

তার মৃত্যুর ঋতু ছিল হিমবাহময়। লন্ডনে দেড়শো বছরের সবচেয়ে ভয়ংকর শীতে পাইপের ভেতর জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল।

কয়েক দিন আগে জানুয়ারি মাসে বেরিয়েছিল ভিক্টোরিয়া লুকাস ছদ্মনামে লেখা তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'দ্য বেল জার'। আর ঘোর অবসাদের মধ্যে সে তৈরি করছিল তার কবিতাসংগ্রহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হেপটনস্টলের সেন্ট টমাস দ্য অ্যাপোস্‌ল্‌ গির্জায় সিলভিয়া প্লাথের সমাধি ফলকে রক্তপদ্মের কথা উৎকীর্ণ করেছিলেন স্বামী টেড হিউজ: 'এমনকী লেলিহান আগুনের মধ্যেও স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়ে তোলা যায়।' দোষী বা নির্দোষ যাই হোন, সিলভিয়ার মৃত্যুর জন্য হিউজ-কে কেউ ক্ষমা করেননি।

এক শক্তিশালী আমেরিকান কবির আত্মানুসন্ধানের চূর্ণবিচূর্ণ স্নায়ুতট। স্নায়ুগুলি ইতস্তত ছেঁড়া, ছিন্ন মালার মতো। অক্ষরের নাভি জুড়ে অশ্রু আর চুম্বনের দাগ। 'Her blacks crackle and drag' এমন ভাঙচুরময় দীপ্তি সিলভিয়া আয়ত্ত করেছিল কীভাবে?

১৯৩২ সালে ম্যাসাচুসেট্‌সের সমুদ্রশহর উইনথ্রপে জন্মেছিল সেই মেয়ে। আট বছর বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেছিল সে। মা-বাবা ছিলেন অস্ট্রিয়ার মানুষ। বাবা বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি যৌবনে প্রুশিয়ার একটি শহর থেকে আমেরিকায় এসে পৌঁছন। সিলভিয়া-র আট বছর বয়সে মারা যান তার বাবা।

Father, this thick air is murderous.
I would breathe water.

সে লিখত কবিতা। আর ছোটগল্প। পঁয়তাল্লিশ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯৫০ সালে 'সেভেনটিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম ছোটগল্প। স্মিথ কলেজের ছাত্র-পত্রিকার সম্পাদনার ভার পড়ে তার ওপর। হরেকরকম ছোটখাটো পুরস্কার পেতে পেতে মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল সে অন্যরকমভাবে লিখতে পারে। কবিতার ত্বক ফুঁড়ে প্রবাহিত করতে পারে অন্য জলধারা।

Stars open among the lilies...

আত্মবিধ্বংসী সিলভিয়া একবার অল্প বয়সেই (তত দিনে 'মাদমোয়াজেল' কাগজে কথাসাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছে সে) বিষাদে ডুবেছিল ছ' মাস, আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল। ১৯৫৩ সালের অগাস্টে তিন দিন নিখোঁজ মেয়েটিকে বাড়ির নীচে হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। মা'র ঘুমের ওষুধ চুরি করে খেয়েছিল সে। [illegible] শক্ ট্রিটমেন্টের পর কিছুটা সুস্থ হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে কেমব্রিজে যায়। সেখানেই দেখা হয় কবি টেড হিউজের সঙ্গে। তারপর ঘন ঘন দেখা হয় তাদের। পরস্পরকে কবিতা পাঠায় তারা। অতঃপর ১৬ জুন ১৯৫৬ বিয়ে হয় এই আশ্চর্য কবি-যুগলের। বিয়ের পর ১৯৫৭ সালে তারা আমেরিকা চলে যায়। সেখানেই ম্যাসাচুসেট্সের স্মিথ কলেজে পড়াতে শুরু করে সে। 'খুব কম, খুব কম শিক্ষক এমন আশ্চর্যরকম ভাল পড়াতে পেরেছে ইংরেজি বিভাগে।' বলেছেন তার এক সহকর্মী।

বিষণ্ণতার পদশব্দ। কষ্ট এড়াতে ম্যাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতালে মনোরোগ বিভাগে সেক্রেটারির কাজ নিয়েছিল সে। ১৯৫৯ সালের বড়দিনে লন্ডনে ফেরে তারা। মেয়ে ফ্রিডা জন্মাল ১৯৬০ সালে এপ্রিলে। সে-বছরই প্রকাশিত হয় সিলভিয়া-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দ্য কলোসাস'। তখন সে লিখছে একটি কুড়ি বছরের কলেজের মেয়ের স্নায়ুবিপর্যয় নিয়ে উপন্যাস 'দ্য বেল জার'। ছেলে নিকোলা জন্মাল ১৯৬২-র জানুয়ারিতে।

সিলভিয়া তখন লিখতে শুরু করেছে অন্যরকম এক কবিতাগুচ্ছ, যা 'অ্যারিয়েল' নামে খ্যাত। টেড-এর মতে, সেই পর্যায়ের সূচনা 'টিউলিপ্স' কবিতাটি দিয়ে। কখন সে এই গভীর মৃত্যুমর্মরিত প্রজ্ঞায় পৌঁছল? টেড হিউজ় লিখেছেন সেটি লেখা হয়েছিল 'বিদ্যুৎবেগে, যেন একটা দরকারি চিঠি লেখা হচ্ছে।'

টেড লিখেছেন, সিলভিয়া একটি কবিতাও ফেলেনি। প্রত্যেকটি কবিতার টুকরো ঘষে-মেজে সে পরিপূর্ণ রূপ দিয়ে চেয়েছিল। যেন যন্ত্রণার ভাস্কর্য।

১৯৬২ সালে যখন হঠাৎ ধরা পড়ে গেল স্বামী টেড হিউজ়ের সঙ্গে পারিবারিক বান্ধবী অ্যাসিয়া ওয়েভিলের সম্পর্কের কথা, সিলভিয়া বিচ্ছেদ চেয়েছিল। জুলাই থেকে তারা আলাদা থাকে। বিবিসি-তে একটি চাকরির ব্যবস্থা করেছিল সে, খুঁজেছিল শিশু দু'টিকে নিয়ে লন্ডনে থাকার ফ্ল্যাট। লন্ডনে বাড়ি খুঁজতে গিয়ে প্রিমরোজ হিলে ইয়েট্সের বাড়ির ('Yeats lived here') নীল রঙের প্লাক দেখে সে মুগ্ধ। সেখানেই থাকতে চেয়েছিল সে। সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে ('With every fiber of her being')। সেই বাড়ি তার স্বর্গ, সেটাকে পাঁচ বছরের জন্য সে ভাড়া নিল।

টেলিফোন তখনও আসেনি, মাঝে-মাঝেই বিদ্যুৎ এবং সেন্ট্রাল হিটিং চলে যায়। সিলভিয়া বারবার অসুখে পড়ে, বাচ্চা দু'টিও। অবসাদ কাঁকড়ার মতো আঁকড়ে ধরছে তাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার জন হর্ডার যে অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট দিলেন, তা তার পক্ষে প্রবল ক্ষতিকারক ছিল বুঝতে পারেনি সে। আমেরিকায় ছিল ওই ওষুধটির অন্য নাম, ইংলন্ডের নামটি তার অজানা ছিল। ডাক্তার চাইছিলেন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে, মনোবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে। কিন্তু তার আগেই ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ আত্মহনন করল সিলভিয়া। দু'বার প্রত্যাখ্যাত 'দ্য বেল জার' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার উনিশ দিন পরে।

মৃত্যুর আগে তার শেষ কবিতায় সে লিখেছিল:

Her bare
Feet seem to be saying:
We have come so far, it is over.

Each dead child coiled, a while serpent,
One at each little

Pitcher of milk, now empty.
She had folded

Them back into her body as petals
Of a rose close when the garden

Stiffens and odors bleed
From the sweet, deep throats of the night flower.
(Edge)

শিশু দু'টির পাশ থেকে উঠে চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকারে কখন আত্মহত্যা করল সে? যখন 'fever soaks me like honey...” তখন কি সে বুঝেছিল সমস্ত ফুলের পাপড়ি এখন পাথর হয়ে গিয়েছে?

সরে যাও।

ওইখানে সিলভিয়া প্লাথ শুয়ে আছে।

১৯ জানুয়ারি ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৫

আধো-অন্ধকারে গাছের নীচে একটি চেয়ারে একরাশ সাদা দাড়িওলা সৌম্যকান্তি মানুষটিকে বসে থাকতে দেখে চমকে উঠেছি। রবীন্দ্রনাথ না?

না, ভিক্তর য়্যুগো।

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে তিনি দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে এসে ছবি আঁকার তুলিটি তুলে নিলেন হাতে। দু'চারটে আঁচড় কেটে সেটি সরিয়ে রেখে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে আর দেশলাই কাঠির মাথা দিয়ে কালো আর বাদামি কালিতে ছবি আঁকতে লাগলেন। একটি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে খানিকটা কফি ছিটিয়ে দিলেন কাগজের ওপর। স্যুররেয়ালিস্ত্ ছবি যেন, স্যুররেয়ালিজ়মের সাত দশক আগে।

রঁসার, শাতোব্রিয়াঁ, লামারতিন, বোদল্যের, ভের্লেন, র‍্যাঁবো, ক্লোদেল, ভালেরি... ফরাসি কবিদের মধ্যে ব্যাপ্তি, বৈচিত্র ও গভীরতায় কেউ আসে না ভিক্তর য়্যুগোর (১৮০২-১৮৮৫) কাছাকাছি। 'ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে আঁদ্রে জিদ বলেছিলেন, 'Hélas, Victor Hugo!' দুর্ভাগ্যবশত, ভিক্তর য়্যুগো! কে তাঁকে অস্বীকার করবে? যেন তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো প্রশ্নাতীত।

মহাবিশ্বের দুধপথের সঙ্গে যাঁদের কথা হয়, যাঁরা আকাশের মতো সহজ, মহৎ, বিশাল, তিনি তাঁদের দলে। ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর, কিন্তু সর্বাগ্রে কবি। রম্যাঁ রলাঁর ভাষায়, 'Haut Poète', 'দীর্ঘকায়' এক কবি। রবীন্দ্রনাথের মতো।

রবীন্দ্রনাথ? তাঁর সমস্ত বৈপরীত্য নিয়ে তেমন বহুস্তর, সাতরঙা রামধনু কি সম্ভব?

নিজের চোখে [illegible] করতে [illegible]ননি রলাঁ। ১৯২৬ সালের জুন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাসের শেষে জেনিভা হ্রদের কোলে বায়রন হোটেলের জানলায় রবীন্দ্রনাথকে দেখে তাঁর মনে পড়েছিল কয়েক যুগ আগে সেই জানলায় দাঁড়ানো য়্যুগোর কথা। তাঁরা একাই একটা শতাব্দী।

ছেলেবেলায় রাজতন্ত্রী ছিলেন ভিক্তর, কবে কখন হয়ে উঠলেন কবিদের রাজা, ফরাসি রোমান্টিক কাব্যের দিশারী। তাঁর নাটক 'ক্রমওয়েল' এক রাজপন্থীর পক্ষে ছিল বিস্ময়কর এক নির্বাচন। কারণ ক্রমওয়েল সতেরো শতকে ইংল্যান্ডের রাজাকে হত্যা করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেই নাটকের ভূমিকা তাঁকে রোমান্টিকদের পুরোভাগে বসিয়ে দিল। তা শুধু এক কবির ভাষ্য রইল না, হয়ে উঠল এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টার রক্তাক্ষর। পঁচিশ বছর বয়সি ভিক্তর বিপজ্জনক ভাবে ঘোষণা করলেন নতুন সাহিত্য জীবনের কথা বলবে সবচেয়ে সুন্দর করে। বলেছিলেন পুরনো নিয়মাবলিকে জাহান্নামে পাঠানোর কথা, সাহিত্যে মহৎ আর নগণ্যকে, শরীরের সঙ্গে মনকে মিশিয়ে দেওয়ার কথা।

'এরনানি' (১৮৩০) নাটক ক্লাসিক নাটকের নিয়মকানুনকে তছনছ করে দিল। ২৫ ফেব্রুয়ারি পুরো প্যারিস দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল ভিক্তর য়্যুগোর নাটক দেখতে। একটি যুগের অবসান, আরেকটি যুগের সূচনা। ক্লাসিক ও রোমান্টিক দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে মানুষ। একটি সাহিত্য-আন্দোলন প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ নেবে এ শুধু ফ্রান্সেই সম্ভব! একদিকে কালো পোশাক পরা সনাতনপন্থী, অন্য দিকে রঙিন জামাকাপড় পরা উচ্ছল রোমান্টিকেরা: আলফ্রেদ দ্য ভিন্যি, জেরার দ্য নেরভাল, আলেকসাঁদ্র্ দ্যুমা, সংগীতকার বেরলিওজ। ঘটে গেল পালাবদল। সনাতনপন্থীদের বাধা সত্ত্বেও ছত্রিশবার অভিনীত হল সেই নাটক।

ফরাসি আকাদেমিতে দু'-দু'বার ব্যর্থ হওয়ার পর ১৮৪১ সালে সফল হলেন য়্যুগো। কিন্তু প্রথম দিন বক্তৃতার সময় সাহিত্যের কথা উল্লেখই করলেন না তিনি, বললেন শুধু দারিদ্র, ন্যায়বিচার আর স্বাধীনতার কথা।

১৮৪৮-এর বিপ্লবে য়্যুগো যদি জনতার ব্যারিকেডের সামনে প্রাণ হারাতেন, তিনি জনমানসে হয়ে থাকতেন এক মহৎ কবি, কিন্তু শুধুই এক কবি। কিন্তু ১৮৪৯ সালে এক নতুন য়্যুগোর জন্ম হল, যিনি স্বাধীনতা, ন্যায় আর প্রগতির পক্ষে। কবি হয়ে উঠলেন পথপ্রদর্শক।

তাঁর প্রকাশ্য সমর্থনে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হয়ে আসা সম্রাট নেপোলিয়নের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাইপো লুই নাপোলেঁয়-র সংসদে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় ভিক্তর য়্যুগো জানালেন ফ্রান্সের প্রধান কাজ দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই। সে কথা শুনে বিদ্রূপ শুরু হল। কিন্তু য়্যুগোকে থামাবে কে? তিনি দাবী করলেন মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার, বিপ্লবীদের মুক্তির কথা। আর কুঠার তুললেন চার্চের বিরুদ্ধে, যার অনুপ্রবেশ শিক্ষার সর্বনাশ করতে পারে।

যখন লুই নাপোলেঁয় দাবী করলেন তাঁর মাইনে তিরিশ লক্ষ ফ্রাঁ করা হোক, গর্জে উঠলেন ভিক্তর। কী? দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানোর অজুহাতে ক্ষমতায় এসে এত বড় কথা! তিনি বললেন, 'আমরা নেপোলিয়ন দি গ্রেটকে পেয়েছিলাম, কিন্তু তাই বলে কি আমাদের খুদে নেপোলিয়নকেও সহ্য করতে হবে? আমরা আশাহত।' বক্তৃতা শেষ করে তাঁর নির্ধারিত আসনে বসলেন না য়্যুগো। বসলেন সভাকক্ষের একেবারে শেষে, বাঁদিকে।

তৃতীয় নাপোলেয়ঁ-র রোষানলে পুড়ল তাঁর কাগজ। তাঁর দুই ছেলে গ্রেপ্তার হলেন। সংসদ বন্ধ হল।

পথে নামলেন ভিক্তর য়্যুগো। সাধারণ মানুষকে বললেন, এবার হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার সময় হয়েছে, সময় হয়েছে ব্যারিকেড তৈরি করার। পাঁচ দিন ধরে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দু'জন সহযোগীর সঙ্গে তিনি সে কাজে হাত লাগালেন। ৪ ডিসেম্বর ব্যারিকেড তৈরি হল। কিন্তু সেনাবাহিনী এসে সব ধ্বংস করে দিল। নিহত হল তিনশো জন মানুষ।

য়্যুগো একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তাঁকে যে একটি আট বছরের মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

লুই নাপোলেয়ঁ তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করছেন শুনে শ্রমিকের বেশে দেশ ছাড়লেন তিনি। কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি আর ফ্রান্সে ফিরবেন না।

ব্রাসেলসে গিয়ে নাপোলেয়ঁকে নিয়ে লিখলেন একটি পুস্তিকা যার নাম খুদে নাপোলেয়ঁ। গোয়েন্দাদের দৌরাত্ম্যে এবার বেলজিয়াম ছেড়ে জার্সি দ্বীপে। ফ্রান্স থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে ইংল্যান্ডের অধীন এই দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে ফরাসি খবরদারি অচল।

কিন্তু স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ভলতের-এর এই উত্তরসূরিকে কে ঠেকাবে? তাঁর কলম ঝলসে উঠল আবার, ইস্পাতের ফলার মতো। তাঁর 'মানুষ'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পত্রিকায় ফরাসি সম্রাটের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার ফ্রান্স-যাত্রাকে আক্রমণ করলেন তিনি। ভয় পেয়ে জার্সির রাজ্যপাল ভিক্তরকে দেশ ছাড়তে বললেন।

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে 'লে মিজেরাব্‌ল' উপন্যাসের রচয়িতার। ১৮৫৫ সালের ৩১ অক্টোবর অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে ভিক্তর য়্যুগো সপরিবারে উঠে বসলেন নৌকোয়। রওনা হলেন গেরনজি দ্বীপে। সমুদ্রের সামনে ওতভিল হাউস নামে এক প্রাসাদ কিনে বাড়ির ছাদে উড়িয়ে দিলেন ফ্রান্সের পতাকা।

পনেরো বছরের পরিশ্রমে শেষ হল 'লে মিজেরাব্‌ল', দুর্গতেরা। দারিদ্রের কারণে চুরি করে জেলে গিয়ে পশুতে পরিণত হওয়া জাঁ ভালজাঁ আর কোজেৎ নামে এক তরুণীর গল্প হয়ে উঠল সমগ্র উনিশ শতকের সমাজেতিহাস।

য়্যুগো নাকি তাঁর প্রকাশককে বইটা পাঠক কেমন ভাবে গ্রহণ করেছে জানার জন্য টেলিগ্রাম করেছিলেন একটি প্রশ্নচিহ্ন(?), আর প্রকাশক তার বিস্ময়কর সাফল্যের কথা জানিয়েছিলেন একটি বিস্ময়চিহ্ন(!) দিয়ে!

ছেলে শার্ল এবং ফ্রাঁসোয়া-ভিক্তর মারা গিয়েছে। মেয়ে আদেল মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে সে।

এদিকে জ্বলছে প্যারিস কমিউনের আগুন। 'কমিউনার' নামে পরিচিত সাধারণতন্ত্রী সাধারণ মানুষ আর সরকারি সেনাদের লড়াই চলল টানা তিন মাস। কমিউনারদেরই পরাজয় হল। প্যারিস পুড়ছে, ষাট হাজার মানুষ নিহত, হাজার হাজার মানুষ জেলে। য়্যুগো প্যারিসে থাকতে পারেননি, কমিউনের শুরুতেই চলে গিয়েছেন ব্রাসেলসে। হিংসা তাঁর পথ নয়। কোনও পক্ষের হিংসাই তিনি ক্ষমা করেননি। পরে যখন কমিউনের পরাজয় হল, য়্যুগো নির্দ্বিধায় পরাজিত শ্রমিকদের পক্ষ নিলেন। তিনি তো হতভাগ্যদের দলে।

বেলজিয়াম, লুকসেমবার্গ হয়ে ফ্রান্স। তিন বছর অপেক্ষা করতে হল ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করার জন্য। য়্যুগো তো সর্বদাই স্বাধীনতার পক্ষে। তিনি কমিউনারদের মুক্তি চাইলেন, আর লিখলেন ১৮৭১-এর ভয়াবহ দিনগুলোকে নিয়ে কবিতার বই 'ভয়ংকর বছর'। যন্ত্রণাকে পার হয়ে এক আশ্চর্য বিজয়গাথা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার বাড়ির সামনের রাস্তার নাম এখন ভিক্তর য়্যুগো সরণি।

প্যারিসে থাকুন, সুইজ়ারল্যান্ডে যান বা ইতালি, সকলে তাঁকে সম্মান করে। বারান্দায় দাঁড়ালে জনতা অভিবাদন জানায়। কম্পিত স্বরে ভিক্তর য়্যুগো বলেন, 'Vive la République!' প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

তাঁর ৭৯তম জন্মদিনে দিকদিগন্ত থেকে ছুটে আসে মানুষ। নীল চোখে তা তাকিয়ে দেখেন 'লম কি রি' ('দ্য ম্যান হু লাফ্‌স')-র লেখক। যে উপন্যাসের গ্রিনপ্লেন চরিত্রটি একই সঙ্গে হাসে আর কাঁদে।

১৮৮৫ সালের ১৫ মে শ্রমিকের মলিন পোশাকে প্যারিসের ফুটপাথে হেঁটে চলেছেন য়্যুগো। একটি ছোট মেয়ে তাঁকে দেখে বলে উঠল: 'কী মজা! তোমায় না একদম ভিক্তর য়্যুগোর মতো দেখতে। আমি ভেবেছিলাম তিনি কোন কালে মরে গেছেন!'

য়্যুগো কেঁপে ওঠেন। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান। সেদিন রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর বইগুলো— কবিতা 'লে কঁতাঁপ্লাসিয়ঁ, ('অনুধ্যান'), 'লা লেজাঁদ দ্যু সিয়েক্‌ল' ('শতাব্দীর উপাখ্যান'), উপন্যাস 'লে মিজ়েরাব্‌ল' ('দুর্গতেরা'), 'নত্র-দাম দ্য পারি' ('হাঞ্চব্যাক অফ নত্র-দাম') থেকে উড়ছে আগুনের ফুলকি।

মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছাপত্রে তিনি লিখেছিলেন: 'গরিবদের মতো যেন মাটিতে কবর দেওয়া হয় আমায়। ধর্মীয় শেষকৃত্য আমি প্রত্যাখ্যান করছি। আমি সমস্ত মানুষের প্রার্থনার প্রার্থী। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।'

গভীর রাতে বালিঝড়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ভিক্তর য়্যুগোর শবযাত্রায় হাঁটছে গোটা ফ্রান্স।

পিছনের শতাব্দী আর সামনের শতাব্দী।

আকাশ, নক্ষত্রমালা, দুধপথ।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৬

'Fool', said my Muse to me, 'look in thy heart and write.'

তেলরঙের প্রতিকৃতিটির চোখ দু'টি অগ্নিশিখার মতো জ্বলজ্বল করছে।

ঘুমের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে ভাবছি লোকটি যেন কে। কোথায় যেন তাঁকে দেখেছি। কোন সমুদ্রপথের দেশে কোন নক্ষত্রনারীকে তিনি সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর হৃদয়!

ছবির মানুষটির ঠোঁট নড়ছে। ছবি কি এভাবে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে? আমি কান পেতে স্পষ্ট অক্সনিয়ান উচ্চারণে তাঁর কবিতা-পাঠ শুনি:

My true love hath my heart, and I have his,
By just exchange one for the other given:
I hold his dear, and mine he cannot miss;
There never was a bargain better driven
My true love hath my heart, and I have his...

(Arcadia)

সিডনি, স্যর ফিলিপ সিডনি (১৫৫৪-১৫৮৬)! কী করে ভুল হল! ওটা ছিল ইতালীয় শিল্পী পাওলো ভেরোনেজ়ে-র আঁকা পোর্ট্রেট। এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। এখন তাঁর গায়ে লোহার বর্ম, হাতে বর্শা। ঘোড়ার ওপরে উঠে বসলেন তিনি, কোমরে ঝুলছে তলোয়ার।

এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডের অন্য দুই সংস্কৃতিসৌধ শেক্সপিয়র আর ক্রিস্টোফার মার্লো-র চেয়ে দশ বছরের বড়, আয়ারল্যান্ডের লর্ড ডেপুটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গভর্নর স্যর হেনরি সিডনি ও লেডি মেরি ডাডলি-র সন্তান, কবি, সাহিত্যবোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, প্রেমিক ও যোদ্ধা। মার্লো যদি এসে থাকেন সমাজের তলদেশ থেকে, আর শেক্সপিয়র মধ্যবিত্ত শ্রেণি, শ্রুসবেরি স্কুল আর অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের ছাত্র ফিলিপ সিডনি ছিলেন ধনী ও অভিজাত পরিবারের মানুষ। তাঁর সহপাঠী ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাচীন ইতিহাসের তিন সেরা অভিযাত্রী উইলিয়াম ক্যামডেন, রিচার্ড হ্যাকলিট এবং স্যার ওয়ালটার র‍্যালে।

প্রেম ও বন্ধুত্ব নিয়ে শেক্সপিয়রের ১৫৪টি সনেটের কয়েক বছর আগেই সিডনি লিখেছিলেন উষ্ণ প্রেমের অর্ঘ্য সনেটগুচ্ছ 'অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলা'। সিডনি যদি 'অ্যাস্ট্রোফেল' বা 'star-gazer' হন, তবে কে এই স্বাতী নক্ষত্র 'স্টেলা', যে শেক্সপিয়রের 'dark lady'-র চেয়ে কম রহস্যরূপিণী নয়? লোকগুঞ্জন বলে, তার নাম নাকি পেনেলোপি। 'আর্ল অফ এসেক্স'-এর কন্যা পেনেলোপি ডেভারো, যে সিডনিকে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে করেছিল লর্ড রিচ বলে এক ধনী যুবককে।

১৫৬৮ থেকে ১৫৭১ পর্যন্ত ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে পড়ার পর (আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখছি অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ মেডো দিয়ে ঘোড়ায় করে আসছেন সেই তরুণ), ১৫৭২ সালে তিনি পার্লামেন্টে শ্রুসবেরি-র প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ইউরোপীয় রনেসাঁসের এই ইংরেজ সন্তান দেশের সীমানা পেরিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ১৫৭২ সালে— মার্লো আর শেক্সপিয়রের বয়স যখন আট! নবজাগরণের সৃজনতীর্থ ইতালিয়া তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। সমকামী প্রেমপ্রার্থী য়্যুবের লাঁগে-র অনুরোধে ভেনিসেই তাঁর বিখ্যাত পোর্ট্রেটটি এঁকেছিলেন পাওলো ভেরোনেজে। ইতালিতে বসে 'রিনাসিমেন্তো'-কে ('রনেসাঁস'-এর ইতালীয় নাম) খুব কাছ থেকে আস্বাদন করতে করতে সিডনি পড়েছিলেন ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্র। নিরন্তর ভাবে তর্ক করেছিলেন ধর্ম নিয়ে। প্যারিসে গিয়ে ১৫৭২ সালের ২৪ আগস্ট নিজের চোখে দেখেছিলেন রোমান ক্যাথলিকদের প্ররোচিত সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসের গণহত্যা। গিয়েছিলেন ভিয়েনা, জার্মানি, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড। সেখানে কী খুঁজেছিলেন তিনি তিন-চার বছর ধরে? কবিতা ও জীবনের নতুন এক কঙ্কাল?

১৫৭৫ সালে ৩১ মে দেশে ফিরে ফিলিপ সিডনি হয়ে উঠলেন এক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্মানিত এবং সর্বজনপ্রিয় সাংসদ। তিন বছর পর স্টিফেন গসন নামে এক ব্যক্তি কবিতার বিরুদ্ধে একটি বিধ্বংসী প্রস্তাব ('The School of Abuse') তাঁকে উৎসর্গ করায় ক্ষিপ্ত সিডনি তাঁর তলোয়ার খাপে ভরে তুলে নিলেন কলম। লিখলেন কবিতার সপক্ষে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত জবানবন্দি, যা 'অ্যান আপোলজি ফর পোয়েট্রি' বা 'দ্য ডিফেন্স অফ পোয়েজি' নামে পরিচিত।

কবিতা কি অপ্রয়োজনীয় ও অপাংক্তেয়, কারণ তা নীতিগত ভাবে মানুষকে সমৃদ্ধ করে না, শ্রেয়তর করে তোলে না, কারণ তা মিথ্যাচারী? যেমন মনে করেছিলেন স্বয়ং প্লেটো (প্লাতোন) 'আদর্শ' প্রজাতন্ত্র থেকে কবিদের বহিষ্কার করার সময়? কবিতার সপক্ষে তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিবেদনে সিডনি লিখলেন, স্বয়ং প্লেটো তাঁর সংলাপে কবিদেরই মতো কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন (এ কথা বলার সাহস আজও সিডনি ছাড়া আর কারও হয়নি)! এবং তাঁর দর্শনের ত্বক অর্থাৎ আঙ্গিকের জন্য তিনি আসলে কবিতার কাছে ঋণী! বললেন, গ্রিক বিজ্ঞানী এমপেদোক্লেস, রাজনীতিজ্ঞ সোলোন থেকে ইতিহাস-পিতা হেরোদোতুস— সকলেই কবিতার ভাষাকে ব্যবহার করেছেন তার অন্তর্নিহিত শক্তির জন্য। তার জীবন্ত আবেগের সঞ্চার ক্ষমতার ('passionate describing of passions') জন্য। মিথ্যাভাষণের অভিযোগের উত্তর বললেন, সাহিত্য বিশ্বজাগতিক, নৈতিক ও দার্শনিক সত্যকে প্রকাশ করার জন্য 'অসত্য'-কে ('fables') ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না।

১৫৭৯-'৮০ সালে, তখনও শেক্সপিয়র তোলেননি সমুদ্রঝড়, সিডনি বললেন, না, কবিতা জীবনের প্রতিলিপি বা ভাষ্য নয়, কবিতা এক স্বতন্ত্র নির্মাণ, 'a new nature', যা প্লেটো-কথিত নকলনবিশির পরিবর্তে এক 'বিকল্প' বাস্তবকে মেলে ধরে। The real world 'is brasen, the poets only deliver a golden.' কবিতার প্রেম ও বন্ধুতা তাই জীবনের চেয়ে সুন্দর, যা দেখে মুগ্ধ (অথবা বিরক্ত) হয়ে পাঠক নিজেকে শ্রেষ্ঠতর স্তরে উন্নীত করার প্রেরণা পাবে।

শেক্সপিয়রের আবির্ভাবের এক দশক আগে সিডনি বুঝেছিলেন আবেগ ও কল্পনার শক্তির কথা। আর ষোড়শ শতকেই তিনি বলেছিলেন ছন্দ মানে কবিতা নয়, যেমন গাউন মানে উকিল নয়! 'আর্কেডিয়া'-য় ছন্দ ও আঙ্গিক নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করলেন তা তাঁকে বসিয়ে দিল পুরোধার আসনে। ১৫৮২ সালে 'নাইটহুড' পেলেন সিডনি। ১৫৮৫ সালে হলেন ফ্লাশিং-এর গভর্নর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ এবং প্রোটেস্ট্যান্টিজ়মের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁকে এক বছর কাটাতে হল নেদারল্যান্ডসে, যেখানে এল তাঁর সামরিক নেতৃত্বে এক অভাবনীয় সাফল্য। ১৫৮৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জুটফেন শহরের কাছে একটি স্প্যানিশ কনভয়ের ওপর আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর উরুতে গুলি লাগে। ছোটবেলার সহপাঠী ও জীবনীকার ফাল্‌কে গ্রেভিল লিখেছেন, প্রতিপক্ষ স্যর উইলিয়াম পেলহ্যামের উরু-বর্ম না থাকায় যুদ্ধের সময় সিডনি নিজের উরু-বর্ম খুলে ফেলেছিলেন। না-হলে অত অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হত না! সিডনিকে নিয়ে দ্বিতীয় উপাখ্যানটিও কম রোমহর্ষক নয়! আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় যখন তিনি দেখতে পান এক মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিক তাঁর হাতে ধরা জলের পাত্রটির দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে আছে। তিনি পাত্রটি তাঁকে দিয়ে বলেন, 'Thy necessity is greater than mine!' তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশি। আঘাতের বিষক্রিয়ায় বাইশ দিন (মতান্তরে ছাব্বিশ) পর ১৭ অক্টোবর ১৫৮৬ তাঁর বয়স বত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ফিলিপ সিডনির মৃত্যু হয়।

'Come sleep! O sleep, the certain knot of peace,/ The baiting place of wit, the balm of woe,/ The poor man's wealth, the prisoner's release,/ The indifferent judge between the high and low.' (*Astrophel and Stella*, সনেট ৩৯)। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তাঁকে গেয়ে শোনানোর জন্য একটি গানও লিখেছিলেন সিডনি।

তাঁকে সমাধিস্থ করা হল লন্ডনের ভুবনবিদিত সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালে। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও সমগ্র ইউরোপ থেকে এত শোকবার্তা আসেনি এর আগে ও পরে কোনও ইংরেজ কবির জন্য! শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের লাতিন শ্রদ্ধার্ঘে ভরে গেল তাঁর মৃত্যুর আঙিনা। কবিরা নিবেদন করলেন এলিজি। কবি এডমান্ড স্পেন্সর তাঁর শোকগাথা 'অ্যাস্ট্রোফেল'-এ তাঁকে উপুড় করে দিলেন ভালবাসার ডালি।

ওই কবি, সৈনিক, কূটনীতিজ্ঞ ও প্রেমিক কখন যেন রাতের অলৌকিক নৈঃশব্দ্যের ভিতর হয়ে উঠেছেন রনেসাঁস হিউম্যানিজ়মের প্রতীক।

Loving in truth, and fain on verse my love to show
That she, dear she, might take some pleasure of my pain;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Pleasure might cause her read, reading might make her know,
Knowledge might pity win, and pity grace obtain,
I sought fit words to paint the blackest face of woe...

আমি ঘুমের মধ্যে স্যর ফিলিপ সিডনির জন্য একটি মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার পিছনে ছায়ান্ধকারে অনেক মানুষের ভিড়ে মাথা নিচু করে ফুল হাতে এক অপরূপ ইংরেজ কিশোরী, যার নাম পেনেলোপি।

স্বামীকে লুকিয়ে ওই মৃত তরুণের জন্য সেও এসেছে আজ, এই নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৭

সমুদ্রের মতো বিরাট একটা ঘর। অত বড় ঘর হয়? না কি পালতোলা জাহাজ?

বিরাট সিঁড়ি আর দরজা পেরিয়ে সেখানে পৌঁছতে যেন অন্তবিহীন পথ পার হতে হয়।

ঘুমের দেশ পেরিয়ে সেই দ্বীপের মতো ঘরে হাজার হাজার বইয়ের ভিতর একটি চেয়ারে বসে আছেন একজন মানুষ। এমন ভাস্কর্য-মুখ কোন শিল্পীর বাটালিতে খোদাই করা?

এমন মগ্নতা দেখিনি কত দিন!

পা-দু'টি ভাঁজ করে সামনের চৌকির ওপর তোলা। হাতে তুলি, ছবি আঁকছেন একমনে। ডানদিকে বাজছে মোৎসার্টের 'আইনে ক্লাইনে নাখট্‌মুজিক'। একটি পাখির পালকও খুব আস্তে আস্তে মেঝেয় পড়বে, পাছে তাঁর মগ্নতা ভেঙে যায়। আমি খুব কাছ থেকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করি কোন বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকছেন তিনি। জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান' না 'সুতীর্থ', এখন আর মনে পড়ছে না আমার।

অথবা পড়ছেন ছড়িয়ে থাকা চামড়ায় বাঁধানো তিনটি বইয়ের একটি। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' মুক্তি পাচ্ছে না তখন। নিঃশব্দ হতাশার মুহূর্তে তাঁর হাতে কোন বই? আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখি, শেক্সপিয়র।

ছবি ঝাপসা হয়ে আসে।

এখন সে কত রাত।

একমনে সেই ভাস্কর্য-মানুষ এখন অনুবাদ করছেন সুকুমার রায়। অথবা ক্যালিগ্রাফিক হস্তাক্ষরে লিখছেন সেই সব ছবিকথা, যা ডানা মেলে উড়ে গিয়ে চিরকালীন [illegible] গেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-জাদুঘরে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশেষে যখন নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে ফেলল তাঁর কণ্ঠস্বর। আমার শরীর সজাগ হয়। চারপাশের অন্তহীন ভূতের নাচের ভিতর আমার বিবমিষা কমে আসে...

এখন তাঁর মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, গায়ে আলোয়ান। পিয়ানোর সামনে নিথর। সেই আশ্চর্য বহুকৌণিক দূরত্ব-অভিঘাত, যার নাম 'নেগেটিভ ক্যাপেবিলিটি'। দুই শতাব্দী আগে যার শ্রেষ্ঠতার কথা বলেছিল মৃত্যুপথযাত্রী এক তরুণ কবি, যার নাম কীট্‌স। চারপাশের ফেনিল আবেগ আর আর্ত চিৎকারকে অতিক্রম করে কবে কখন সেখানে পৌঁছলেন তিনি? যন্ত্রণার সীমাহীন খোড়ল থেকে বেরিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে স্রোত তৈরি করা মানুষটি এখন পিয়ানোর সামনে নিথর।

১০০ নং গড়পার রোডের বারান্দায় এক পিতৃহীন শিশু ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে। দেয়াল ভাঙবে সে, দেয়ালহীন হয়ে উঠবে তাঁর ঘর। তার আগে একদিন— ২৯ অগাস্ট ১৯২৩— দু' বছর চার মাস বয়সে ছোট শিশু মানিক দেখেছিল সুকুমার রায়ের শয্যাপার্শ্বে একটি একটি করে ন'টি গান শোনাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র-জীবনীকার এবং চলচ্চিত্র-রূপায়ক মানিক কি খেলতে খেলতে শুনেছিল সেই সব গান?

'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' ভেঙে গেল যখন ১৯২৭ সালে, মানিকের বয়স তখন ছয়। তার কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেই দুর্ঘটনার কথা। সেলাইরত মা'র দিকে চেয়ে শিশু-মানিক কি বুঝেছিল অজানা কোনও সমস্যার ধূসরিমা? কিন্তু কী আশ্চর্য গভীর তার চোখ!

অদৃশ্য এক শিশুকে তার দিদি ঝাঁকুনি দেয়। আরও কাছ থেকে দেখা যায় দুর্গা চাদরের ভিতর একটি ফুটোকে আঙুল দিয়ে বড় করছে। ফুটোর ভিতর অপুর বোজা চোখ। চোখটি খুলে যায়, বাইরে তাকায়। 'পথের পাঁচালী'-র প্রথম মুহূর্তের দৃষ্টিপ্রদীপ। চোখ খুলে যায় চোখে খুলে যায় চোখ খুলে যায়। ভিতর-চোখ।

ক্যামেরার চোখও।

দাঁত মাজতে গিয়ে অপুর আঙুল থেমে গিয়েছে, সে শুনছে সন্তানহারা পিতার কান্না: 'দুগ্‌গা— দুগ্‌গা মা'।

হরিহর বুঝতে পেরেছে দুর্গা নেই। সে উঠে দাঁড়ায়। তার মাথা ফ্রেমের বাইরে, ক্যামেরার সামনে তার ভাঁজ-করা হাঁটু। এক দুঃসহ যন্ত্রণামুহূর্তের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্থিতিকাল ফুটিয়ে তোলা হয় শারীরিক অসহায়তা ও তার প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে।

যন্ত্রণার ভাস্কর্যের শিল্পী কি আনন্দের চিত্রকরও নন? এর আগে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন ফিরে আসার খবর দিয়েছিল হরিহর, তখন আনন্দে বেঁকে গিয়েছিল জলপাতা। আর ঘুরে ঘুরে নর্তকীর মতো নেচেছিল জলপিপি! চলমান মিষ্টির হাঁড়ির পিছনে ছুটে চলা শিশু দু'টির ভাস্কর্যের পিছনে একটি কুকুরের চিত্ররূপময়তা জলের মুকুরে চকিতে বিদ্যুৎময় হয়ে আছে।

'পথের পাঁচালী'-র সেই অবিস্মরণীয় ভাঙা-দেয়ালের মতো চলচ্চিত্রের পরদাকেও দু'ভাগ করে দিতে পারেন তিনি। যার দু'পাশে অপমানিত মা ও মেয়ের কান্নার দুই রূপ। আবেগকে দু'ভাগে ভেঙে দেওয়া যায় এইরকম সুগভীর প্রত্যয়ে?

কেন ঢেকে দিতে চায় একটি শিশু পুকুরের শ্যাওলার আবরণের নীচে আপনজনের অপরাধ? বাটির মধ্যে থেকে পালায় এক মাকড়সা। পুরু জালের মধ্যে মৃত দিদির চুরি করা মালা পুকুরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অপু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ না জলপাতায় তা সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। চলচ্চিত্রের সাংগীতিক কাঠামোর সুষমা খুঁড়ে এ কী অব্যক্তের অন্বেষণ!

বহু দূরে একটি শিশুর কান্না কেন অপুকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে! অথবা, এক ক্রীড়ারত শিশু থামিয়ে দেয় ছেঁড়া পরদার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়া অপর্ণার অশ্রু?

অথবা 'দেবী' ছবির সেই ভয়ার্ত উক্তি যা জুড়ে দেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানবমাত্রা 'আমি যদি দেবী হই! আমি যদি দেবী হই?' কীভাবে একটি সমগ্র জীবনযাপনের অর্থহীনতাকে তুলে ধরা হয় চারু-ভূপতির সঙ্গে পরিচালক ব্রজকে যুক্ত করে বিশ্ব-চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা হাড়-হিম করা সাতটি 'ফ্রিজ শট'-এ! শেষ দৃশ্যের লং-শটের আধো-অন্ধকারে চারু আর ভূপতি কখন নির্বিশেষিত হয়ে চারুরা-ভূপতিরা হয়ে যায়! অথবা অপুর উত্তরসূরি সিদ্ধার্থ কীভাবে কলকাতার কদর্য পাখির বাজারে এক স্বপ্নে দেখা পাখির শিস খোঁজে?

ঘড়ি ভেঙে যায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র সিদ্ধার্থের, কারণ সে এই মারণ-সময়ের বাইরে দাঁড়িয়ে। আর সময়ের কাছে আত্মসমর্পিত শ্যামলেন্দুর ঘড়ি প্রত্যাখ্যান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে 'সীমাবদ্ধ'-র টুটুল? ক্লিন্নতাকে প্রত্যাখ্যান করে আবহমান সময়কে স্বীকার করে নেওয়ার এইসব অপরূপ চিহ্ন সত্যজিৎ রায়ের ছবিকে দীপিত করে।

এ কি ব্যক্তিমনের অবিসংবাদিত রহস্য, যার পিছনে থাকে একটি গোটা জীবন, কোনও খণ্ডাংশের খণ্ডসূত্র নয়, যেমন মনে করেছেন রবিন উড তাঁর 'অপু ট্রিলজি' গ্রন্থে?

উড়ছে পাতা, অপুর ছুড়ে ফেলা সেই আশ্চর্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির। যা উড়ে উড়ে দোলে।

পাহাড়ের কোলে বাইনোকুলার হাতে পাখি-খোঁজা আশ্চর্য মানুষটি বলে:

> এক এক সময় রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবি— এই যে tests হচ্ছে— nuclear tests— আকাশ সব বিন্দু বিন্দু বিষাক্ত radiation-এ ভরে যাচ্ছে— একবার হয়তো গিয়ে দেখব পাখিগুলো আর আসেনি। হয়তো মাথার গোলমাল হয়ে গিয়ে পথ ভুলে গেছে। কিংবা হয়তো সেই sense-টাই হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা... মাঝরাস্তায় মরে গিয়ে টুপটুপ করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো—

আমি সেই রক্তিম মৃত্যুবৃষ্টির ভিতর হাঁটতে হাঁটতে খুঁজি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র সেই গাছ। যার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নর-নারীর সংলাপকে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মানব-মানবীর গভীরতম সাক্ষাৎকার বলে মনে করেছেন পলিন কেল:

> অপর্ণা: আমার যখন বারো বছর বয়স। তখন আমার মা আগুনে পুড়ে মারা যান।
>
> মনে আছে— তখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি— একবার এখানে এসেছিলাম— বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছি— দেখলাম, দূরে পাহাড়ের গায়ে, বনে আগুন লেগেছে। সেই আগুন দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ কি কবিতার ছবি, না ছবির কবিতা!

একটি পাঁচ টাকার নোটের জলছাপের সাদা অংশে অপর্ণা তার ফোন নম্বর লেখে।

জলছাপ! টাকার নোটে! এই একটি প্রতীকেই মন্দ্রিত হয়ে যায় এক জীবনশিল্পীর বিশ্ববীক্ষা!

দীর্ঘকায় সেই ভাস্করের অবিস্মরণীয় চোখ, যা খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে নিতে চায় অন্য এক আলো। দেখতে পাচ্ছি রেলের ওয়ার্ড পেরিয়ে অপু আর পুলু হেঁটে আসছে। অপু বলছে সেইসব অবিস্মরণীয় কথা

> তার কল্পনাশক্তি আছে, অনুভূতি আছে। ছোটখাটো জিনিস তাকে move করছে, তাকে আনন্দ দিচ্ছে, হয়তো তার ভিতরে মহৎ একটা কিছু করার ক্ষমতা আছে। সম্ভাবনা আছে, কিন্তু করছে না। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, Tragedy-ও নয়।
> সে মহৎ কিছু করছে না, তার দারিদ্র যাচ্ছে না, তার অভাব মিটছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জীবনবিমুখ হচ্ছে না, সে পালাচ্ছে না, escape করছে না। সে বাঁচতে চাইছে, সে বলছে বাঁচার মধ্যেই সার্থকতা, তার মধ্যেই আনন্দ। He wants to live...

তুলি দিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রের ক্যানভাস। নইলে এমন সম্পূর্ণ করে পৃথিবী আর মানুষকে দেখা যায়? 'কাপুরুষ'-এর করুণা, সত্যজিৎ লেখেন তাঁর চিত্রনাট্যের মার্জিনে, 'জল খেয়েছে, তার ঠোঁটে কি জল লেগে থাকবে?' ঠোঁটে জল!

আমি দেখছি সেই বিরাট নির্জন ঘরের বাইরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে। সের্গেই আইজেন্‌স্টাইন, সত্যজিৎ রায়ের পুরনো 'আইডল'-রা: রনোয়ার, ফ্র্যাঙ্ক কাপ্‌রা, জন ফোর্ড, হাওয়ার্ড হক্‌স। আকিরা কুরোসাওয়া এসেছেন, এসেছেন মার্টিন স্করসিজ, এসেছে সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র-ছাত্ররা। অড্রি হেপবার্ন এসেছেন অস্কার হাতে। সৌমিত্র বলে এক তরুণ এসেছে, আর শর্মিলা বলে এক ফ্রক-পরা স্কুলের ছাত্রী। ভিড়ের ভিতর অপর্ণা দাশগুপ্ত নামে 'সমাপ্তি'-র সেই বুদ্ধিদীপ্ত দামাল কিশোরীও আছে। এসেছে সুবীর আর পিনাকী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সত্যজিৎ রায় কোথায়?

তিনি সেই চেয়ারটিতে এখনও বসে। এখন নিমগ্নভাবে শুনছেন বাখ, আর আঁকছেন বিশ্ব-চলচ্চিত্রের কোরিওগ্রাফির একটি সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা: 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির সাড়ে ছ' মিনিটের ভূতের নাচের পোশাকের সমাজতত্ত্ব ('The 6½ minute dance of the ghosts is surely the most striking thing ever done in cinematic choreography', মারি সিট্‌ন-কে লেখা চিঠি, ১২ ডিসেম্বর ১৯৬৮)। পাশে 'এক্ষণ' পত্রিকার অসমাপ্ত এক প্রচ্ছদ। একটু আগে সেটি আঁকতে আঁকতে কি শিস দিচ্ছিলেন তিনি? 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র সিদ্ধার্থ যে শিস শুনেছিল স্বপ্নে!

কার্ল স্যান্ডবার্গের একটি কবিতা মনে পড়ে আমার। সারা পৃথিবী একটি মানুষের কীর্তির কথা বলছে। অথচ আমি তাঁকে দেখলাম এক নিরাসক্ত, নিভৃত কোণে। তিনি বসে আছেন, চায়ের কাপের সামনে একা।

চিৎকারহীন, স্বপ্নপুরাণের সবুজ শীতলতা দিয়ে ঘেরা।

৯ মার্চ ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৮

আমি অন্ধকারের ভিতর একটা খড়ির দাগের ওপর দিয়ে হাঁটছি। চারপাশে অদ্ভুত কঠিন সব মুখ। আমি ঘুমের মধ্যে বলছি, এটা কি সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবির সেই ঘুম কেড়ে নেওয়া দ্বিতীয় স্বপ্নদৃশ্য? যা অবচেতনকে ইস্পাতকঠিন হাতে খুঁড়ে বের করে।

একজন লোক এগিয়ে এসে আমায় টেনে নিয়ে গেল এক পাশে। কয়েকজন মানুষ বসে। আমি চমকে উঠে দেখছি আকিরা কুরোসাওয়া, মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনি, এলিয়া কাজান আর সত্যজিৎ রায়। ওঁরা পরস্পরের সঙ্গে রসিকতা করছেন। আন্তোনিওনি গলাটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সত্যজিৎকে কিছু বলছেন। কাজান হাসছেন। এটা কি কোনও সাক্ষাৎকার? আমি মনে-মনে বিড়বিড় করি, এমন ঘটনাও ঘটে?

ফ্র্যাঙ্ক কাপরা আর বার্ট হান্সট্রা'র সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হল সত্যজিৎ রায় একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করছেন! ১৯৭৭ সালের দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবের জুরি?

সাহিত্যে পাঁচ, সাত শতাব্দী ধরে যে-বিবর্তন ঘটেছে, যেমন ইংরেজি সাহিত্যে চসার থেকে জেমস্ জয়েস পর্যন্ত, সপ্তম শিল্পে তা ঘটে গিয়েছে মাত্র কয়েক দশকে! সেই আবিষ্কারমালার কয়েকজন জাদুকর যেভাবে মিলতে পারলেন এক কথোপকথনে, তেমন কি কোনও দিন হতে পারত চিরকালীন বিশ্বসাহিত্যে? ধরা যাক, শেক্সপিয়র, সেরভানতেস, বঙ্কিম, দস্তয়েভস্কি, জয়েস আর কালভিনো কথা বলছেন পরস্পরের সঙ্গে? আমি ঘুমের মধ্যেই হেসে উঠি।

অন্ধকারের জঠর চিরে সেই সাদা দাগ আমায় কোথায় নিয়ে চলেছে এই শীতরাতে? সোনাডাঙার মাঠে পেরিয়ে, রেলের লাইনের দিকে।

আমি দেখতে পাচ্ছি, দুর্গা অপুর দিকে আখ ছুড়ে দেয়। অচেনা নতুনত্বের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সামনে সে কি শঙ্কিত ও আড়ষ্ট? তাই সে সংযোগ চাইছে! অপু দাঁত বের করে হাসে। ওগুলো কী রে, সে জিগ্যেস করে। দুর্গা উত্তর দিতে পারে না। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে সচকিত হয়ে চারদিকে তাকায়। শিশু দুটি ইমেজের সামনের দিকে, সাদা স্পর্শগ্রাহ্য ঘাসের ওপর ধোঁয়ার কুণ্ডলি। কাট্।

ফ্রেমের ওপরের দিকে দিগন্তে ফুটে ওঠে ট্রেন। অপু-দুর্গা ঘাসের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অপু সেদিকে দৌড়ে যাচ্ছে এই দৃশ্য থেকে 'কাট্' করে সত্যজিৎ রায় রেললাইনের উলটো দিকে চলে যান। অতঃপর ট্রেনটি সমগ্র দৃশ্যপটটিকে ঢেকে ফ্যালে। এবং লং-শটে মুহূর্তের জন্য অপুকে চাকার ফাঁকে দেখা যায়।

দূরত্ব! অপুর অভিজ্ঞতাকে এইভাবে তাঁর অবিশ্বাস্য 'নেগেটিভ ক্যাপেবিলিটি' দিয়ে আমাদের থেকে দূরত্বে তুলে ধরছেন এক মহাশিল্পী! রবিন উড তাঁর 'অপু ট্রিলজি' গ্রন্থে লিখেছেন:

> (ক্লোজ-আপ না দেখিয়ে) সত্যজিৎ সরাসরি আমাদের লাইনের উল্টো দিকে নিয়ে গেলেন, যাতে অপুর অভিজ্ঞতাকে কেবল ভাগ নয় আমরা সেটিকে অনুধাবন করতে পারি। আমরা বুঝি যে এটি একাধারে 'প্রগতি', যন্ত্র ও নগরের প্রতীক। ট্রেনটি সমস্ত দৃশ্যপটটিকে মুছে ফেলে এবং তার শান্তির আবহকে চুরমার করে দেয়। অপু মুহূর্তের মধ্যে একটি অর্থহীন, ক্ষুদ্র মূর্তিতে পরিণত হয়েছে।
>
> ল্যান্ডস্কেপ শটটি এতই যত্নে রচিত যে তা দৃশ্যের মুখ্য উপাদানগুলিকে সহজে মিলিয়ে দেয়: পর্দার নীচের অংশ ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে, বাঁদিকে টেলিগ্রাফের থাম ও ডানদিকে রেলের সিগন্যাল।

একটু পরে শিশু দুটির ফিরে আসার সময় সেই ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ-মুহূর্ত অনন্ত অসীমে স্থাপন করবে ইন্দিরের মাথা মাটিতে ছিটকে পড়ার আওয়াজ আর জলের ঘটি গড়িয়ে পড়ার শব্দ। আমি সভয়ে দেখি, ঘটি গড়িয়ে পড়ছে, রাতের বুক চিরে কেবলই গড়িয়ে পড়ছে!

দেখতে পাচ্ছি, সত্যজিৎ রায় বসে আছেন সেই বিখ্যাত চেয়ারে। আর তাঁর স্কেচবুকে কিছু একটু আঁকছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর চারপাশে চলছে 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ছবির ভূতের নাচ। প্রথমে আমলকী গ্রামের গাছের নীচে বসে থাকা মোড়লেরা। সেই দালাল সকল, যাঁরা আজও সংস্কৃতি জগতের বাবামশাই হয়ে বসে আছেন! তারপর দেখছি জলের কোমল ফোঁটা ঝরে পড়ছে ঢাকের ওপর, আর... আস্তে-আস্তে বাস্তবকে ঠেলে সরিয়ে চলচ্চিত্রের পর্দায় উঠে আসছে পরাবাস্তব।

তারপর সেই অবিশ্বাস্য সাড়ে ছ'মিনিট। আমি প্রযুক্তির সেই প্রায় আদিম যুগে এটা কী করে সম্ভব হল ভাবতে-ভাবতে ঘোরের মধ্যে দেখছি সেই উদ্দাম অশরীরী নৃত্য। আমার ডানদিকে, আমার বাঁয়ে, ওপরে ও নীচে।

পাতালজল উঠে আসছে উরু বেয়ে। ঔপনিবেশিক প্রভুর উদ্ধত গতিপথ, ধর্মব্যবসায়ীদের কদর্য আত্মরতি, কৃশকায় সাধারণ মানুষের ক্রোধ, সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব। অন্তর্ঘাতময় এক সমাজের ছিন্ন মুখোশমালা। স্নায়ুর গভীর ছিঁড়ে প্রভুনাচ নীচে, ক্রমশ নীচে আরও নীচে নেমে আসে।

আমি দৌড়ে পালাতে গিয়ে 'অশনি সংকেত'-এর প্রজাপতিগুলির মৃত্যুমর্মরিত নৈঃশব্দ্যের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াই। প্রজাপতি, মৃত্যু, অশনি ও আমি একা।

একটি মৃতদেহকে কারা বয়ে নিয়ে আসছে ঘরের বাইরে। সব দৃশ্য নেগেটিভ।

চারপাশে এত কঙ্কাল! আমি নিজেকে বলি, এ তো 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির সেই অজস্র কঙ্কাল। এত কঙ্কাল কি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে কখনও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে? পৃথিবীর কোনও দেশে?

বালি, মৃত সিগারেট, শূন্যতা।

কারা নাচছে, বলছে, 'দিস ইজ ইন্ডিয়া।'

মূল্যবিশৃঙ্খলার ভিতর আমি একটি ছেলেবেলায় শোনা পাখির ডাক খুঁজছি।

কালো সরীসৃপের পিঠের মতো অন্ধকার চিরে, সাদা দাগ আর ভাঙা আয়নার শূন্যতা পেরিয়ে।

গিলোটিনের ব্লেডের নীচে আটকে আছে আমার গলা। আ— বেড়ালডাক।

নিষ্প্রদীপ শহরের অন্ধকারে অকস্মাৎ দেখা পাওয়া মেয়েটির চোখে কী নরম মোমের আলো! ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে কখন সে সেবিকা-পোশাকে রূপকথা-মানবী হয়ে যায়?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারের ভিতর কয়েকটি পুরুষ নাচছে। 'হামলোগ সব V.I.P হ্যায়!— Very Impotent people.' এখন শহর থেকে দূরে অরণ্যসমীপে এসে পায়ের কাছে খুলে পড়েছে মুখোশ।

কয়েকজন পানরত মানুষ।

হঠাৎ একটি ট্রেন অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে চলে যায়। কোথা থেকে এসে কোন গুহাকন্দরে সেঁধিয়ে গিয়েছে সে?

আমি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে হাঁটি।

'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র চারটি পুরুষ ও তিনটি নারী। মুখোশের নীচে একটি লেন্সের চোখ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে তাদের খুঁজছে শিকড় থেকে তাদের উপড়ে এনে, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির মতো করে। সবার মুখোশ স্নায়ুশরীরে এঁটে আছে।

> জয়া। বলুন কেমন দেখাচ্ছে।... হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন কী— বলুন!
>
> সঞ্জয়। ভ্-ভাল!
>
> জয়া। হ্যাঁ— ভাল! আপনি কি ভূত দেখছেন?... আপনার নার্ভাস লাগছে?
>
> সঞ্জয়। ন্-না—
>
> জয়া। আমার লাগছে।
>
> জয়া সঞ্জয়ের বাঁ হাত নিজের বুকের ওপর রাখে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কাপের কফির ওপর জমে থাকে সর। সরের মুখোশ। মানবপ্রবৃত্তি ও মেকি বহির্মুখ।

এক মুখোশ-পরা এগ্‌জেকিউটিভ, এক মুখোশ-পরা ছদ্মমার্কসবাদী, এক জুয়াবাজ। একমাত্র যে-লোকটি মুখোশ খুলে নিয়েছিল নাগরিক বান্ধবীর, যে মেকি আভরণকে (নকল চুল) ঘৃণা করে প্রকৃতির খুব কাছে থাকতে চায়, যে সাঁওতালি মেয়ে দুলির প্রতি চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়, সে তাকে ঠিক কী বলে ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে?

> হরি। তোরা চুলে কী লাগাস রে?
>
> হরি ঝুঁকে পড়ে দুলির চুলের [illegible] শাঁকে[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হরি। উঁ!— তোর জন্যে আমি কী আনব জানিস— কলকাতা থেকে? বল তো—

দুলি। কী করে জানব?

হরি। আরেকটা চুল। তোর এই চুল— তার ওপর আরেকটা চুল।

কী ভয়ঙ্কর এক জালের সামনে এক অবিস্মরণীয় লেন্স।

যে মেকি-চুল খুলে দিয়েছিল এক মেকি-মেয়ের, সে-ই চাইছে এক প্রকৃতিকন্যার মেকি আবরণ! ৮৮০টি শটের এক মানব-খননকে বিশ্বচলচ্চিত্রের এক মাইলফলক কেন বলা হয় মাঝরাতের আবছায়ায় চাঁদের নীচে দাঁড়িয়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না আমার।

ছবির শেষে অপর্ণা বলে: আচ্ছা চৌকিদারের বউয়ের কী হয়েছে?

অসীম। ঠিক— জানি না—

অপর্ণা। এত অসুখ জানতেন?

চুঁইয়ে পড়ে ক্লেদ। এত সূক্ষ্ম তুলিটান শিল্পিত ছুরির।

প্যারিসে সিনেমাতেক্-এর কাছে একটি কাফে-তে বসে 'নিউ ওয়েভ' চলচ্চিত্র-আন্দোলনের মুখপত্র 'কাইয়ে দ্যু সিনেমা'-র সত্যজিৎ রায়-কে উৎসর্গীকৃত বইয়ের লেখক শার্ল ত্রেসঁ আমাকে বলছেন, 'C'est un lion, ওটা একটা সিংহ! সত্যজিৎ রায়। শুধু ওঁর চোখ নিয়ে একটা বই লেখা যায়!'

নাচছে জলপাতা! চুঁইয়ে পড়ছে গাছের পাতার জল একটি ঢাকের ওপর।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র অবজারভেটরি হিল। ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে আসতে-আসতে বার্ড-ওয়াচার জগদীশ চট্টোপাধ্যায় শোনেন বোন লাবণ্য বেঞ্চিতে বসে আপন-মনে গান গাইছেন। চারিদিকে কুয়াশা।

এ পরবাসে রবে কে!

কে রবে এ সংসারে সন্ন্যাসে শোকে

এ পরবা[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাবণ্য। শোনো, দাদা—

জগদীশ। বল্—

লাবণ্য। মণিকে একটা কথা বলতে পারলে ভাল হত।

জগদীশ। এখনই?

লাবণ্য। এক্ষুনি।

জগদীশ। তুই উঠছিস কেন?

লাবণ্য। দেরি হয়ে যাবে, দাদা।

জগদীশ। আমি বললে হবে না?

লাবণ্য। হবে। কিন্তু আমার নাম করে বলবে।

জগদীশ। বেশ।

লাবণ্য। বলবে— সে নিজে যা ভাল বোঝে তাই যেন করে। কোনও জোর-জবরদস্তি নেই।

রেলিংয়ের ওপর বসে পাহাড়ি ছেলের গান। বিশ্বচলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃশ্য? কুয়াশা আর নেই, মেঘ সরে গিয়েছে।

একটি অচিন পাখির স্বপ্ন-শিস মিলে যায় মৃত্যুগভীরতার সঙ্গে। আমি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র সিদ্ধার্থের পাশে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে সেই মৃত্যু-অতিক্রান্ত জীবনসত্যকে অনুভব করতে চাই।

আর মধ্যরাতে অন্ধকারকে চুরমার করে দিয়ে একটি ঝাড়লণ্ঠন দোলে, জীবন ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে কেবলি দোলে।

৩০ মার্চ ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৯

এক অবসন্ন সন্ধেয় যখন মাছির ভনভনানিতে ভরে ওঠে পৃথিবী, শরীর-বৈঠা আর চলে না, জমে বরফ হয়ে থাকে কুয়াশার নদী, তখন ফিরে আসে সার্ত্র-এর সেই অমোঘ পঙ্‌ক্তি:

এই নরম কাদা, ঢেউখেলানো, ভবিষ্যৎহীন...

আমি দেখতে পাই একটি আট-ন'বছরের ছেলে সেখানে আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। আর তার চোখের পাতা থেকে গড়িয়ে নামছে আঠালো রক্ত।

তারপর মধ্যরাতে যখন ধ্রুবতারা থেকে জল পড়ে, না কি বালি ঝরার শব্দ? সে বালুতট থেকে একটি নুড়ি কুড়িয়ে নেয়। নুড়ি না শামুকের খোলা? তার শরীর থেকে মৃদু আলো এসে পড়ে চৌকাঠে।

চৌকাঠের ওপাশে এত অনন্ত চিৎকার।

সেই চৌকাঠ কি পেরনো যায় কখনও?

আমি দেখি ছেলেটি তখনও চৌকাঠ পেরিয়ে এক বিপজ্জনক খেলা খেলছে। সে শুনতে চাইছে এক টুকরো রুটি, একটি ঝিনুক, একটি কমলালেবু অথবা একটি শামুকের আর্ত-চিৎকার। অথবা জলের ঝকঝকে নিরাকার ত্বক ডেকে নিচ্ছে তাকে। অথবা একটি মোমবাতি, যা হয়ে উঠছে স্ফটিকের থামের ওপর একটি সোনার পাতা।

ঠাকুর্দার লাইব্রেরিতে লিত্‌রের অভিধানে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শব্দগুলো যেন একেকটি গর্ভগৃহ।

নদীর ওপর সেই বিখ্যাত ভাঙা সেতু ('Sur le pont d'Avignon,' 'আভিন্যঁ সেতুর ওপর' গানটার এক কলি গেয়ে উঠল কে?) দেখে বুঝতে পারছি ওটা রোন নদী, আর শহরটা দক্ষিণ ফ্রান্সের আভিনঁ। পাঁচিল-ঘেরা ওই অনিন্দ্যসুন্দর শহরে কে খুঁজে বেড়ায় জন্মবীজ?

দশ বছর বয়সে নমাঁদি চলে আসে সে বাবা-মা'র সঙ্গে। তারপর কাঁ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহরে পড়াশোনা করে স্নাতকোত্তর পড়তে আসে প্যারিসে। অত্যন্ত মেধাবী, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার পাশ করতে পারেননি। অধ্যাপনার পরীক্ষায় ভাল করেও মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকেননি।

যুবকটি খুব রাগী। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেখলে তাঁর বমি পায়। স্যুররেয়ালিস্তদের কাছে কিছু দিন নাড়া বাঁধে সে। প্রথাবদ্ধ কথনভঙ্গি থেকে মুক্তির দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন তাঁরা। শব্দের পচন রোধ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু উঁচু গলার বিধান সহ্য করা তাঁর ধাতে নেই, যেমন আরেক সমসাময়িক কবি জাক প্রেভের-এরও ছিল না। স্যুররেয়ালিস্‌ম-এর স্বয়ংক্রিয় লিখনপদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি।

কিছুদিন সোশালিস্ট পার্টির সদস্য থাকার পর ১৯৩৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ দু'বছর ধরে পার্টির মুখপত্র 'লাকসিয়ঁ' সম্পাদনা করতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু দশ বছর পর পার্টি ছেড়ে দেন। তাঁর ভাষায় 'গোয়াল পরিষ্কার না করে এরা কেবল বিষ্ঠা দিয়ে দেয়াল রং করে!'

ততদিনে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ল্য পারতি প্রি দে শোজ' ('বস্তুর সপক্ষে', ১৯৪২) প্রকাশিত হয়ে চমকে দিয়েছে সকলকে। স্বয়ং সার্ত্র তাঁকে সত্যিকারের অস্তিত্ববাদী বলে ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় কাম্যু তাঁর কবিতাকে চিহ্নিত করেছেন অ্যাবসার্ডিটি-র উদাহরণ হিসেবে। ফরাসি 'নুভো রমাঁ' বা নতুন উপন্যাসেরও অন্যতম অনুপ্রেরণা তিনি। জ্যুলিয়্যাঁ গ্রাক্-এর মতে, একমাত্র তাঁরই কবিতা বেঁচে থাকবে।

ফ্রাঁসিস পঁজ (১৮৯৯-১৯৮৮)।

নাই-বা জানল তাঁর নাম ইংরেজি-পড়া এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর কিছু না-পড়া বিশ্বচালিয়াত। কিন্তু জাক দেরিদা একমাত্র এই কবিকে নিয়েই লিখেছেন পুরো বই একটি: *Signéponge* (১৯৮৪)! পঁজ-এর নাম আর স্পঞ্জ (éponge) আর শব্দের চিহ্ন নিয়ে খেলা করেছেন তিনি।

জন্ম ১৮৯৯ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের মঁপেলিয়ে-তে। সেই বছরই জন্মেছিলেন বোরহেস। আঁরি মিশো এবং জীবনানন্দ দাশ। আমি কালপুরুষের দিকে তাকিয়ে বলে উঠি, কী করে হা ঈশ্বর, কী করে এমন হয় যে সাহিত্যের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখার দৃষ্টি বদলে দেওয়া এই চারজন পৃথিবীতে এসেছিলেন পৃথিবীর একই সূর্য পরিক্রমার সময়?

মাঝরাতে সেই নরম প্রাণীটির খোলস। 'যার কোনও কঙ্কাল নেই। আছে শুধু দেয়াল, একটি টিউবের ভিতরের রঙের মতো!'

একটি শামুক। 'যে শক্ত জমি চায় কারণ তার ভিতরটা ভিজে আর ঐশ্বর্যময়!'

একটি প্রজাপতি। যা 'এক ক্ষুদ্র উড়ন্ত নৌকার মতো, যা হাওয়ার ধাক্কায় হয়ে যায় আলগা একটি পাপড়ি, যেটি বাগানে ভেসে ভেসে বেড়ায়।'

বস্তুনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন এই কবি নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এমন এক ঘনবদ্ধ গদ্যে যা ঠিক কবিতার ভাষা নয়, বরঞ্চ বলা যেতে বিশ্লেষণের ভাষা। পঁজ-এর ভাষায়, তিনি চেয়েছিলেন 'বস্তুকে কথার মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তুলতে।' এক ছিন্নভিন্ন সময়ে তাঁর কবিতা যেন তাদের জন্য লেখা যারা 'বস্তুর গূঢ় সত্যকে চেনে না, তাকে প্রকাশ করার মতো সাহস বা অভিব্যক্তি যাদের অজানা।' রুটি, কমলালেবু, সিগারেট, সাবান, ঝিনুক, চিংড়ি মাছ অথবা 'বসন্তের প্রারম্ভে গাছেদের সবুজ বমি'— সবই তাঁর অণুবীক্ষণের নীচে থিরথির করে কাঁপে। এক নিরাসক্ত সহমর্মিতায় সেগুলোকে ছুরি দিয়ে কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে এক স্বশাসিত বিশ্বকে তিনি উন্মোচিত করেন।

'কঠিনভাবে আবদ্ধ' একটি ঝিনুকের ভিতর তিনি খুঁজে পান 'মুক্তোর আকাশের নীচে... খাদ্য-পানীয়ের এক গোটা জগৎ।' যেখানে 'ওপরের আকাশ নীচে আকাশে ডুবে গিয়ে তৈরি করে তুচ্ছ এক ডোরা, কালচে লেস-লাগানো এক আঠালো সবুজ থলি যা ফুলে, উপচে তোমার চোখ ও নাসারন্ধ্রে ঢুকে ঢুকে যায়।'

তাঁর গদ্য-কবিতার নাম দিয়েছিলেন 'গবিতা' (proèmes)। দীর্ঘকাল চেষ্টা করেছেন না-লিখতে, পারেননি, কারণ 'যখন নিবিষ্ট ভাবনা বা ধ্যানের মধ্যে এক ঝাঁক শব্দের হাউই আমার শরীর থেকে হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়, আমার অবসাদ দূর হয়। আরও কয়েক দিন বেঁচে থাকার ইচ্ছে হয়।'

মধ্যরাতে পঁজ কবিতা পড়ছেন একটি শামুকের সামনে বসে, অথবা একটুকরো রুটির। সামনে একটা আধপোড়া সিগারেট।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রুটি

রুটির ওপরটা দারুণ, কেননা তার থেকে একটা আধা-প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুভব লাভ করা যায়; যেন বা হাতের কাছেই ইচ্ছেমতন রয়েছে আল্পস, তোরাস বা এন্ডিজ পর্বতমালা।

এভাবে উদ্‌গার তুলতে থাকা একটা আকারহীন তালকে আমাদের জন্য নাক্ষত্র চুল্লির মধ্যে পুরে দেওয়া হল, সেখানে শক্ত হয়ে উঠতে উঠতে ওটা উপত্যকা, পর্বতশিখর, তরঙ্গ, খাদের আকার নিল...

ওই আলগা আর ঠান্ডা মাটির তাল যাকে বলা হয় রুটির বুক তার তন্তু স্পঞ্জের তন্তুর মতন: পাতা বা ফুল সেখানে শ্যামদেশীয় যমজ বোনের মতো কনুয়ে কনুয়ে সেঁটে আছে।...

(অনু: পুষ্কর দাশগুপ্ত)

সিগারেট

...রুপালি চামড়া খসে পড়া এই জ্বলন্ত বোতাম। অতি সম্প্রতি গড়ে ওঠা একটা অব্যবহিত আংটা তাকে ঘিরে রাখে।

(অনু: পুষ্কর দাশগুপ্ত)

কুয়াশা-পল্লির গাছগুলি

কুয়াশা-অধ্যুষিত গাছগুলির পাতা খুলে ফেলা হচ্ছে। অক্সিজেনের শ্লথ প্রবাহে ইতিমধ্যেই তারা নিরুৎসাহ। ফুল ও ফলগুলির জন্য সমস্ত রস খরচ হয়ে পড়ায় পাতারা বিষণ্ণ। অগাস্টের বিশ্রী গরমের সময় থেকে তারা আলগা হয়ে এসেছে।

গুঁড়ির খাঁজ বেয়ে মাটিতে নেমে আসছে জল। যা আর গুঁড়ির সজীবতা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

ফুলগুলি ছড়ানো, ফলগুলি মাটিতে গড়াচ্ছে। প্রথম যৌবন থেকেই গাছগুলি যাবতীয় সজীবতা ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিহার করতে শিখে গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাংসের টুকরো

মাংসের প্রতিটি টুকরো যেন এক একটা কারখানা, জাঁতাকল আর রক্তের পেষণযন্ত্র।

বড় বড় উনুন, নল, মদের ভাঁটির সঙ্গে গলাগলি করা বৈদ্যুতিক মুগুর আর চর্বির গদি।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসে ফুটন্ত বাষ্প, নিষ্প্রভ কিংবা উজ্জ্বল আগুনের রক্তিমা।

খোলা নর্দমার মধ্যে বয়ে যায় ধাতুমল ও পিত্তি। আর সব কিছুই আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে আসে রাত্রে, মৃত্যুর সমীপে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটতে থাকে নানান সব রাসায়নিক ক্রিয়া আর বেরিয়ে আসতে থাকে এক উৎকট দুর্গন্ধ।

জল

আমার চেয়ে নীচে, সর্বদাই আমার চেয়ে নীচে এই জল। সবসময়ই চোখ নিচু করে আমি তাকে দেখি।...

সাদা ও উজ্জ্বল। অবয়বহীন ও শীতল, নির্বিকার ও নিজের একমাত্র অভিকর্ষের পাপে নিবদ্ধ। যাকে চরিতার্থ করার জন্য অসামান্য সব উপায় রয়েছে: ঘুরে আসা, ভেদ করা, ক্ষয় করা, চুঁইয়ে পড়া।

তার বুকের মধ্যেও সেই পাপ। বারবার সে ভেঙে পড়ে, প্রতি মুহূর্তের সমস্ত আকার সে ভেঙে ফেলতে চায়, সর্বদা মাথা নত, মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে, যেন শবদেহ, বিশেষ বর্গের সাধুদের মতো।...

মোমবাতি

রাত্রে মাঝে মাঝে প্রজ্বলিত হয় একটি গাছ যার আলো আসবাবপত্র সমেত ঘরগুলোকে বড় বড় ছায়ায় ভেঙে ফেলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্ফটিকের থামের ওপর মিশকালো ডাঁটায় উদাসীন একটি সোনার পাতা।...

কমলালেবু

...কোনও শব্দই ওই ডিম্বাকৃতি, কোমল, ভঙ্গুর, গোলাপি বেলুনের ঢাকনাটির প্রশংসার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পুরু, ভেজা ব্লটিং কাগজটির চামড়া অতিশয় পাতলা কিন্তু অতিমাত্রায় রঞ্জক ও ঝাঁঝালো।

সূর্যরশ্মিকে টেনে ধরে ফলটির নিখুঁত আকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে একটু খসখসে।

এই নাতিদীর্ঘ ও যথাসম্ভব গভীর গবেষণার শেষে বীজটিকে পরীক্ষা করা দরকার। খুদে পাতিলেবুর মতো দেখতে ওই বীজ লেবুগাছের সাদা কাঠের রঙের, যার মধ্যেখানে থাকে একটি মটরের মতো নরম উপমঞ্জরি। ফল-বেলুনটির স্বাদ, রং ও সুগন্ধের টানে লণ্ঠনের রোমহর্ষক বিস্ফোরণের পর, আমরা অনুভব করি কাঠ, শাখা ও পাতার তুলনামূলক কাঠিন্য ও অম্লতা (যা পুরোপুরি বিস্বাদ নয়): একটি অতি ক্ষুদ্র যোগফল, কিন্তু প্রশ্নাতীতভাবে ফলটির অস্তিত্বের মর্মমূল।

যৌবনবতী

কুশনঢাকা গাড়ির মতো তোমার মসৃণ হাঁটু আর সরু কোমর, কোচোয়ানের মতো পেছনে হেলে থাকা তোমার স্তন।

তুমি নিজেকে বয়ে বেড়াও, চালিত কর। তোমার মনকে তোমার শরীর থেকে একেবারেই আলাদা করা যায় না।

হঠাৎ হঠাৎ কেন তুমি থমকে যাও?

—বালিঘড়ির দুটি দিক পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করে।

তোমার বুকের ফলের সুডৌল দৃঢ়তা আমরা উপভোগ করি, আর আরও নীচে ফলের সুস্বাদ ও রস।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ কি ক্ল্যাসিক টেক্সট, না বারোক? বস্তু, object, না objeu, বস্তুখেলা? এ কি কবিতা না শিলালিপি? কবিতার বহুপ্রত্যাশিত মুক্তি কি ঘটে গিয়েছিল পঁজ-এর হাতে? কবিতা যে শব্দের মানবাতীত সত্যকে খুঁজেছে তার শেষ পরিণতি কি পঁজ? পঁজ কি খুঁজে পেয়েছেন বস্তুজগতের শেষ জীবাশ্ম?

একটি মাকড়সার মতো, যে জালের ভিতর থেকে জালের দিকে তাকিয়ে। বৃষ্টি পড়ছে আর জলের ফোঁটা চিকচিক করছে জালের ভাঁজে।

মাকড়সার 'থুতুমাখা' শূন্যে কান পেতে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, ফ্রাঁসিস পঁজ।

২০ এপ্রিল ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩০

তোমরা ওকে মারছ কেন? তোমরা ওকে মারছ কেন? ঘুমের মধ্যে আমি চিৎকার করছি। তা ধিন ধিন না। ধ্বংসলীলা চলছে।

জুতো দিয়ে, লোহার রড দিয়ে ভাঙছে রবীন্দ্রনাথের কাচে ঢাকা ছবি, রবীন্দ্রনাথের বাড়ির আসবাব। আমি বলছি, না—

আমি বলছি, আকাশ, নক্ষত্রহংসী। আমি বলছি, নীলাঞ্জনছায়া।

নর্দমার কালো জল ঘূর্ণির মতো নাচছে। তা ধিন ধিন না, নাকে ধিন ধিন না। মৃত্যুগুহার তলপেট থেকে উঠে আসছে বিষ।

যখন শেষরাতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তখন দেখলাম, না, যে-দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, তা নয়। কাচ ভাঙা হচ্ছে, আসবাবপত্র, দেওয়াল। সেই প্রাসাদের স্থাপত্য, স্টেইন্‌ড গ্লাস দেখে বুঝতে পারছি ওটা ফরাসি দেশ। লুঠতরাজের দিকে তাকিয়ে কে বলে উঠল, 'Incroyable! C'est le palais de la Rochefoucauld à Verteuil!' অবিশ্বাস্য! ওটা তো ভের্তই-তে লা রোশফুকো-র প্রাসাদ! আজ ১৬৫০ সালের ৮ আগস্ট। রাজার লোকজন তাঁর প্রাসাদ ভাঙছে। তাঁকে বাধ্য করা হচ্ছে সরকার থেকে পদত্যাগ করতে, এবং পোয়াতু অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদ ছেড়ে দিতে।

খবর পেয়ে তিনি উত্তেজিত হননি। শুধু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন ছদ্ম-বন্ধুরা দু'পায়ের ফাঁকে লাঙুল গুটিয়ে উধাও। একজন অনেক পরে দূতের মাধ্যমে জিগ্যেস করে পাঠালেন, 'আপনার কী ব্যাপার?' এরই মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে সর্বক্ষণ ঠায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন গুরভিল নামে এক ছোটবেলার বন্ধু। মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যমানকে অতিক্রম করে, আত্মপ্রেমকে উপেক্ষা করে, মানুষের প্রকৃত রূপকে নির্মোহ দূরত্ব থেকে বুঝতে শিখলেন তিনি।

কে ওই লোকটি? কেন তাঁর লাঞ্ছনা? ক্ষমতাবানদের বিপক্ষে সর্বদাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুর্বলদের দলে থাকার জন্য? 'সত্যানুরাগ'-এর ('L'Amour de la vérité') জন্য যা দেড় দশক পরে প্রকাশিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'মাক্সিম' (১৬৬৫)-এর প্রচ্ছদে বীজমন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল!

মারসিয়াকের রাজকুমার ষষ্ঠ ফ্রাঁসোয়া (১৬১৩-১৬৮০), যিনি প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে 'লা রোশফুকোর ডিউক' উপাধি পান। পৃথিবী তাঁকে চেনে লা রোশফুকো নামে। ব্যক্তিগত জীবনে রাজপুরুষ বা সেনাপতি, কিন্তু সর্বাগ্রে পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'মরালিস্ট,' জীবনদ্রষ্টা। মহত্তম দার্শনিকই হোন অথবা কবি বা কথাশিল্পী, লা রোশফুকো-র শাণিত তলোয়ারের পাশে ম্লান, তাঁর চোখের দিকে তাকালে চোখ সরিয়ে নিতে হয়।

১৬১৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর লা রোশফুকো-র জন্ম। তিন বছর পর ইংল্যান্ডে মারা যাবেন শেক্সপিয়র। জন মিলটনের বয়স তখন পাঁচ। ন বছর পর ফ্রান্সে জন্ম নেবেন মলিয়ের।

যে-দশকে কলম তুলে নেবেন লা রোশফুকো, সেই ১৬৬০-এ ইংল্যান্ডে 'রিস্টোরেশন' বা রাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল। ফ্রান্সে সূর্য-রাজ লুই-এর বিবাহ। সেন নদীর ধারে তৈরি হচ্ছিল প্যারিসের প্রথম কাফেগুলি। রচিত ও মঞ্চায়িত হচ্ছে মলিয়ের, রাসিন ও কর্নেই-এর একটির পর একটি নাটক। স্পেনে শিল্পী বেলাসকেস-এর মৃত্যু হল, নেদারল্যান্ডসে ছবি আঁকছেন রেমব্রান্ট। স্পিনোজ়া নামে পোর্তুগিজ উৎসের এক ইহুদি লিখছেন চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর 'ট্র্যাক্‌টেটাস থিওলজিকো পলিটিকাস'। প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে 'দ্য রেডি অ্যান্ড ইজি ওয়ে টু এস্‌ট্যাবলিশ আ ফ্রি কমনওয়েল্‌থ' নামে এক পুস্তিকা লিখে জেলে গেলেন মিলটন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি শেষ করবেন মুক্তভাবনার মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট'।

ওই সময়ই রচিত হচ্ছে লা রোশফুকো-র 'রেফ্লেক্সিয়ঁ উ সাঁতাস এ মাক্সিম মরাল'-এর প্রথম পাণ্ডুলিপি (১৬৬০)। এবং তাঁর স্মৃতিকথার বেআইনি বেলজিয়ান সংস্করণ (১৬৬২)। ১৬৬২ সালে ৩৯ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন বিজ্ঞানী ও ঈশ্বরের সমীপে নিবেদিত দার্শনিক ব্লেজ় পাসকাল, যাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'পাঁসে' (ভাবনাচিন্তা) প্রকাশিত হবে মৃত্যুর আট বছর পর ১৬৭০ সালে।

পাসকাল লিখেছিলেন, 'মানুষের ভবিতব্য কী? সে কি ঈশ্বরের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমান হতে চায়, না পশুর? কী ভয়ঙ্কর ওই দূরত্ব!' মানুষের একাকিত্ব, ভঙ্গুরতা ও স্ববিরোধের এই ছবি আসলে 'ঈশ্বরহীন মানুষের দুর্দশা' বলে উপস্থাপন করেন তিনি। এক বিশিষ্ট ফরাসি সমালোচকের ভাষায়, 'পাসকাল আমাদের বিষণ্ণ করেন, বিদ্রোহী করে তোলেন, কিন্তু নিরাশ করেন না... কারণ ওষুধ তো তাঁর হাতের কাছেই আছে, তিনি তা দেবেন। লা রোশফুকোর ক্রোধ তাঁর চেয়ে কিছুটা কম। কিন্তু বিদ্বেষ আরও বেশি। তিনি অভিযোগ করেন, ধিক্কার দেন, নাছোড়বান্দার মতো নিষ্ঠুরভাবে আমাদের সর্বজনীন দুর্দশাকে নগ্ন করে তোলেন।'

হয়তো 'বিদ্বেষ' নয়, সিনিসিজ্‌ম। যা তাকে শুধু নির্মমভাবে নিরপেক্ষ হতে সাহায্য করল না, আমাদের অবিশ্বাসী ও সন্দিগ্ধ একুশ শতকের সমকালীন করে তুলল। ১৬৬৫ সালে 'মাক্সিম'-এর প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে লা রোশফুকো লিখেছিলেন, 'এ হল মনুষ্যহৃদয়ের এক আলেখ্য। এগুলো সবাইকে খুশি করবে না জানি, কারণ এগুলো বড় বেশি বাস্তব। এগুলো তেমন তোষামুদে নয়।' লা ফঁতেন-এর মতে, এই বইটি 'মনুষ্যচরিত্রের এক অস্বস্তিকর আয়না, যার থেকে দূরে থাকা কঠিন।' লা রোশফুকো-কে উৎসর্গ করা একটি কবিতায় ('খরগোশ', ফাব্‌ল ১০, ১৬৭৯) তিনি স্বীকার করেন নেন লা রোশফুকো-ই তাঁকে নীতিকবিতাগুলির রসদ সরবরাহ করেছেন। ভলতের-এর মতে, '(লা রোশফুকো) অভ্যেস করালেন চিন্তা করতে। এবং ভাবনাচিন্তাগুলোকে এক সজীব, সুষম ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে ধরে রাখতে।' শুধু তাঁরা নন, লা রোশফুকো-র অনুরাগীদের মধ্যে পড়েন রুসো, গ্যোয়েটে এবং শোপেনহাওয়ার, নীৎশে ও টি এস এলিয়ট। নীৎশের ভাষায়, 'তিনি হলেন মনোবিশ্লেষণের সেই গুরু, যিনি অন্ধকারেও লক্ষ্যভেদ করতে পারেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এ তাঁর উল্লেখ আছে।

১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে সেনাদলে যোগ দিয়ে রাজা ত্রয়োদশ লুই-এর সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইতালি ও নেদারল্যান্ডস যান। ১৬৩৭ সালে কার্দিনাল রিশলিও তাঁকে কারাবন্দি করেন রাজসভার বিরুদ্ধে চক্রান্তের জন্য। ১৬৪৩, ১৬৪৪ এবং ১৬৪৬ সালে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যান। শেষবার প্রবলভাবে আহত হন, যেমন হন ১৬৫২ সালে প্যারিসে। কৈশোর থেকে রাজসভার জটিল পরিবেশ ও জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। বিদ্রোহ,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ষড়যন্ত্র, উচ্চাভিলাষ, ব্যভিচার, যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের (১৬৪৮-১৬৫৩, যা 'লা ফ্রঁদ' নামে পরিচিত) আয়নায় মানুষ নামক অন্তহীন গ্রন্থের নানা অজানা পৃষ্ঠা উন্মোচিত হতে থাকে তাঁর সামনে।

আহত, ক্রমশ অসুস্থ ও অবসন্ন মানুষটি বুঝেছিলেন সাময়িক গরিমা কত অন্তঃসারশূন্য! ধর্ম মানে কাপট্য, প্রেম মানে প্রতারণা এবং মানুষের প্রতিষ্ঠিত আচরণের আড়ালে সুবিধেলোভী আত্মাভিমান।

তাঁর মনে ছেয়ে থাকত সর্বগ্রাসী এক বিষণ্ণতা। সমসাময়িক কার্দিনাল দ্য রেৎস-এর মতে, 'তাঁর মধ্যে কী যেন একটা ব্যাপার ছিল।... তিনি সৈনিক হয়েও সৈনিক ছিলেন না, সভাসদ হয়েও সভাসদ নন। সব কাজেই কোথায় যেন একটা দ্বিধা।' জীবনযুদ্ধে বারবার পরাজিত। সন্তানদের (যাঁদের কেউ-কেউ জারজ) মৃত্যুতে কাতর ওই রাজপুরুষ কি তৎকালীন ফরাসি অভিজাত-সমাজের প্রিয় অবসর-বিনোদন হিসেবেই রচনা করতে শুরু করেছিলেন এই ম্যাক্সিমগুলি? উদ্বেগ আর অসুস্থতাকে ভুলতে এই বই?

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে 'মাক্সিম' শব্দের অর্থ ছিল সুসংবদ্ধ একটি প্রবাদপ্রতিম বাক্য। সেগুলো ফরাসি 'সালোঁ'গুলোতে যৌথভাবে রচিত ও পরিমার্জিত হত। লা রোশফুকো-য় 'মাক্সিম' পরিবেশিত ও আলোচিত হত প্যারিসের তিন বিদুষী মাদাম দ্য সেভিন্যে, মাদাম দ্য সাব্‌লে, এবং প্রথম ফরাসি ঔপন্যাসিক মাদাম লাফাইয়েৎ-এর বৈঠকখানায়। তাঁদের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি নরম হন, বহু 'মাক্সিম' বর্জন করেন। প্রকাশ করেছিলেন ৫০৪টি মাক্সিম, বর্জন করেছিলেন ৬৪১টি। গৃহীত ও বর্জিত 'মাক্সিম'গুলো পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাঁর পর্যবেক্ষণে জিঘাংসা নেই। আছে শুধু মানুষকে অসহিষ্ণুভাবে খারিজ না-করে সহনশীল বিচারের আবেদন।

কালো জলের ভিতর দর্পণ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

অদ্ভুত এক দর্পণ।

তার সামনে থেকে দূরে পালিয়ে যাব? না, কাছে এসে দেখব আমাদের ক্লিন্ন ও বিষণ্ণ মুখরেখা? যাকে ছুঁয়ে আছে ভালবাসার নর্ম জলধারা।

১। দয়াশীলতাকে গুণ হিসেবে জাহির করা হয়, কিন্তু এর আসল কারণ হল দাম্ভিকতা, কখনও-বা আলস্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভয়, এবং প্রায় সর্বদাই তিনটিই একসঙ্গে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২। স্বার্থন্বেষীরা সব ধরনের ভাষায় কথা বলতে পারে। সব ধরনের লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে। এমনকী উদাসীন লোকের ভূমিকায়ও।

৩। মানুষ নিজেকে যতটা সুখী কিংবা অসুখী ভাবে ততটা সে কখনও নয়।

৪। আন্তরিকতা মানে হৃদয়ের উন্মেষ যা অত্যন্ত দুর্লভ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, তা হল অন্যের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য এক ধরনের সূক্ষ্ম চালাকি।

৫। সত্য জগৎ সংসারের যতটা না উপকার করে সত্যের ভনিতা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে।

৬। সত্যিকারের প্রেমের সঙ্গে ভূতের খুব মিল আছে। সকলেই ও-দু'টোর কথা বলে, কিন্তু প্রায় কেউই দ্যাখেনি।

৭। সকলেই তাদের স্মৃতিশক্তি নিয়ে আক্ষেপ করে, কিন্তু কেউই তাদের বিচারশক্তি নিয়ে নয়।

৮। কোনও কিছুকে তলিয়ে জানতে হলে সমস্ত খুঁটিনাটি জানা দরকার। যেহেতু খুঁটিনাটির কোনও শেষ নেই, আমাদের জ্ঞানও তাই সর্বদাই অগভীর এবং অসম্পূর্ণ।

৯। বার্ধক্যের সঙ্গে-সঙ্গে যেমন মুখের খুঁতগুলো ধরা পড়ে তেমনই মনের খুঁতগুলোও।

১০। দমকা হাওয়ায় যেমন মোমবাতি নিভে যায় কিন্তু আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই অনুপস্থিতি অগভীর আবেগকে কমিয়ে দিলেও গভীর অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেয়।

১১। আমাদের গুণমুগ্ধদের আমরা সব সময়ই পছন্দ করি। কিন্তু আমরা যাদের গুণমুগ্ধ তাদের যে আমরা সব সময় পছন্দ করি একথা বলা যাবে না।

১২। কারও চরিত্রে হাস্যকর কিছু না-পাওয়া গেলে বুঝতে হবে যে যথেষ্ট ভাল করে খোঁজা হয়নি।

১৩। প্রেমিক-প্রেমিকারা কখনওই পরস্পরের সম্পর্কে ক্লান্ত হয় না, কারণ তারা অনর্গল নিজেদের কথা বলার সুযোগ পায়।

১৪। ঘটনাচক্র যেমন অন্যদের কাছে আমাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে, তেমনই নিজেদের কাছেও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৫। আমরা যে আজও আশ্চর্য হতে পারি এটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

১৬। যার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ আর যার হৃদয়ে প্রেম নেই তাদের দু'জনকে খুশি করাই সমান শক্ত।

১৭। একজন খাঁটি লোক উন্মাদের মতো ভালবাসতে পারে, কিন্তু নির্বোধের মতো কখনওই নয়।

১৮। কোনও এক বিশেষ ব্যক্তিকে চেনা সমগ্র মানবজাতিকে চেনার চেয়ে শক্ত।

আমি দেখতে পাচ্ছি ৬৬ বছর বয়সে প্রচণ্ড ব্যথায় প্যারিসের রু্য দ্য মেন-এর এক হোটেলে কাতরাচ্ছেন লা রোশফুকো। মৃত্যুর আগে তিনি জিগ্যেস করলেন তাঁর সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে কি না।

তবু কাগজ কি পোড়ানো যায়? কালো জল পেরিয়ে 'মাক্সিম'গুলো জোনাকি হয়ে উড়ছে!

১ জুন ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩১

জেনিভা হ্রদের পাশে একটি বেঞ্চিতে বসে আছি। আল্‌প্‌স-এর কোলে সমুদ্রের মতো বিরাট সেই হ্রদে সন্ধ্যা নামছে। পাশে এক বৃদ্ধ দম্পতি হাত ধরে নিঃশব্দে দিগন্তের আগুনপাখির দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ ভদ্রলোক আমার দিকে মুখ ফেরালেন। চকিতে তাঁর মেদ আর বলিরেখা ভেদ করে এ কোন মুখ আমি দেখলাম?

এ কোন মুখ?

এ তো সেই মুখ!

সেই সদা-বিব্রত, লাজুক, মৃদু হাসি। উজ্জ্বল চোখের তারায় ছলছল করছে জল। না কি জলের প্রতিচ্ছায়া?

পাশের মহিলা তবে উনা ওনিল চ্যাপলিন! ঘুমের মধ্যেই ভাবছি কী করে তাঁর সঙ্গে দেখা হল? এখানে, এই অলীক নিস্তব্ধতার ভিতর?

আমি দেখতে পাচ্ছি ঢোলা প্যান্ট, আঁটোসাটো কোট, ছোট টুপি আর বড় জুতো পরা চার্লি চ্যাপলিন দ্রুত বেগে হেঁটে চলেছেন ছড়ি হাতে। চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বিশ্বজনীন মূর্তি, সেই আবহমান ভবঘুরে। যে বলে, 'Buck up, never say die!'

সুইজারল্যান্ডে জেনিভা হ্রদের কাছে রম্যাঁ রলাঁ-র বাড়ির অনতিদূরে মানোয়ার দ্য বাঁ-তে ১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয় চ্যাপলিনের। ২৭ ডিসেম্বর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একটি অনাড়ম্বর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর কর্সিয়ে-স্যুর-ভ্যভে'তে তাঁকে সমাহিত করা হয়। দু'মাস পর পোল্যান্ড আর বুলগেরিয়ার দুই বেকার ছেলে মুক্তিপণের আশায় চ্যাপলিনের কফিন চুরি করে অন্তর্ধান করে, যেন চ্যাপলিনেরই লেখা এক চিত্রনাট্যের খসড়া! পার্শ্ববর্তী নোভিল [illegible] থেকে সেই দেহ উদ্ধার করে কর্সিয়ে-স্যুর-ভ্য[illegible]। এখন তা কংক্রিট দিয়ে ঘেরা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি যেখানে বসে আছি তার খুব কাছে তিনি শুয়ে। মানুষের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আমেরিকায় ক্রমাগত উত্যক্ত হয়ে ১৯৫৩ সালে সুইজারল্যান্ডে চলে এসেছিলেন তিনি।

১৮৮৯ সালের (বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল! অর্থাৎ তাঁর বয়স এখন ১২৫) ১৬ এপ্রিল দক্ষিণ লন্ডনের ইস্ট স্ট্রিটে তাঁর জন্ম। মিউজিক হল কমেডিয়ান ও গায়ক পিতামাতা (একজন কশাই পরিবারের সন্তান, অন্যজন এক জুতো-নির্মাতার), দু'বছর পর যাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অনেক দিন পর চ্যাপলিনকে একটি চিঠিতে জানানো হয়— চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিনের জন্ম নাকি স্ট্র্যাটফোর্ডশায়ারের স্মিথউইকে একটি জিপসি ক্যারাভানে! চ্যাপলিন সেই কৌতুককর চিঠিটি ফেলেননি। দেরাজে রেখে দিয়েছিলেন।

কেনিংটনে বড় হওয়া। দারিদ্র, অবহেলা। মা হানা-র প্রায় কোনও রোজগার নেই। কখনও ঘরে বসে সেলাই করেন। দাদা সিডনি কাজ পেলেন জাহাজে। তাতে একটু-আধটু আয় হল। সেই সময় চার্লিই মা-র একমাত্র সঙ্গী।

প্রায়ই মা-ছেলে জানলায় বসে লোকজনের হাঁটাচলা নিরীক্ষণ করতেন। বিশেষ কিছু করার নেই বলে সেটাই ছিল সময় কাটানোর এক প্রকৃষ্ট উপায়। কী দেখতেন মা-ছেলে? লোকজনের হন্তদন্ত পথ চলা? বিক্ষুব্ধ, কর্মব্যস্ত...। লোকেদের আলাদা-আলাদা হাঁটার ধরন? কখনও চার্লি-র মা একটি বিশেষ ধরনকে বেছে নিয়ে অনুকরণ করে দেখাতেন, আর ছেলের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত। অথবা ধরা যাক, মা বেছে নিলেন একটি বেশ লম্বা লোককে, আর পা টিপে-টিপে তার মতো করে হাঁটতে লাগলেন। ছেলেও তাই করত, আর দু'জনেই হেসে কুটিপাটি। তাঁরা দেখতে পেলেন, একটি শিশু মা'র কোল থেকে পড়ে ভিড়ের মধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে— দু'জনের পক্ষেই ভয়ঙ্কর রুদ্ধশ্বাস এক দৃশ্য। রাস্তা আর অলিগলিতে মালিন্য আর সংগ্রামের মধ্যে বাস করা সাধারণ আর অসাধারণ মানুষ, মা-ছেলে জানলা থেকে সেই দৃশ্য দেখেন। ভালবাসা আর যন্ত্রণায় ভরা এই ছিল তাঁদের জীবন।

কখনও ক্লান্ত হতেন না মা আর ছেলে। জানলার বাইরের 'ঘটনা' প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করতেন তাঁরা। সবচেয়ে বড় কথা, মা'র কাছ থেকে ছেলে শিখতেন মূকাভিনয়। মা মূকাভিনয় করছেন, ছেলে শিখছে, শিখতে-শিখতে হাসছে। সে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে মা'র ক্যারিকেচার করার ক্ষমতা দেখে। পরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চ্যাপলিনের যখন বয়স হল, তিনি মা'র সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এমন অত্যাশ্চর্য মিমিক আমি আর দেখিনি।'

মা আর ছেলে। শুধু দু'জন। স্বেচ্ছায়-অস্বেচ্ছায় তাঁরা দু'জন তৈরি করেছেন নিজস্ব এক পৃথিবী, যেখানে মা 'শিক্ষিকা' আর ছেলে 'ছাত্র'। তারপর একদিন ছেলেই হয়ে উঠলেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিমিক, যাঁর তুলনা মেলা শক্ত।

তাঁর মা'র বয়স যখন ষাটের কোঠায়, হানা চ্যাপলিন মারা গেলেন ক্যালিফোর্নিয়ার গ্লেন্ডেল হসপিটালে। হাসপাতালে প্রতিদিন তাঁকে দেখতে আসতেন তাঁর ছেলে, জোর করে হাসিঠাট্টা করতেন। মৃত্যুর আগের দিনও নার্সরা তাঁদের দু'জনের প্রাণখোলা হাসি শুনতে পেয়েছিল। কিছু পরেই হানা কোমায় চলে যান। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৮ সালের ২৮ আগস্ট। অপরিষ্কার এক বস্তিতে জন্মানো আর মানুষ হওয়া সেই লন্ডনবাসিনী কমেডিয়ান-কে কবর দেওয়া হল হলিউডের সমাধিক্ষেত্রে।

এবার ফিরে আসা যাক সেই অনভিজ্ঞ অভিনেতা চার্লসের কাছে। ১৯১০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ফ্রেড কার্নো নামে এক বিখ্যাত মিউজিক হল মালিকের ট্রুপের সদস্য, যে-ট্রুপটি আমেরিকায় এক দীর্ঘ সফর করে। ইংরেজদের মিউজ়িক হল এবং আমেরিকানদের 'ভোদ্‌ভিল'-এর মধ্যে বিরাট কিছু পার্থক্য না-থাকলেও কড়া প্রতিযোগিতা ছিল। আমেরিকানদের কাছে মিউজ়িক হল-এর চেয়ে 'ভোদ্‌ভিল'-ই ছিল বেশি প্রিয়। ফ্রেড কার্নো-র দল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবিচল ভাবে 'শো' করে যায়, এই আশায় যে জয় হবেই। দলটি সামগ্রিকভাবে তেমন কিছু ভাল না-করলেও, একটি সতেরো বছরের ছেলে এতটাই নজর কাড়ল যে কিস্টোন ফিল্ম কোম্পানির ম্যাক সেনেট তার খবরাখবর নিতে বাধ্য হলেন। তিনি পত্রপাঠ তাঁর ম্যানেজারকে একটি টেলিগ্রাম করলেন: 'Try to get hold of a chap called Chapman, Caplin or something, playing second circuit.'

সেই লোকটি আর কেউ নয়, চার্লস চ্যাপলিন। তাঁর চলচ্চিত্র-জীবনের সেই শুরু। তাঁর আকাশচুম্বী সাফল্যের আরও কয়েক বছর দেরি।

তাঁর সাহস ছিল বলার, 'আমি অপমানকে জেনেছি। আর অপমান এমন একটি জিনিস যা ভোলা যায় না।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন বছরের মধ্যে একটি-পর-একটি কোম্পানি বদল করে— কিস্টোন ফিল্মস, এসেনে ফিল্মস এবং মিউচুয়াল ফিল্মস— চ্যাপলিন তৈরি করলেন ইতিহাস। হয়ে উঠলেন এক 'আইকন'।

কিন্তু কেনিংটন গেটের স্মৃতি কি তাঁকে ছাড়ে? সেরকম আরও অনেক। আজ এক মধুস্মৃতির কথা বলি।

পনেরো বছরের সেই মেয়েটির জন্ম ব্রিস্টলে। তার মা তাকে শিল্পী বানানোর উদ্দেশ্যে লন্ডন এসেছিলেন। পনেরো বছরের কিশোরীর জন্য চাকরি জোগাড় করতে তেমন অসুবিধে হয়নি। একদিন যখন সে কার্নো-র দলে রিহার্সাল দিচ্ছে, তখন সেই দলেরই সদস্য চ্যাপলিন উইংসের পাশ থেকে তাকে দেখে থ— 'a simple gazelle with shapely oval face, a bewitching smile and beautiful teeth.'

বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক ডেভিড রবিনসন তাঁর তন্নতন্ন করে গবেষণা করা গ্রন্থ 'চ্যাপলিন— হিজ লাইফ অ্যান্ড আর্ট'-এ এই প্রণয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'অন্য কারও ক্ষেত্রে এটা হতে পারত যৌবনের মোহ, এক সপ্তাহের মধ্যে ভুলে যাওয়া তাৎক্ষণিক হৃদয়ভঙ্গ। কিন্তু চ্যাপলিন তো ঠিক অন্য কারও মতো নন। তাঁর অনুভূতির মধ্যে বিশেষ একটা কিছু ছিল যার শিকড় ছিল তাঁর ছোটবেলার বঞ্চনার ভিতরে প্রোথিত, ফলে ঘটনাটি তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। মেয়েটির নাম হেনরিয়েটা (হেটি) ফ্লোরেন্স কেলি।'

রবিনসনের মতে, চ্যাপলিন যখন উইংস থেকে তাকে দেখেছিলেন হেটি তা লক্ষই করেননি। যখন সে মঞ্চ থেকে নেমে আসছে, চ্যাপলিন তাঁকে দু'চোখ ভরে দেখেছেন। হেটি তাঁকে অনুরোধ করেছিল তার সামনে আয়নাটা ধরতে। পরের দিন অর্থাৎ বুধবার রাতে চ্যাপলিন তাকে বলেছিলেন সে রবিবার বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি আছে কি না। হেটি রাজি হয়। পরের দিন বৃহস্পতিবার তাকে নিয়ে ফিরে আসার আগে তাঁকে ব্যাঙ্ক থেকে তিন পাউন্ড তুলতে হয়। কিন্তু সেই সন্ধেটায় সবকিছু একটু গোলমাল হয়ে গেল, কারণ হেটি খেয়ে এসেছিল আর চ্যাপলিনের খিদেই পায়নি। ক্যাম্বারওয়েল পর্যন্ত তার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে এক নতুন আনন্দ পেলেন তিনি— 'I was walking in Paradise with inner blissful excitement.' আমি স্বর্গের ভিতর দিয়ে হাঁটছিলাম অন্তরের ভিতর এক স্বর্গীয় উত্তেজনা নিয়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুক্কুর-শনিবার চ্যাপলিন তাকে নিয়ে যেতে আসতেন। অবশেষে এক রবিবার, যেদিন তাঁদের দেখা হল পার্কে, হেটি ছিল শীতল ও নার্ভাস। কিছুতেই সে হাত ধরতে দেবে না। সে বলেছিল তার বয়স খুব কম, চ্যাপলিন একটু বেশি আশা করছে তার কাছে। প্রেম-ভালবাসার কথায় সে ঘাবড়ে যায়, শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে আর নিজেকে সামলাতে না-পেরে চ্যাপলিন সোজা ক্যাম্বারওয়েল রোড পর্যন্ত যান। কিন্তু হেটি-র বদলে দেখা হয় তার মা'র সঙ্গে। তিনি জানান হেটি চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বাড়ি ফিরেছে। চ্যাপলিন হেটি-র সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তার মা প্রথমে রাজি হননি। পরে তিনি রাজি হলে চ্যাপলিন বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখেন হেটি মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করল না।

ব্যাপারস্যাপার কিছুই চ্যাপলিনের বোধগম্য হয়নি। এর সহজ উত্তর হতে পারে যে, মেয়েটির মা মোটেই চাননি তাঁর সুন্দরী কন্যার জীবন একজন চালচুলোহীন ভাঁড়ের জন্য নষ্ট হোক। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর তিন কন্যার বিয়ে হয়ে যাবে সুপ্রতিষ্ঠিত বড়লোক বরদের সঙ্গে। প্রথম দেখা থেকে শেষ বিদায় পর্যন্ত পুরো প্রেমকাহিনিটি টিকেছিল এগারো দিন। এবং তাঁরা দু'জন একসঙ্গে থেকে ছিলেন কুড়ি মিনিটের বেশি নয়। কিন্তু চ্যাপলিন তা ভোলেননি। জীবন ও শিল্পে তিনি বহু দিন ধরে চেষ্টা করেছিলেন হেটি কেলি-র জন্য সেই অপূর্ব আবেগকে ধরে রাখতে।

এগারো দিনেই প্রেমপর্ব শেষ। বহু দিন যোগাযোগ থাকেনি, তাঁদের দুস্তর ব্যবধান কি সহজে ঘোচার?

আশ্চর্যজনকভাবে, দশ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে চ্যাপলিন যখন 'শোল্ডার আর্মস' বলে একটি ছবি নিয়ে বিষম ব্যস্ত, হঠাৎ আমেরিকা থেকে হেটি-র একটি চিঠি এসে হাজির। তার প্রথম লাইনটি ছিল এইরকম: 'Do you remember a silly young girl...

হেটি-র চিঠিটি হারিয়ে যায়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, কী করে যেন তাঁর ঠিকানা লেখা ছেঁড়া খামটি হারায়নি। তা ছাড়া, হারিয়ে যাওয়া চিঠিটির প্রথম লাইনটা কি ভোলা যায়?

সেই চিঠিটি না-থাকলেও কয়েক দিন পরে লেখা চ্যাপলিনের উত্তরটি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'প্রিয় হেটি, অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা ঘটে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যায়, যেমন ছবিতে, তেমন জীবনে। আজ সকালে ডেস্কের ওপর তোমার চিঠিটি পেয়ে, কী আনন্দ হল তা তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। প্রথম যখন খামটা দেখলাম, বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল... তাড়াতাড়ি খামটা খুলে ফেললাম—আরে, আরে, দ্যাখো! এ তো তোমারই, তোমারই চিঠি। অন্য কেউ নয়, এত দিন পরে এ তো তুমি! আমি আনন্দে কাঁপছিলাম। এটা ঠিক যে কখনও হঠাৎ মনে হয়েছে যে তুমি আমায় যদি কিছু লেখো, কারণ আমাদের জীবনে কত কিছু ঘটে গিয়েছে। আর তা ছাড়া পুরনো বন্ধুর চিঠির মতো চমৎকার আর কী হতে পারে!

ইশ্, হেটি তুমি একটুও বদলাওনি। আমি বলতে চাইছি তোমার ব্যক্তিত্বের কথা— তোমার চিঠির প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় যা মূর্ত! তুমি জিগ্যেস করেছ আমি কেমন আছি ইত্যাদি। বলতে পারো শারীরিকভাবে ঠিক আছি। আর মানসিক ভাবেও, একজন উনত্রিশ বছর বয়সি লোকের যেমন থাকার কথা, সেইরকম। এখনও বিয়ে করিনি, সেটা অবশ্য তোমার দোষ নয়।...

মনে আছে হেটি, তোমায় একদিন বলেছিলাম টাকা আর সাফল্যটাই শেষ কথা নয়? সেই সময় ও-দু'টোর একটারও অভিজ্ঞতা ছিল না আমার। আজ জানি সুখের অন্বেষণ শুধু নিজের উপলব্ধির মধ্যেই সম্ভব।

যাক, দর্শনের কথা থাক। তোমার কথা বলো। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি তুমি এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছ আর ভীষণ ভাল আছ। নিজের প্রতি আরেকটু নজর দিও...আমি দিন গুনব তোমার চিঠির জন্য। দোহাই তোমার, চিঠি লিখো, ভাল আছ কি না জানিও। জানিও মুখের হাসিটির কথা। তোমার চার্লি।'

সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছর গেল। উত্তর আসেনি। আশ্চর্যভাবে, আর কোনও দিন উত্তর আসেনি।

১৯২১ সালে লন্ডনে ফিরে এলেন চ্যাপলিন। শুনলেন হেটি মারা গিয়েছে আর্মিস্টিসের এক সপ্তাহ আগে, ৪ নভেম্বর ১৯১৮। লন্ডনে ফেরার আগে তিনি এর বিন্দুবিসর্গ জানতেন না।

যে-পার্কটির সামনে হেটি-র সঙ্গে তাঁর লেখা হয়েছিল সেখানে আরও একবার ট্যাক্সি থেকে নামলেন চ্যাপলিন। ডায়েরিতে লিখলেন: 'তোমার মনে আছে, আমি একটা আঁটোসাঁটো ফ্রক কোট পরেছিলাম, সঙ্গে টুপি আর ছড়ি। বেশ বোকাসোকা ছিলাম, চারটে অব্দি সব ক'টা গাড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলাম, এই বুঝি হেটি হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ট্যাক্সি ড্রাইভারের নিশ্চয়ই ধারণা হয়েছিল যে আমি বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথা ভাবছিলাম না, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম এক বুক-দুরদুর করা ফুলবাবু-সাজা উনিশ বছরের কিশোরকে, যে সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষমাণ যখন সে আর ভালবাসা একযোগে পথ হাঁটবে।

সেই রাস্তা হাতছানি দিয়ে ডাকে। ডাকে আরেকবার হাঁটার জন্য, আর আমি শুনতে পাই একটি গাড়ির আওয়াজ। আমি উৎসুকভাবে ঘুরে দাঁড়াই, যেন এখুনি তন্বী হেটি নেমে আসবে হাসতে হাসতে।

গাড়িটি থেমে যায়। দুটি লোক নেমে আসে। এক বৃদ্ধা। কয়েকটি বাচ্চা। কিন্তু না, হেটি নেই। হেটি চলে গিয়েছে। আর সেই সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে ফ্রক-কোট পরা ছড়ি হাতে কিশোর।'

ঋণ: মাই চ্যাপলিন, মৃণাল সেন

১৫ জুন ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩২

চার্লি চ্যাপলিন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'কী অসম্ভব বিষণ্ণ এই পার্কগুলো! কী গভীর নির্জনতা ওদের! একাকী না-হলে কে পার্কে যায়? একাকিত্বের মতো বিষণ্ণ আর কী আছে? বিষণ্ণতার প্রতীক একেকটি পার্ক!'

আমি দেখছি দূর থেকে দূরে আরও দূরে ছায়ার ভিতর মিশে যাচ্ছেন এক খুদে মানুষ, লন্ডনের এক পার্কের শূন্য ডালিতে তার বিষণ্ণতাটুকু রেখে দিয়ে।

আমার মনে পড়ছে সেই কবে পড়া সমর সেনের আশ্চর্য কবিতা:

বিরহ

রজনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে
কী যেন কাঁপে
পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।

তুমি এখনো এলে না।
সন্ধ্যা নেমে এল: পশ্চিমের করুণ আকাশ,
গন্ধে ভরা হাওয়া,
আর পাতার মর্মর-ধ্বনি।

শহরের কর্কশ বৃংহন শুনতে পাচ্ছি না আর, সব তা ধিন্ ধিন্ না থেমে গিয়েছে। ম্লান হয়ে আসছে অগুকোষহীন বিশ্বাসঘাতক মদ্যপের প্রলাপ! সময়ের বালিঘড়ি চুপ, নৈঃশব্দ্য যেন রেলিঙের ওপাশে নর্তকীর মতো এক পা তুলে নাচের মুদ্রায় দাঁড়িয়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্যারিসে লুকসাঁবুর বাগানে কোনও প্রস্তরমূর্তির আড়ালে, পার্ক মঁসুরিতে, লন্ডনের কেনসিংটন গার্ডেন্‌স বা হাইড পার্কে, অক্সফোর্ডের হেডিংটন পার্কে অথবা কলকাতারই কোনও হতশ্রী সবুজে আমি ওদের দেখেছি। অপেক্ষা করতে-করতে কি ওরা পাথর হয়ে গিয়েছে?

Dans le vieux parc solitaire et glacé,
Deux formes ont tout à l'heure passé.
Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
Et l'on entend à peine leurs paroles...

(হিম হয়ে যাওয়া পুরনো নির্জন পার্কে
দু'টি মূর্তি হেঁটে গেল একটু আগে।
তাদের চোখ দু'টি মৃত, ঠোঁট আলগা
তাদের কথা প্রায় শোনাই যায় না।

হিম হয়ে যাওয়া জনহীন সেই পার্কে
দু'টি ছায়া হেঁটে গেল একটু আগে।

—তোমার কি মনে পড়ে সেদিনের সেই সুখ?
—কেন চাইছ সেদিনের কথা ভাবি?

—আমার নামে কি আজও কেঁপে ওঠে বুক?
স্বপ্নে কি দ্যাখো আমার হৃদয়?—না।

—আহ্‌। সেসব দিনের অমলিন খুশি।
—মিশে যেত ঠোঁট!—তাই!

—কী নীল আকাশ, কী বিরাট ছিল আশা!
—আশা পালিয়েছে পরাভূত হয়ে কালো আঁধারের দিকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওইভাবে তারা হেঁটে চলে গেল পাগল ঘাসের মাঝে
আর কেউ নয়, শুধু নিশিরাত শুনেছিল সেই কথা।)

ভের্লেন (১৮৪৪-১৮৯৬)-এর কবিতাটি পড়তে-পড়তে আধোঘুমে আমি ভাবছি, পাসকালের মতো, কী অসারত্বের সমবায় মানুষ! পার্কগুলো জানে, পৃথিবীর সমস্ত হারিয়ে যাওয়া মুছে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া পার্ক, মানুষের বৈপরীত্য— সে একাধারে কতটা গভীর আর অগভীর, বিশ্বাসী আর বিশ্বাসহীন, সাহসী আর কাপুরুষ!

পাসকাল, আপনি কি জানেন আপনার মতো, ওরা জানে কথা না রাখার কথা?

ওরা জানে পাসকাল-কথিত দুর্দশার কথা।

কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস মানুষকে কষ্ট দেয়, যেমন কত তুচ্ছ জিনিস আনন্দ! ('পাঁসে', ৪৩, পাসকাল)

ওরা জানে নাস্তিক্য মানে মনের জোর, কিন্তু কত দূর পর্যন্ত। (ঐ)

অতঃপর পাসকালের সেই ভয়ঙ্কর প্রশ্ন: অসীম অনন্তের মধ্যে মানুষ কোথায় দাঁড়িয়ে? (ঐ, ১৯৯)

পাসকাল বলছেন, 'আমি তোমাদের দেখাতে চাই নতুন এক খাদ। পৃথিবীতে শুধু যা দৃশ্যমান তা নয়, এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর ভিতর যত দূর কল্পনা করা যায় প্রকৃতির বিশালতা (১৯৯)। প্রকৃতির ওই রাজকীয় উচ্চতার সম্পূর্ণতা...'

পাসকাল বলছেন, মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে আছে, শুধু নিজেকে নিয়ে। আর সব কিছু তার কাছে মৃত।

তিনি বলছেন, কী ভয়ঙ্কর মহাপৃথিবীর ওই নৈঃশব্দ্য! ঘাস ছুঁয়ে মানুষ কি সেদিকে তাকাবে?

মানুষের মহত্ত্ব এখানেই যে সে জানে সে নিঃসম্বল: গাছ তা জানে না।

ব্লেজ় পাসকাল (১৬২৩-১৬৬২)-এর মৃত্যুমুহূর্তে না-ছাপা টুকরো-টুকরো বাক্যের সারির সামনে আমি মণিবন্ধ দিয়ে পৃথিবীকে স্পর্শ করতে চাই। ওই মহাজাগতিক বিস্তার কি ছোঁয়া যায়? আমি ঘাসজমিটির দূরতর এক অন্ধকার কোণে সরে আসি। সেই সবুজ নিঃসঙ্গ দ্বীপ পরিত্যক্ত নৌকার মতো দোলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওই বিবর্ণ রেলিঙের ধারে এক টুকরো ঋতুমতী পার্কটিতে বসে কি আমি মঁতেন-এর মতো হোরেস-কে স্মরণ করব?

Quid terras alio calentes
Sole mutamus? Patria quis exul
So quoque fugit?

(কেন আমরা চলে যাই উষ্ণ সূর্যের দেশে? দেশ ছেড়ে যাওয়া কোন সে পলাতক যে তার নিজের কাছ থেকে পালায়?)

চ্যাপলিন আর সেই মৃত মেয়েটি এসে আমার পাশে বসেন। দূরে-দূরে জোড়ায়-জোড়ায় আরও অনেক মানুষ-মানুষী, যারা অকূল দরিয়া পেরিয়ে ফিরে এসেছে আবার। সবাইকে আমি চিনি না। শেক্সপিয়র আর তাঁর সনেটগুচ্ছের বাদামি চুল মেয়েটিও কি এসেছে? কী সর্বনাশ! ওই সাদামাটা চেহারার নারীটি কি লিয়োনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'মোনালিসা'-র জোকোন্দা? বোদল্যের এসেছেন বিষাক্ত আবস্যাঁৎ মদের বোতল হাতে এক পথ-নারীর সঙ্গে, চিত্রশিল্পী দ্যগা-র মতো।

ছায়ার ভিতর দেখছি, কিশোর র‍্যাঁবো-ও এসেছেন, সঙ্গে ভের্লেন। র‍্যাঁবো ভের্লেন-কে পড়ে শোনাচ্ছেন সেই কবিতাটি যার নাম 'স্মৃতি':

L'eau claire: comme le sel des larmes d'enfance...
(স্বচ্ছ জল; শৈশবের অশ্রুর নুনের মতো...)

প্যারিসের তুইলরি বাগান পেরিয়ে শাঁজ়েলিজ়ে'র গাছের সারির ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমি জাক প্রেভের (১৯০০-১৯৭৭)-এর কবিতা পড়ি:

রোববার

গবলিন সরণির দুসারি গাছের মাঝখানে
একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজ রোববার সিনেমা হলগুলো পূর্ণ
গাছের পাখিরা বসে বসে মানুষদের দ্যাখে
আর মূর্তিটা আমায় চুমু খায়, কিন্তু
কেউ আমাদের লক্ষ করে না
শুধু একটি অন্ধ শিশু ছাড়া, যে আমার দিকে আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে।

অথবা দেখি পার্ক মঁসুরিতে পদ্মপুকুরটির কাছে একটি বেঞ্চিতে বসে মাথা নিচু করে খসখস করে কী লিখছেন প্রেভের, যা উৎকীর্ণ হয়ে থাকবে নক্ষত্রপাখির ডানায়। আমি বাস ধরতে কতবার পার হয়েছি সেই পার্ক, কিন্তু কেন? কেন তাকিয়ে দেখিনি, পাশেই তো ওরা ছিল!

উদ্যান

হাজার হাজার বছরেও কুলোবে না
যদি বর্ণনা করতে যাই
চিরন্তন কালের সেই ছোট্ট মুহূর্তটা
যখন তুমি আমাকে চুমু খেলে
যখন আমি তোমাকে চুমু খেলাম
শীতের এক সকালের আলোয়
মঁসুরি পার্কের ভিতর পারিতে
পারিতে
পৃথিবীর ওপর
পৃথিবী যা এক নক্ষত্র।

(অনু: অরুণ মিত্র)

কবিতাটি শুনে ঘুমের মধ্যে যখন আবিষ্ট হয়ে আছি, দেখছি বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, সেইসঙ্গে মাটিতে আছড়ে পড়ছে লোহা আর আগুন! রক্তঝড়ের মধ্যে শুনি প্রেভের কবিতা পড়ছেন:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বার্বারা

...স্মরণ করো বার্বারা
ভুলো না সেই নম্র আনন্দিত বৃষ্টি
তোমার আনন্দিত মুখের ওপর
সেই আনন্দিত শহরের উপর
সেই বৃষ্টি সমুদ্রের ওপর
অস্ত্রশালার ওপর
জাহাজের ওপর
ও বার্বারা
যুদ্ধটা কী ধাষ্টামো
এই লোহা আর আগুন
আর ইস্পাত আর রক্তের বৃষ্টির মধ্যে
তোমার কী হল
আর সেই লোকটার যে তোমাকে বুকে চেপে ধরেছিল
ভালবেসে
সে কি মরে গেল নিখোঁজ হল না কি এখনও বেঁচে
ও বার্বারা
অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে ব্রেস্ত-এর ওপর
আগে যেমন পড়ত
কিন্তু তা আর একরকম নয় সবই নষ্ট হয়েছে
এ বৃষ্টি শোকের আশাহীন সাংঘাতিক
এমনকী লোহা ইস্পাত রক্তের
ঝড়ও এ আর নয়
এ নিছক মেঘ
যা কুকুরের মতো ফেটে যায়
সেইসব কুকুরের মতো যারা
ব্রেস্ত-এর জলের স্রোতে অদৃশ্য হয়
আর দূরে গিয়ে পচে
দূরে ব্রেস্ত থেকে অনেক দূরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাদের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

(অনু: অরুণ মিত্র)

আমি দেখছি ঘাসে লেখা আছে সত্যবদ্ধ অভিমান, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আর অপমান। ঘাসে পড়ে আছে ভ্রূণ! আকাশে কালপুরুষ।

মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাটা হাতে আমি তুলে নিয়েছি এক ভয়ঙ্কর কবিতা:

হাইড পার্ক

বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া
সমুদ্রের মতো
এখানে প্রেমিকপ্রেমিকারা যা ইচ্ছে তাই করে
কেউ জিগ্যেস করে না
সেটা এক রাত্রির জন্য
না এক মুহূর্তের,
কেউ সবুজ জীবন্ত ভেলভেটের
এই ঘরটার ভাড়া চায় না।
হাইড অ্যান্ড জেকিল পার্ক
জনগণের ইডেন
যেখানে দিনরাত শোনা যায়
শুধু একটিই ফিসফিসানি:
'ডেভিল সেভ দ্য ড্রিম',
শয়তান স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখুক।

(জাক প্রেভের)

২৯ জুন ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৩

ছেলেটি প্যারিসের এক দোকান 'ল্য বঁ মার্শে'-তে জিনিসপত্র বিক্রি করতে-করতে মানুষজন দ্যাখে। তার চোখ খুঁজে বেড়ায় কাহিনি।

ছবি আর কাহিনি। স্কুলের পর লেখাপড়ায় দাঁড়ি টেনেছে সে। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে দরিদ্রতম মানুষের কাছে সে নিয়েছে জীবনের পাঠ। শানিয়েছে তার কথার অস্ত্র, যা দিয়ে একদিন সে মেকি-কবিতার বয়ানকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে।

বোদল্যের আর মালার্মের হাত ধরে ফরাসি কবিতার যে-দুঃসাহসিক অভিযানমালা তার ব্যতিক্রম সে। শব্দের খেলায় সে মজে থাকলেও শব্দের অ্যালকেমি তাকে টানে না। নিন্দুকেরা বলে, তার কবিতায় মালার্মে-কথিত নিবিষ্ট নির্মাণ নেই। নেই স্বপ্নিল ঘনত্ব আর অক্ষরের অনন্ত রহস্য! ফরাসি দেশে বিশ শতকের প্রথমার্ধের আধুনিকতার বিস্ফোরণে সে খুব সহজে জায়গা করে নিতে পারবে না। সেখানে আপোলিনের, ব্লেজ় সাঁদ্রার্স্, পল ক্লোদেল, স্যাঁ-জন পের্স, পল এল্যুয়ার, লুই আরাগঁ, আঁরি মিশো, পিয়ের রভের্দি, রনে শার'দের ভিড়। তবু সে আছে। কারণ সে খুলে দিতে পেরেছে খিল। জনপ্রিয়তা আর মহত্ত্বের মধ্যেকার অবিসংবাদিত পাঁচিল সে নিঃশব্দে ভেঙে দিয়েছে।

জাক প্রেভের (১৯০০-১৯৭৭) কি বিশ শতকের কবিতার সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী, আইকোনোক্লাস্ট? এত সাবলীল অবজ্ঞায় প্রথা ভেঙে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়?

তাঁর জন্ম ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০, প্যারিসের পশ্চিম উপকণ্ঠে ন্যই-স্যুর-সেন-এ। জীবনানন্দ দাশ, নজরুল ইসলাম, আঁরি মিশো আর ফ্রাঁসিস পঁজ-এর বয়স তখন এক পূর্ণ হয়নি। মার্কিন মুলুকে টি এস এলিয়টের বয়স সবে এগারো পেরিয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। তিন ভায়ের সঙ্গে অসচ্ছল সুখী শৈশব। রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে, পার্কে গিয়ে সে গায়কদের গান শোনে। পথনাটিকার অভিনেতাদের অভিনয় দ্যাখে। বাবা কাজ করেন প্যারিসের গরিব মানুষদের রক্ষণাবেক্ষণের আপিসে, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সে গরিবদের পাড়ায় যায়। শ্রমিক আর সাধারণ মানুষের জীবন তার মনে আঁকা হয়ে যায় চিরকালের মতো। বাবা কাগজে নাটকের সমালোচনা লেখেন, আর তাকে নিয়ে যান থিয়েটারে-সিনেমায়।

প্রেভের স্কুল ছাড়ে চোদ্দো বছর বয়সে। তার শিক্ষা রাস্তায়। রাস্তা মানুষকে যে কতটা শেখাতে পারে তার চেয়ে বড় উদাহরণ বিশ্বকবিতায় বেশি নেই।

১৯২০ সালে ল্যুনেভিল শহরে মিলিটারি সার্ভিস করতে গিয়ে চিত্রশিল্পী ইভ তাঁগি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁগি-র সূত্রে শিল্পী মার্সেল দ্যুয়ামেল-এর সঙ্গেও ভাব হয় তাঁর। অমোঘ আকর্ষণে তিনি স্যুররেয়ালিস্ত-দের সঙ্গে মেশেন। কারণ তিনিও তো অধীত বিদ্যা আর যুক্তির শাসন অস্বীকার করতে চান, যাতে জীবনের অকৃত্রিম স্রোতের কাছে পৌঁছনো যায়!

তখনই স্যুররেয়ালিজ্‌ম আন্দোলনের নেতা আঁদ্রে ব্র্যতঁ-র দলবলের মধ্যে হাস্যরসিকতার জন্য প্রেভের জনপ্রিয় হয়ে যান। কিন্তু তাঁর আলাদা কোনও অস্তিত্ব তৈরি হয়নি। কোনও কিছুর তোয়াক্কা না-করা এই অনির্দিষ্ট জীবনধারা কত দিন মোহিত করে রাখবে তাঁকে? ব্র্যঁত-র কর্তৃত্বের কারণে বন্ধুত্ব বেশি দিন টেকেনি। রু্য দু শাতো-র স্যুররেয়ালিস্ত আড্ডার থেকে তাঁবু গুটিয়ে প্রেভের ছোটখাটো চাকরি নেন। আর লেখেন কবিতা। স্যুররেয়ালিস্‌ম-সুলভ স্বয়ংক্রিয় লিখনের কবিতা। কিন্তু সে পথ তো প্রেভেরের নয়।

বামপন্থা তাঁকে টানে। 'অক্টোবর গ্রুপ' নামে একটি কমিউনিস্ট নাট্যদলে তিনি স্যুররেয়ালিস্‌ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন। সেই দলের সঙ্গে মস্কোও যান প্রেভের। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও তাঁকে আকর্ষণ করে। স্বয়ং জাঁ রনোয়ার-এর সঙ্গে 'ম্যসিয়ো লাঁজ-এর অপরাধ' ছবির চিত্রনাট্য লেখেন তিনি। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার মার্সেল কার্নের ছবির ('ভোর হল', 'রাতের দুয়ারগুলি', 'স্বর্গের শিশুরা') চিত্রনাট্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লিখতে-লিখতে ছবির জগতে চলে আসেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে এই সম্পর্ক প্রেভেরের পক্ষে অনিবার্য ছিল।

ফ্রান্সে জার্মান অবস্থানের সময় জাক প্রেভেরকে দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে যেতে হয়। তার মধ্যেই তৈরি হয় 'স্বর্গের শিশুরা' ছবি। ১৯৭৭ সালে প্রেভেরের মৃত্যুর পর মার্সেল কার্নে তাঁকে 'ফরাসি চলচ্চিত্রের একমাত্র কবি' বলে অভিহিত করেন।

১৯৪৫ সালে 'পারোল' (কথা) প্রকাশিত হওয়ামাত্রই কয়েক লক্ষ কপি বিক্রি হয়। বইটি হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর এক ক্লাসিক। কবিতাগুলোর গান লোকের মুখে-মুখে ফেরে। জনপ্রিয়তা ও মহত্ত্বের অনিবার্য জটিল প্রশ্নের এমন সমুচিত জবাব আর কেউ দিতে পারেননি। জীবন থেকে উত্থিত এইসব চলচ্চিত্রধর্মী কবিতা-কাহিনির সার্থকতা তার সটান, ভানহীন, সুরেলা কথনভঙ্গিতে। ছবির সব গোপনতম রহস্য যেন তাঁর জানা। তাঁর দৃষ্টি যেন 'le regard des enfants,' শিশুর দৃষ্টি, যা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। 'Je n'ai jamais écrit le mot 'haine' (আমি কখনও 'ঘৃণা' শব্দটি ব্যবহার করিনি), লিখেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর কবিতার উৎস তো জীবনের শিকড়ে, যা চোখের জলে ভেজা। এল্যুয়ার-এর মতো তিনি মানুষকে 'দেখান' না ('donner à voir')। তিনি তাঁর চোখের দৃষ্টি পাঠককে ধার দেন।

কারও সঙ্গেই তাঁর মেলে না। গায়েতাঁ পিকঁ-র মতে, ফ্রান্সে তিনিই একমাত্র কবি যিনি দীক্ষিত পাঠকের সীমা অতিক্রম করে মানুষের বিরাট জোয়ারের বিদ্যুৎশিখাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন।

মুখে সিগারেট। টেবিলে একটি বোজোলে ওয়াইনের গ্লাস। যেন আমি ঘুমের মধ্যে একটি সাদা-কালো ছবি দেখছি।

সেন নদীর দক্ষিণ প্রান্তে বুলভার স্যাঁ-মিশেলে স্যাঁ-মিশেল ফোয়ারার পাশে একটি রেস্তোরাঁর টেরাসে বসে এক মনে কবিতা লিখছেন একটি ন্যাপকিনের ওপর, বাকি অংশটা লিখেছেন একটি খবরের কাগজে। দু'পা দূরে লুকসাঁবুর বাগান। সেখানে ঘাসের গালিচা পাতা।

আশেপাশে কয়েকটি শিশু খেলা করছে। প্রেভের সেদিকে সস্নেহে তাকিয়ে আবার লিখছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাতাসের নামকরণ

এই রাস্তাটাকে
লুকসাঁবুর বাগানের জন্য
লোকে আগে বলত লুকসাঁবুর সরণি
এখন এটার নামকরণ হয়েছে গিনমের রোড
কারণ যুদ্ধের সময় এক বিমানচালক মারা গেছে
তবু
এই রাস্তা
সর্বদাই একরকম
বাগানটা একই রকম
বাগান স্ট্যাচু পুকুর আর গাছ নিয়ে
এটা এখনও লুকসাঁবুর
জীবন্ত গাছ
পাখি
জলজিয়ন্ত বাচ্চারা
সমস্ত জীবন্ত বাচ্চারা
এখন সত্যিই প্রশ্নটা হচ্ছে
ওই যুদ্ধে মৃত বিমানচালক
ওখানে
কী করছে?

রু দ্য সেইন

রু দ্য সেইন
রাত সাড়ে দশটা
আর-এক রাস্তার মোড়ে
টলছে একটি মানুষ...একটি যুবা
মাথায় টুপি
গায়ে বর্ষাতি

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে
ঝাঁকুনি দিচ্ছে
আর কী যেন বলছে সেই ছেলেকে
ছেলেটি মাথা নাড়ছে
টুপিটা একপাশে হেলানো
আর মেয়েটির টুপিও আর-একটু হলেই খসে পড়বে
ফ্যাকাশে মুখ দুজনের
ছেলেটি নিশ্চয়ই চলে যেতে চায়
পালাতে চায়... কিংবা মরতে
অথচ মেয়েটির মধ্যে জ্বলছে বাঁচবার এক দারুণ ইচ্ছা
আর তার কণ্ঠস্বরে
তার চাপা কণ্ঠস্বর
এ তো যে-কেউ বুঝবে
যে স্বর নয় গোঙানি
যেন আদেশ...
যেন আর্তনাদ...
ঠিক তেমনই ব্যগ্র...
আর করুণ
আর জীবন্ত...
শীতার্ত কবরখানায় কোনো সমাধির উপরে
ঠান্ডা হাওয়ায় শিউরে উঠছে এক নবজাতক...
দরজার পাল্লায় আঙুল চেপটে গিয়ে
যেন ককিয়ে উঠেছে কেউ
যে-গানের যে-কথার
কোনোও পরিবর্তন নেই
তারই পুনরুক্তি
কেউ তাতে বাধা দেয়নি
উত্তরও দেয়নি কেউ
মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই ছেলে, দৃষ্টি বিস্ফারিত
যেন অথই জলের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে কেউ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর ডুবতে-ডুবতে শুনছে সেই কথা
সেই একই কথার পুনরুক্তি
রু দ্য সেইন আর-এক রাস্তার মোড়ে
মেয়েটি কথা বলছে
প্রশ্ন করছে বারবার
সেই একই উৎকণ্ঠ প্রশ্ন
সেই একই বেদনা যার উপশম নেই
পিয়ের, সত্যি করে বলো
পিয়ের, সত্যি করে বলো
সব কিছুই আমি জানতে চাই
সত্যি করে বলো...

(অনু: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

সুন্দর পরিবারবর্গ

১ম লুই
২য় লুই
৩য় লুই
৪র্থ লুই
৫ম লুই
৬ষ্ঠ লুই
৭ম লুই
৮ম লুই
৯ম লুই
১০ম লুই (নাম তার উ্যত্যাঁ)
একাদশ লুই
দ্বাদশ লুই
ত্রয়োদশ লুই
চতুর্দশ লুই
পঞ্চদশ লুই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ষোড়শ লুই
সপ্তদশ লুই
তারপর কেউ নেই কিছুই নেই...
এই লোকগুলো কীরকম
যারা কুড়ি পর্যন্ত গুনতেও জানে না?

প্রবচন

নির্জন সমুদ্রতীরে
উল্টে আছে একটি কচ্ছপ
একটি বালিয়াড়ির কাছে
কেউ নেই যে ওকে সোজা করে দেবে।

কচ্ছপ
তোমার শেষ প্রহর
গোনা হবে না।

ফুলওয়ালির দোকানে

একজন লোক ঢুকল ফুলওয়ালির দোকানে
ফুল বাছাই করল
ফুলগুলোকে জড়িয়ে দিল ফুলওয়ালি
লোকটা পকেটে হাত দিল
টাকা বের করার জন্যে

ফুল কেনার টাকা
কিন্তু সেই সময় সে
হঠাৎ
হাত দিল তার হৃদয়ের উপরে
এবং প'ড়ে গেল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন সে পড়ল সেই সময়
টাকা গড়িয়ে পড়ল
তারপর ফুলগুলো পড়ল
লোকটার সঙ্গে সঙ্গে
টাকার সঙ্গে সঙ্গে
ফুলওয়ালি দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে
আর টাকা গড়াতে থাকল
ফুলগুলো নষ্ট হয়ে এল
লোকটা মরতে থাকল
স্পষ্টতই ব্যাপারটা খুব করুণ
তার নিশ্চয় কিছু করা দরকার
ফুলওয়ালির
কিন্তু কীভাবে করবে সে জানে না
সে জানে না
কোথা থেকে শুরু করবে
এত জিনিস করবার আছে
যখন ওই লোকটা ম'রে যাচ্ছে
ওই ফুলগুলো নষ্ট হচ্ছে
আর ওই টাকা
ওই টাকা গড়াচ্ছে
তার গড়ানো আর থামছে না।

(অনু: অরুণ মিত্র)

রক্তের ভেতর গান

ওই যে বিরাট বিরাট রক্তে ভরা গর্ত
অত রক্ত কোথায় যায়
মাটি কি তা শুষে নেয় মাতাল হওয়ার জন্যে
কী অদ্ভুত মাতলামি
কী গম্ভীর... কী [illegible]বয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

...পৃথিবী
তার কিছু এসে যায় না
সে পাক খায় আর সমস্ত কিছু চিৎকার
করতে শুরু করে
তার কিছু এসে যায় না
সে ঘোরে
সে ঘোরা থামায় না
আর রক্ত, সে বয়ে চলে...
এত রক্ত কোথায় যায়
খুনের রক্ত, যুদ্ধের রক্ত
দুর্দশার রক্ত
জেলখানার অত্যাচারিত মানুষের রক্ত...
বাপ-মায়ের হাতে নির্যাতিত শিশুদের রক্ত
...আর রক্ত যা হুড়মুড় করে বেরোয়
নবজাতকের সঙ্গে...
মা কাঁদে আর পৃথিবী ঘোরে
পৃথিবী ঘোরা থামায় না
আর রক্ত, সে বয়ে চলে
এত রক্ত কোথায় যায়?
পিটিয়ে শেষ করা মানুষের রক্ত, বন্দুক দিয়ে মারা
মানুষের রক্ত
দণ্ডিত মানুষের রক্ত...

সীমান্ত

—তোমার নাম?
—নাঁসি।
—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?
—ক্যারোলিনা।
—কোথায় যাচ্ছ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—ফ্লোরেন্স।

—যাও।

—তোমার নাম?

—আকাশের নীল, গাছের সবুজ, রাতের কালো,
গোলাপের গোলাপি।

—বিয়ে হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কার সাথে?

—ডিমের হলুদ।

—যাও।

আজ মধ্যরাতে প্রেভেরের কণ্ঠস্বর ঘুমের কুয়াশা ভেদ করে আমাকে তাড়া করে। কবিতা-লেখা কাগজের পৃষ্ঠাগুলি স্যাঁ-মিশেলের ফোয়ারার সামনে মাতাল হাওয়ায় ওড়ে। উড়তেই থাকে। যেন ওরা আজ পাখি হয়ে গিয়েছে।

১৩ জুলাই ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৪

I will show you fear in handful of dust.

(The Waste Land)

প্যারিসের সেন নদীর ওপর একটি নির্জন সেতুতে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছায়া।

জলে সন্ধের সংরাগ। সেখানে সেই ছায়া একটু-একটু কাঁপছে।

সে বড় একা। নাম টমাস স্টার্নস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫)। বয়স বাইশ। অন্য এক সভ্যতা থেকে এসে সে রহস্যরূপিণী প্যারিসের সামনে সংকুচিত ও বিহ্বল বোধ করে। তার মার্কিন উচ্চারণের ফরাসি লোকে ভাল বোঝে না। চারপাশের উচ্ছল মানুষজনকে কেমন মায়াবী স্বপ্নের মতো মনে হয়, বিশেষত ফরাসিনীদের। কিন্তু সেসব নয়, সে এসেছে কবিতার টানে। বিশেষত জ্যুল লাফর্গ-এর কবিতার।

আমেরিকার মিসৌরি অঞ্চলের সেন্ট লুইস শহরের ছেলে সে। সতেরো শতকে তার পূর্বপুরুষ অ্যানড্রু এলিয়ট ইংলন্ডের সমারসেটের ইস্ট কোকার গাঁ থেকে মার্কিন মুলুকে চলে গিয়েছিলেন। সে নিজে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র।

একটু আগে সে কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল আঁরি বের্গসনের। সে ভাল ফরাসি জানে না বলে বের্গসন'কে বলে বার্গসঁ। লাতিন কোয়ার্টারে পাঁতেয়ঁ-র পাশে রু্য স্যাঁ-জাক-এ যে বোর্ডিংয়ে সে থাকে, সেখানে জাঁ ভেরদ্যনাল নামে এক ডাক্তারি ছাত্রের সঙ্গে তার ভাব। কারণ সে-ও লাফর্গ বলতে অজ্ঞান। লাইল্যাক ফুল হাতে নিয়ে লুকসাঁবুর বাগান দিয়ে ভেরদ্যনালের হেঁটে আসার দৃশ্য সে কখনও ভোলেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত ভেরদ্যনাল'কে সে উৎসর্গ করবে তার যুগান্তকারী প্রথম কাব্যগ্রন্থ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'প্রুফ্রক অ্যান্ড আদার অবজ়ারভেশন্‌স' (১৯১৭)। আঁরি ফুর্নিয়ে নামে এক ছোকরার কাছে সে ফরাসি ভাষায় তালিম নেয়। সেই ছেলেটি যে আল্যাঁ ফুর্নিয়ে ছদ্মনামে একটি উপন্যাস লিখে বিশ্ববিখ্যাত হবে সে জানত না। ফুর্নিয়েও কি জানত ওই লাজুক মার্কিনটি কয়েক বছরের মধ্যে হয়ে উঠবে আধুনিক ইংরেজি কবিতার ঈশ্বর?

সে চোখ তুলে মেয়েদের দিকে তাকায় না। যদিও প্যারিসের রূপোপজীবিনীদের নিয়ে শার্ল-লুই ফিলিপের দু'-দু'টি উপন্যাস সে পড়ে নিয়েছে, যা সে একাধিক কবিতায় নগ্নভাবে ব্যবহার করবে। তার হাতে শল্যচিকিৎসকের ছুরি-কাঁচি। বোদল্যের, লাফর্গ আর ত্রিস্তাঁ করবিয়ের মৃত্যুর দেশ থেকে ফিরে এসে অন্য এক সংস্কৃতিতে অন্য এক ভাষায় পুনর্জীবিত হবেন তার হাতে। ফরাসিদের কাছ থেকে সে শিখল সাহস। ভাঙচুর করার সাহস, নতুন করে দেখার সাহস। নতুন ছবি তৈরির সাহস।

আর সেই নান্দনিক দুঃসাহসিকতার সঙ্গে যুক্ত হল গভীর এক দর্শন। সে যে দান্তের ভক্ত। দান্তে-র 'দিভিনা কম্মেদিয়া' পড়তে পড়তে সে তাঁকে স্নায়ুশিরায় ধারণ করে রাখে। ফরাসি কবিদের কাছে সে শেখে কবিতার নির্ভীক শিল্প। আর দান্তের কাছে সে শেখে জীবনের রূপরেখা। ইনফেরনো, পুরগাতোরিও আর পারাদিসো কী করে যেন সত্যি হয়ে ওঠে এক নিবিষ্ট একাকী-পাঠকের জীবনে।

ঘুমের ভেতর ফরাসি দেশে আধুনিকতার বিস্ফোরণ, আপোলিনের, আঁদ্রে জিদ, প্রুস্ত, পিকাসো, জাকোমেত্তি, কাঁদিনস্কি, ক্লোদেল, বের্গসন, লাতিন কোয়ার্টার, পাঁতেয়ঁ সব জলের ভেতর মিলিয়ে গিয়েছে। দেখছি ছেলেটি এখন ইংলন্ডে, অক্সফোর্ডে মার্টন কলেজের ছাত্র। প্যারিসের পর অক্সফোর্ডে দেয়ালে অসুন্দর ব্রিটিশ চিত্রকলা (তার ভাষায় 'hideous') আর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী'দের নিয়ে হাঁটা গৃহবলিভুক অধ্যাপকদের তার সহ্য হয়নি।

মডলিন কলেজের কাছে চারওয়েল নদীর ওপর ছোট সেতুটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। সে যে সাংঘাতিক প্রতিভাধর এক কবি, সে যে ছুরির ফলার মতো ধারালো নতুন চিত্রকল্প দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারে পোকায় কাটা পুরনো রচনারীতি, সে-কথা কয়েকজন বুঝেছেন, বিশেষ করে আমেরিকা থেকে ইংলন্ডে আসা আরেক আমেরিকান, যাঁর নাম এজ়রা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পাউন্ড। পাউন্ড বুঝেছিলেন ইংরেজি কবিতার ভবিষ্যৎ কঙ্কালটিকে বদলাতে গেলে সেন্ট লুইসের এই তরুণ আমেরিকানকে যেন তেন প্রকারেণ রেখে দিতে হবে ইংলন্ডে।

অবশেষে দৈববশে ছাব্বিশ বছরের টি এস এলিয়ট যখন ভিভিয়েন হে-উড নামে এক বিদুষী ইংরেজ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁকে তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করে বসলেন, পাউন্ড যতটা খুশি হয়েছিলেন ইংরেজি কবিতার কথা ভেবে, আর কেউ হননি।

বাবা-মা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, টাকা পাঠানো বন্ধ হয়েছে। লয়েড্‌স ব্যাঙ্কে সামান্য মাইনেতে নাভিশ্বাস উঠেছে। ঘরে ধ্বংসের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হয়েছে। দাম্পত্যজীবনে এসেছে অপ্রত্যাশিত ঝড়। মৃত্যুর পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গিয়েছে জীবন। দান্তের নরকের মতো।

তবু ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে, 'Sunless dry geraniums/ And dust in crevices'-এর মধ্যে শুধু কবিতার জন্য এলিয়টের বেঁচে থাকা।

The brown waves of fog toss up to me
Twisted faces from the bottom of the street,
And tear from a passer-by with muddy skirts
An aimless smile that hovers in the air
And vanishes along the level of the roofs.
('Morning at the Window')

তারপর এল নরকের কালো ঢেউ। ভয়ংকর অনিরাপত্তায় ভেঙে পড়লেন এলিয়ট, মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক মনস্তত্ত্ববিদের কাছে সমর্পণ করতে হল নিজেকে। সেই স্থিতিহীনতার ভেতর, তাঁর ভাষায় 'ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের ভেতর' ('an awful nightmare of anxiety') তিনি অনর্গল লিখে চলেছিলেন এক ধ্বংসকথা, যার আদি-অন্ত নেই, কাঠামো নেই। সেটিকে হিংস্রভাবে কেটেকুটে যে-কবিতাটি দাঁড় করালেন পাউন্ড তার নাম 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' (১৯২২)। আধুনিক সভ্যতার এই মহাকাব্য যেন শঙ্খরেখাসর্পিল তমিস্রার মধ্যে দাঁড়িয়ে আলোর জন্য হাহাকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'My nerves are bad to-night. Yes, bad, Stay with me.
Speak to me. Why do you never speak. Speak'

I think we are in rats' alley
Where the dead men lost their bones.

'What is that noise?'
The wind under the door.
'What is that noise now? What is the wind doing?'
Nothing again nothing.
'Do
You know nothing? Do you see nothing? Do you remember
Nothing?'

...To Carthage then I came

Burning burning burning burning
O Lord Thou pluckest me out
O Lord Thou pluckest

burning

('The Waste Land')

কবে শেষ হবে এই দীর্ঘ রাত?

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the ways the world ends
Not with a bang but a whimper.

('The Hollow Men')

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ধম্মপদ', 'গীতা' এবং উপনিষদ পড়ছেন। পড়ছেন পাসকাল ও দান্তে। ১৯২৭ সালে যখন অসহনীয় হল অমানিশা, তিনি আধ্যাত্মিকতার কাছে বিনত হলেন। সদস্য হলেন অ্যাংলো-ক্যাথলিক চার্চের।

বিশ শতকের কবিতার এই অন্যতম মহৎ জাদুকরের ভাষা ক্রমশ হয়ে উঠল স্তোত্রের মতো। সেখানে স্পষ্টতর হল মহাকবিতার লক্ষণ। শব্দের স্নায়ুশিরায় যন্ত্রণাসঞ্জাত এই প্রজ্ঞা। গত একশো বছরের সম্ভবত সবচেয়ে কঠোর আত্মসম্পাদনাময় কবির কবিতা হয়ে উঠল মন্ত্রের মতো অভ্রময়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। আমি দেখছি প্যারিসের সেন নদী বা অক্সফোর্ডের চারওয়েল নদীর সেতুতে দাঁড়ানো সেই নিঃসঙ্গ, কম্পমান ছায়া আজও হেঁটে চলেছেন একা। যন্ত্রণা থেকে যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে তিনি খুলে ফেলেছেন সমস্ত পোশাক। আজ তিনি ঈশ্বরের জন্য নগ্ন।

চারপাশে গোধূলি-সন্ধির নৃত্য।

লন্ডনের রাসেল স্কোয়্যারে তাঁর প্রকাশনা-সংস্থা ও কর্মস্থল 'ফেবার অ্যান্ড ফেবার'-এর অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি হাঁটছেন। আর আমি শুনছি 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' (১৯৩৫)-এর কোরাস:

> Ill the wind, ill the time, uncertain the profit, certain the danger,
> O late late late is the time, late too late, and rotten the year;
> Evil the wind, and bitter the sea, and grey the sky, grey grey grey.

কষ্টিপাথরে ঘষে জ্বলে উঠছে শব্দের সত্য।

> We have all had our private terrors,
> Our particular shadows, our secret fears.
> But now a great fear is upon us, a fear not of one but of many,
> A fear like birth and death, when we see birth and death alone
> in a void apart. We
> Are afraid in a fear which we cannot know, which we cannot face
> which none understands,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

And our hearts are torn from us, our brains unskinned, like the
layers of an onion, our selves are lost lost
In a final fear which none understands.

ওই যে হাঁটতে হাঁটতে আবার বিড়বিড় করছেন এলিয়ট:

I have smelt them, the death-bringers...
Death in the rose, death in the hollyhock, sweet
pea, hyacinth, primrose and cowslip...
Corruption in the dish, incense in the
latrine, the sewer in the incense...

এক অন্ধকার মাঠে রক্তবৃষ্টি হচ্ছে, আর আমি নিঃশব্দে নতজানু হয়ে বসেছি এলিয়টের পাশে। আমরা প্রার্থনা করছি মৃত্যু-উপত্যকা থেকে:

Clear the air! clean the sky! wash the wind! take stone from
stone and wash them.
The land is foul, the water is foul, our beasts and ourselves
defiled with blood.
A rain of blood has blinded my eyes.

How how can I ever return, to the soft quiet seasons?

২৭ জুলাই ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৫

বিকেলে পুবের বারান্দায় বেতের চেয়ারে তিনি বসে আছেন একা। দৃষ্টি সোজা, কোন সুদূরে।

পাশে শ্বেতপাথরের জলচৌকিতে বসে আছেন রানী।

বারান্দার সামনে লাল কাঁকরের ধারে একটি নবীন তালগাছ। ডুবন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে তালগাছের গায়ে। সেখানে পাতার ভাঁজে ভাঁজে ফুটেছে লাল-সোনালি আভা।

রানী চন্দ লিখেছেন: সূর্য অস্ত গেল। আলো নিভে পুবের আকাশে সন্ধের অন্ধকার নামল। কালো আকাশের গায়ে কালো তালগাছ মিলেমিশে দাঁড়িয়ে রইল। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'কোথায় গেল রূপ। আর কোথায় গেল রঙ। কিন্তু সে আছে। এইখানেই সে সত্যি।'

ভারতীয় চিত্রকলায় আত্মানুসন্ধানের প্রতীক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। দ্বারকানাথের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথের ছোট ছেলে। 'বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা, যে 'বেঙ্গল স্কুল' চিত্রশিল্পে আধুনিকতার জন্ম দিয়েছে। 'সাধনা' পত্রিকার ছবিই হোক কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'-র ইলাস্ট্রেশন, রাজপুত চিত্রকলা, কৃষ্ণলীলা বা মুঘল শিল্প, জাপানি রংরেখা, বা আরব্য রজনী চিত্রমালা, অজন্তার শিল্প অথবা মুসৌরি পাহাড়ের জ্যোৎস্না— তুলির সেই গীতিরস মিলবে তাঁর সাহিত্যেও। জীবন-কথা আর রূপকথার জাদু মিশেল ছড়িয়ে আছে 'শকুন্তলা' (১৮৯৫), 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬) থেকে 'রাজকাহিনী' (১৯০৯), 'ভূতপতরীর দেশ' (১৯১৫) থেকে 'বুড়ো আংলা' (১৯২১-'২২) পর্যন্ত। 'মারুতির পুঁথি', 'মহাবীরের পুঁথি', 'গজকচ্ছপের পালা'-র মতো পালাগানে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া উনত্রিশটি বাগেশ্বরী বক্তৃতায়।

ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন তিনি, লিখেছেন রানী। ছবি বন্ধ,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কুটুম-কাটাম বন্ধ, লেখাও বন্ধ। বারান্দায় নিজের কৌচে চুপ করে বসে থাকেন। নিমীলিত চোখ, স্থির মূর্তি, নির্বিকল্প রূপ। যেন এক অতল সুধাসমুদ্রে ডুব দিয়ে আছেন!

যে অবনীন্দ্রনাথকে এত ভয় পেতেন রানী ('শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ'), তিনিই আঁকলেন মহাকালের জন্য তাঁর সবসেরা ছবি, তাঁর স্ফটিক-স্বচ্ছ আপন-কথার সুরা রানী চন্দ ছাড়া আর কে ধরতে পারতেন অঞ্জলিতে?

'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪)-র মুখবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> যত সুখের স্মৃতি তত দুঃখের স্মৃতি— আমার মনের এই দুই তারে ঘা দিয়ে এই সব কথা আমার শ্রুতিধরী শ্রীমতি রানী চন্দ এই লেখায় ধরে নিয়েছেন। মুখের কথা লেখার টানে ধরা সহজ নয়, প্রায় বাতাসে ফাঁদ পাতার মতো কঠিন ব্যাপার।

রানী চন্দ 'ঘরোয়া' (১৯৪১)-র ভূমিকায় লিখেছেন, '(ওঁর) কথা বলার ভঙ্গি যে না দেখেছে, ভাষা যে না শুনেছে, সে তা বুঝবে না; লিখে তা বোঝানো অসম্ভব।' তিনি যখন অবসর-সময়ে লিখে রাখা অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া কথাগুলো রবীন্দ্রনাথকে দেখালেন, তিনি বললেন, 'এ অতি সুন্দর হয়েছে। অবন কথা কইছে, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি। কথার একটানা স্রোত বয়ে চলেছে— এতে হাত দেওয়ার জায়গা নেই। যেমন আছে তেমনিই থাক।' 'ঘরোয়া'-র শেষ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

> সেই ছেলেবেলা কবে কোন্‌কালে দেখেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নীলে সাদায় নক্‌শা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গা-ময় ফুটো, উপরে টানিয়ে রাখত। ভিতরে চোঙের মতো একটা কী ছিল তাতে খাবার দেওয়া হত। পাখিরা সেই ফুটো দিয়ে আসত, খাবার খেয়ে আর এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেত। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষের মনও তাই। স্মৃতির প্রকাণ্ড জালা, তাতে অনেক ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে স্মৃতি ঢুকছে আর বের হচ্ছে। জালা খুলে বসে আছি, কতক বেরিয়ে গেছে কতক রয়েছে মনের ভিতর, ঠোকরাচ্ছে তো ঠোকরাচ্ছেই, এ না হলে হয় না আবার। আর্টেরও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাই।... হিসেব থাকে না মনের ভিতরে ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়, থাকে গল্প।

গল্প বলার সাবলীলতায় অবন ঠাকুর রাজা। কথার ছবি আর ফুলঝুরি সন্ধ্যারাগে গিয়েছে মিশে।

সন্ধে হতে ঝড়জল আরম্ভ হল। সে কী জল, কী ঝড়! হাওয়ার ঠেলায় জোড়াসাঁকোর তেতলা বাড়ি যেন কাঁপছে... এক কোণে আমাকে নিয়ে আমার পদ্মদাসী কটর কটর কলাইভাজা চিবোচ্ছে, আমাকেও দু'-একটা দিচ্ছে আর ঘুম পাড়াচ্ছে, চুপি চুপি ছড়া কাটছে— ঘুমতা ঘুমায়; গাল চাপড়াচ্ছে আমার, পা নাচাচ্ছে নিজের ছড়া কাটার তালে তালে।...

ফুটো ছাত, ভাতে ভাত,
ভাজ্ মাছ।

সাত রাত সাত দিন ঝমাঝম্। মটর ভাজি কড়াই ভাজি ভিজে ছাতি। যে দিকে চাও ভিজে শাড়ি ভিজে কাপড় পরদা টেনে হাওয়ায় দুলছে, তারই তলায় তলায় খেলে বেড়ানো সারাদিন। সন্ধে থেকে কোলা ব্যাঙে বাদ্যি বাজায়, রাজ্যের মশা ঘরে সেঁধোয় টাকাংদিং টাকাংদিং মশারি ঘিরে।

...বেহালা যেন সুরে এক দুই মুখস্থ করছে; এই, দুই, তিন, চার; এক, দুই, তিন, চার।... ভোরবেলা বাড়ির সামনে ঘোড়ার মলে টপ্ টপ্ ঠপ্ ঠপ্।

ধ্বনির রং তাঁকে টানে। শিশুবোধকে পড়া 'কুরুবা কুরুবা কুরুবা লিজ্জে' এত ভাল লেগেছিল তাঁর যে অবনীন্দ্রনাথ যাত্রায় ছাগলের মুখে সেই গান জুড়ে দিয়েছিলেন।

ধ্বনির ছবির পাশাপাশি ছবির তুলিটান। যা শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যেমন অনায়াসে পেরেছেন আর কেউ পেরেছেন কি না বলা যাবে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্দিবুড়ি আসত রাত্রে, সে যা চেহারা তার— কপালজোড়া সিঁদুর, লাল টকটক করছে। গোল এত্ত বড় মুখোশের মতো মুখ, যেন আহ্লাদী পুতুলকে কেউ কালি মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। দেখতে যদি তাকে রাত্তিরবেলা!... তুমি তো অন্ধকার রাত্রে রাস্তায় ভূতের ভয় পাও; আমার পদ্মদাসী আর আন্দিবুড়িকে দেখলে কী করতে জানিনে।... আন্দিবুড়ি ছিল কালোরঙের আহ্লাদী পুতুল, আর পদ্মদাসী ছিল যে আগুনে ঝলসানো পদ্মফুল।

('জোড়াসাঁকোর ধারে')

আলোর কাছে বসে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পদ্মদাসী মস্ত একটি রূপোর ঝিনুক আর গরম দুধের বাটি নিয়ে দুধ জুড়োতে বসে গেছে— তুলছে আর ঢালছে সে তপ্ত দুধ। দাসীর কালো হাত দুধ জুড়োবার ছন্দে উঠছে নামছে, নামছে উঠছে। চারদিক সুনসান, কেবলই দুধের ধারা পড়ার শব্দ শুনছি।

('আপন কথা')

তারপর যেদিন লাগল দাসীতে-দাসীতে ঝগড়া, মোটাসোটা ফরসা চাকরানির সঙ্গে পদ্মদাসীর। সিঁদুর পরা ভৈরবী মূর্তি পদ্মদাসীর কপালে লাগানো হল ছেঁড়া কাপড়ের সাদা পটি, ছোট্ট অবন সিঁড়ির ধারে সেই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল: 'মারলে, আমার দাসীকে মারলে!' সেই তার শেষ দেখা দাসীর সঙ্গে। বেমানান নামের সেই দাসী রাগ করেছে, গল্প করেছে, ঝগড়া করেছে, কাজ করেছে, তারপর মানুষ করার বকশিশ সোনার বিছে হার আর রক্তের টিপ পরে চলেও গিয়েছে বহু দিন। তারপর বহু বছরের ওধারে বসে সে আজও দুধ ঢালছে আর তুলছে অবনীন্দ্রনাথের জন্যে!...

তাঁর স্মৃতিকথাগুলো যেন আলিবাবার গুহার সন্ধানে কলম-তুলির খেলা। সেখানে নুড়ি ছোঁয়ালে লোহার গায়ে ধরবে সোনা! অবনীন্দ্রনাথ শুধু তাঁদের জন্য গল্প বলেন যারা বেচা-কেনার ধাপ ধারে না, হামাগুড়ি দিয়ে অথবা কাঠের ঘোড়ায় চড়ে গুহার কপাট-আগলানো দৈত্যকে জাগিয়ে বলে, 'ওপুন চিসম্'— চশমা খোলো। যারা কুড়িয়ে পাওয়া পুরনো পিদুম ঘষে ঘষে খইয়ে ফেলে, অথচ ছাড়ে না কিছুতে সাত রাজার ধন মানিকের আশা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কালোজামের বিচি পেটে গেলেই সর্বনাশ, মাথা ফুঁড়ে মস্ত জামগাছ বেরিয়ে পড়বে। আর কাগ এসে চোখ দু'টোকে কালোজাম ভেবে ঠুকরে খাবে! আর সবচেয়ে ভয়ের কথা, একটা মাটির নল বেয়ে দু'নম্বর বাড়ির ময়লা জল পড়ে যেখানে দেওয়ালটা সোঁতা আর কালো হয়ে গিয়েছে, তারই কাছে আড়াই হাত ফোকরে থাকে কন্ধকাটা, যার পেটটা থেকে থেকে অন্ধকারে হাঁ করে আর ঢোঁক গেলে। যার চোখ নেই, কিন্তু মস্ত কাঁকড়ার মতো হাত দু'টো পরিষ্কার দেখতে পায় শিকার।

আর আছে গঙ্গার ধারে মড়ার খুলি নিয়ে খেলা:

> ঈশ্বর বলেন, 'ছুঁয়ো-টুয়ো না ভাই, ওসব।' আমরা একটা ডাল বা কঞ্চি নিয়ে খুলিগুলিকে ঠেলতে ঠেলতে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে বলি, 'যা, উদ্ধার পেয়ে গেলি।' ওই ছিল এক খেলা।

আর অবন ঠাকুরের কথার জলছবি? তা তো প্রতিটি পৃষ্ঠার ইজেলে।

> একটি গোলাপি ডাঁটার উপর টিউলিপ ফুল, ফুলে শিশির পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা, দু' পাশে দু'টি সোনালি পাতা উঠে দু'দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।
>
> ...মা চুল বাঁধতে বসতেন, টিউলিপ ফুলের ছায়া আর মা'র মুখের ছায়া এই দু'টি ছায়া পড়ত আয়নাতে। এখনও দেখতে পাই সেই ছবি। সোনালি পাতা দুটি এখনও তেমনি ঝকঝক করছে।

অবনীন্দ্রনাথের সরস বৈঠকী বর্ণনার জোড়াসাঁকোর মতো জুঁই আর বেলফুলের গন্ধে সমস্ত স্মৃতিকথাই তর্ হয়ে আছে। লেখার সময়ও 'যে খাতার সঙ্গে ভাব হল না, তার পাতায় ভাল লেখাও চলল না। এই খাতাটা অনেক দিন কাছে কাছে রয়েছে, ভাব হয়ে গেল এটার সঙ্গে। ভাব হল যে মানুষের সঙ্গে কেবল তাকেই বলা চলল নিজের কথা সুখ-দুঃখের।' ('আপন কথা')

এক টুকরো গৃহকোণ থেকে দেখা ইতিহাস যেভাবে চিত্ররেখার ডোরে বাঁধা পড়েছে, বাংলায় ক'বার তা হয়েছে বলতে পারবে কে? যখন বলেন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ছাতের কাছেই আলসের কোণে দুটো নীল পায়রা থাকে জানি, আলো হলেই তারা দু'জনে পড়া মুখস্থ করে— পাক্‌পাখম্‌.... মেজদি সেজদি...', তখন সাতরঙা রামধনুক ওঠে আমাদের মরা গাঙের আকাশপারে। অবন লেখেন, 'দরজা খোলা, বর্ষাকাল, একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে; হাত মুখ ধুতে ধুতে দেখতুম সেখান থেকে, রবিকার ঘরে উপরে একটি তাকে বাতি জ্বলছে, ঠিক যেন শুকতারাটি জ্বলজ্বল করছে; মনে হত সমস্ত শান্তিনিকেতনের উপর যেন আকাশপ্রদীপ জ্বলছে...' ('জোড়াসাঁকোর ধারে')

ভূতের গল্পও বলেন এমন রাখালিয়া রসিকতার সুরে যা অবনীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব। পুরী থেকে পালকি করে কোনারক চলেছেন। থেকে থেকে ধপাস ধপাস শব্দ। বেহারাদের আট-দশটা পা পড়ছে বালিতে।

> এক জায়গায় শুনি ঝপ ঝপ ঝপ ঝপ শব্দ।
> 'কী হল রে?'
> 'বাবু, নিয়াখিয়া নদী আসি গেলাম।'
> এমন সময় দেখি, একটা লোক, একহাতে লাঠি একহাতে লণ্ঠন, চলেছে আমার পালকির খোলা দরজার পাশে পাশে।
> বলি, 'ও বেহারা, এ কে রে?'
> 'আঃ বাবু, ও দিকে দেখো না, ও-সব দেউতা আছে।' বলে ওদিকের দরজা বন্ধ করে দিলে।
> দেউতা বলে ওরা ভূতকে। বলি, 'ও কী, লণ্ঠন হাতে দেউতা কি রে!'
> ('জোড়াসাঁকোর ধারে')

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, রবিকা বলতেন, 'অবন একটা পাগলা।' সেকথা সত্যি। আমিও এক-একসময় ভাবি কী জানি কোনদিন হয়তো সত্যিই খেপে যাব'। সে যেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-র তিনকড়ি।

'লিপিকা'-র গদ্যের চেয়ে কম রূপ-বিভা নেই এই কথার ঝরনার। কারণ তা জীবন্ত, কারণ তা সাগরবেলায় ঝিনুকের স্বপ্নাবগুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে দুরন্ত শিশুর মতো পালায়। এসরাজ শিখেছিলেন, এসরাজের ওপর ঝিলিমিলি হাওয়ার মতো খেলা করে তার আঙুল। কখন নীরবে ধ্বনির সুষমার সঙ্গে মিশে যায় এক কান্নার মূর্ছনা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> এক বুড়ো ইটালিয়ান মিউজ়িক মাস্টার আর তার মেয়ে।... সুর ভেসে আসে, উপরে বসে আমি সেই বিলিতি সুর শুনি আর ছবি আঁকি। একদিন সকালে রোজকার মতো ছবি আঁকছি, নীচে থেকে বেহালার সুর এল কানে, উদাস করে দিলে।... সুর তো নয় যেন বেহালাটা কাঁদছে। সেদিন সে সুর স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, বেহালার ছড়ি বেহালার তার আর যে বাজাচ্ছে তারও মানসতন্ত্রী এক হয়ে গেছে। আজ আর পিয়ানো নেই সঙ্গে। গিলার্ডিকে বললুম, 'সাহেব, আজ বেহালা যেন কাঁদছে মনে হচ্ছে, কেন বলো তো?' সাহেব বললেন, 'চুপ, চুপ, জানো না বুড়োটির মেয়ে কাল চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে?' সেদিন আর ছবি আঁকা হল না আমার। বুঝেছিলুম সেদিন, মনে ধরল আজ সুরের আগুন। অন্তত বাজে তো যন্তর বাজে।

একটু আগেই রানীকে বলেছিলেন:

> ছবিটি আঁকি, তুলিটি জলে ডোবাই, রঙে ডোবাই, মনে ডোবাই, তবে লিখি ছবিটি। সেই ছবিই হয় মাস্টারপিস। অবিশ্যি, সব ছবি আঁকতে যে এভাবে চলি তা নয়। জলে ডুবিয়ে রঙে ডুবিয়ে অনেক ছবির কাজ সেরে দিই, মন পড়ে থাকল বাদ। এমন ছবি একটা এঁকে যদি ছিঁড়ে ফেলতে যাই, তোমরা খপ্ করে হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে পালাও। ঠকে যাও জেনো।

'সাজাহানের মৃত্যু'-র চিত্রকর তাঁর এই ভুবন-ভোলানো আলাপচারিতায় মনে করিয়ে দিয়েছেন: শেষ পেয়ালার ফোঁটা ফোঁটা যে তলানিটুকু, সেখানেই সব রস জমা হয়ে আছে।

জোড়াসাঁকোর স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যায়, মন চায় বাড়ি ফিরতে, বোঝা বাঁধাছাঁদা করে। স্বপ্নে দ্যাখে বহুকাল আগের ছেড়ে-আসা বাড়ি-ঘর ঘাট মাঠ গাছ। 'জোড়াসাঁকোর ধারে'-র কথকতা শেষ করেন এইভাবে:

> তারপর সবশেষে প্রকৃতিমাতা দেখা দেন নিশাপরীর মতো। নীল ডানায় ঢাকা আকাশ, ঘরের সন্ধ্যাপ্রদীপ ধরে একটুখানি আলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই হল শিল্পীর জীবনের ধারার একটু ইতিহাস। শুধুই উজানভাঁটির খেলা।... আমারও যাবার সময় যা দু'ধারে ছড়িয়ে দিয়ে গেলুম তোমরা তা থেকে দেখতে পাবে, জানতে পাবে, কত ঘাটে ঠেকেছি, কত পথে চলেছি, কী সংগ্রহ করেছি ও সংগ্রহের শেষে নিজে কী বকশিশ পেয়ে গেছি।

এতকাল চলার পরে বকশিশ পেলুম আমি তিন রঙের তিন ফোঁটা মধু।

৭ অগাস্ট ছিল তাঁর জন্মদিন। এই পোড়ারমুখো দেশে হয়তো তাঁর রবিকা-র মৃত্যুদিনের কথা দৈবাৎ আমাদের মনে আছে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন? আজ ভোররাতে ইতিহাসে উপেক্ষিতা একটি মেয়েকে বলা স্মৃতিকথা থেকে আমার অঞ্জলিতে ঝরে পড়ল তিন ফোঁটা মধু!

১৭ অগাস্ট ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৬

প্যারিসের পিগাল অঞ্চলে প্রবল হইচই আর নাচগান হচ্ছে। লম্বা মুখ, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতার একটি লোককে মদ দিয়ে স্নান করানো হচ্ছে। সঙ্গে আরেকটি পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি মাপের লোককেও। কালো-সাদা ছবিগুলো হঠাৎ ফ্রিজ় হয়ে গেল।

এবার বুঝলাম বন্ধুদ্বয় গিয়োম আপোলিনের এবং পাবলো পিকাসো। একটু আগে প্যারিসের তরুণ শিল্পীরা তাঁদের পুলিশের হেফাজত থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। অভিযোগ ছিল লুভ্‌র্ মিউজ়িয়াম থেকে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-র 'মোনা লিসা' ছবিটি চুরি যাওয়ার নেপথ্যে না কি এঁদের হাত আছে! আপোলিনের না কি ছবি চুরির পাণ্ডা! লুভ্‌র্ সংগ্রহশালা উড়িয়ে দেওয়ার কথা বললেও সত্যি তেমন অপরাধ তরুণ কবিটির পক্ষে অকল্পনীয় ছিল! ১৯১১ সালের ২১ অগাস্ট 'মোনা লিসা' অদৃশ্য হওয়ার পর সারা দেশ জুড়ে চেঁচামেচি শুরু হয়। সাত দিন পর জেরি পিয়েরে বলে এক বেলজিয়ান ছোকরা জানায়, সে লুভ্‌র্ থেকে একটি আইবেরিয় মূর্তি চুরি করেছে, কাজটি মোটেই শক্ত ছিল না।

আপোলিনের আবিষ্কার করেন সেই বেলজিয়ান তরুণ তাঁর সহকারী থাকাকালীন বেশ কিছু মূর্তি এনে হাজির করে। আপোলিনের ও পিকাসো আগ বাড়িয়ে সেই দুষ্কর্মের কথা পুলিশকে জানানোয় উলটো বিপত্তি হল। পুলিশ তাঁদের দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ভয়ে কম্পমান পিকাসো দেখেন ফ্যাকাসে, দাড়ি-না-কামানো, কলার-ছেঁড়া আপোলিনেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপোলিনের না কি 'মিউজ়িয়াম নষ্ট করতে আসা এক আন্তর্জাতিক চক্রের নেতা'! শেষ পর্যন্ত কোনওক্রমে তাঁরা উদ্ধার পান।

কিছু কিছু লোক যেন ঝড়! যেখানেই যায় একটা হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেয়। ওই লোকটাও সেইরকম। ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসে ওঁর আবির্ভাব কতকটা ধূমকেতুর মতো উনি না এলে যে কী হত! গিয়োম আপোলিনের (১৮৮০-১৯১৮) নামে প্যারিসের শিল্পী-সাহিত্যিকরা এক ডাকে তাঁকে চিনলেও তাঁর আসল নাম নাকি উইলহেল্‌ম্‌ অ্যালবার্ট ভ্লদজিমিয়েরজ্‌ আপোলিনারিস ফন কস্ত্রভিৎস্কি! অন্যরকম নামও শোনা গিয়েছে।

জন্ম ১৮৮০ সালের ২৬ অগাস্ট, রোমে। পোলিশ, ইতালীয় ও ফরাসিভাষী। মা আঞ্জেলিকা কস্ত্রাভিকা ছিলেন এক অভিজাত পোলিশ রমণী। তিনি নাকি কাসিনো-তে গিয়ে সমস্ত ধনসম্পত্তি উড়িয়ে দেন। ছেলেটির বাবা কে তা স্পষ্ট নয়। গবেষকরা অবশ্য মনে করেন তাঁর পিতা জনৈক ইতালিয় অফিসার।

সব পরীক্ষায় সব বিষয়ে প্রথম।

রেজ়াল্ট দেখলে প্রায় ভয় করে।

নিস, কান এবং মনাকো-তে বসবাসের পর, কুড়ি বছর বয়স হওয়ার আগেই, জার্মানিতে কিছু দিন কাটিয়ে তিনি আধুনিকতার স্বর্গভূমি প্যারিসে এসে হাজির। তখন সেখানে চিত্রশিল্পে কিউবিজ়ম-এর অভ্যুদয় হয়েছে। তরুণটি পোলিশ নাম কেটেকুটে নিজের নাম রাখলেন গিয়োম আপোলিনের। আপোলিনারিস নামটা তাঁর আগেই ছিল, সেটি কবিতার দেবতা 'আপোলো' থেকে এসেছে।

এক দশকের মধ্যেই প্যারিসের তামাম লেখক-শিল্পীরা তাঁকে জানবে বিশ শতকের ফরাসি কবিতায় আধুনিকতার উদ্ভাবক হিসেবে। নতুন মানসিকতা ('L esprit nouveau')-র পতাকা তাঁর হাতে। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হবে তাঁর চোদ্দো বছর ধরে লেখা কবিতার সংকলন 'Alcools' (সুরা), যা হয়ে উঠবে নতুন কবিতার বিজয়-তোরণ! কিন্তু কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং 'স্যুররেয়ালিস্ত্‌' শব্দটির স্রষ্টা হিসেবে তাঁর বিস্ফোরক আবির্ভাবের আগে চিত্র-সমালোচক হিসেবে তিনি অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন। পিকাসোর 'ব্লু পিরিয়ড'-এর সবচেয়ে মরমী উপস্থাপক তিনি।

এই মুহূর্তে সাক্রে-কর গির্জার পেছনে মোঁমার্ত্র-এর ছোট্ট গ্রামটিতে নরক গুলজার হচ্ছে। করছেন প্রধানত আপোলিনের, ব্লেজ় সাঁদ্রার্স, পিকাসো, আঁরি রুসো, জর্জ ব্রাক, মাক্স জাকব, আঁরি মাতিস, জাঁ মেৎসিঙ্গার, এরিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সাতি, আঁদ্রে ব্রতঁ, পল গোর্দো আর আঁদ্রে বিলি। অনেকেরই হাতে বিষাক্ত পানীয় আবস্যাঁৎ।

ক'জন জানে যে আপোলিনের ছাড়া কিউবিজ্‌মের তাত্ত্বিক সমর্থন জোগাড় করা দুঃসাধ্য হত? ক্ষুরধার, বহুভাষাভাষী আপোলিনের যেন আধুনিক শিল্পভাবনার দেবদূত। তিনি মধ্যরাতে নাটকীয় ভঙ্গিতে একটি শারীরিক প্রেমের উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছেন। উপন্যাসের উদ্দাম অংশগুলির জন্য তিনি মার্কি দ্য সাদ-এর কাছে ঋণ স্বীকার করলেন। পড়া হয়ে গেলে পাণ্ডুলিপিটি ছুড়ে দিলেন পিকাসোর দিকে। শিল্পী ও প্রেমিকা মারি লোরাস্যাঁ-র আপত্তি সত্ত্বেও। অতঃপর কবিতা পড়ার আহ্বান এল। আপোলিনের পড়ছেন:

নামহীন

স্বপ্ন দেখলাম আমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাচ্ছি
তুমি আসোনি কিন্তু তোমার হাসির শব্দ শোনা গেল
তোমার ঠোঁট রক্তপায়ী বাদুড়ের
আমার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে লাল লাল কফিন
আর আমি মরে যাচ্ছি তোমার হাসি শুনতে শুনতে

দ্বীপের ধারে

দ্বীপের ধারে
শূন্য নৌকাগুলি পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে
আর আজ
না রোববার না সপ্তাহের অন্য কোনও দিন
একজন শিল্পীও সেখানে বেড়াচ্ছেন না, এমনকী মপাসাঁও নন
হাতকাটা জামা পড়ে তাঁর নৌকায়
উঁচু-বুক নির্বোধ মেয়েদের সঙ্গে
ডিঙি নৌকোরা তোমরা আমায় গভীর দুঃখ দিলে
দ্বীপের ধারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাউই-সংকেত

নিভৃত রাত্রিতে গ্রামগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছিল
একজন চাষি মোটরগাড়ি চালিয়ে গ্যালভেস্টনের দিকে চলে যায়
কে ছুঁড়ে দিয়েছে ওই হাউই-সংকেত

যাই হোক দরজাটা তুমি খুলে রাখলেই পারো
আর তারপর বাতাস কাঠ চেরাই করা করাতির মতো
তোমার মধ্যে জাগিয়ে তুলবে ভূতের আতঙ্ক
তোমার জিব
তোমার কণ্ঠস্বরের কাচের বয়ামে
লাল মাছ
অথচ এই অনুশোচনা
প্রায় যেন চোখ ধাঁধানো শীতের চেয়েও সাদা এক নার্স
যখন দূরের পাহাড়গুলির চেয়েও নীল আর মোটর গাড়ির
গদি যতটা নরম হতে পারে
তার চেয়েও নরম দিনের একটা পল্টন
দিগন্তে ছোট হতে হতে মিলিয়ে যায়

(অনু: পুষ্কর দাশগুপ্ত)

ইসপাহান

...যে গাধাগুলো
সাদা ছাতার নিচে বসা
দাড়িওয়ালা তরুণ বণিকদের মতো দেখতে
ওই সূর্যের
মেহেদি রাঙানো দাড়ির দিকে তাকিয়ে
এমন চমৎকার ডেকে উঠতে পারে

এখানে আমি রয়েছি পপলার গাছগুলির সহোদর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইওরোপের সন্তান ওই পপলার গাছগুলিকে চিনে নাও
হে আমার শিহরিত সহোদররা এশিয়ার বুকে তোমরা যারা প্রার্থনা করছ

বল্গাহরিণের শিঙের মতো বেঁকে যাওয়া এক পথিক
কলের গান
আঁকিবুকি
ছোট্ট একটি দোকান

(অনু: পুষ্কর দাশগুপ্ত)

বিশ শতকের গোড়ায় দ্বিতীয় দশকের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে মডার্নিজ়ম-এর তুঙ্গমুহূর্তে ছবি, কবিতা, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র মিলেমিশে গিয়েছিল। রনেসাঁসের পর এর আগে কোনও শতাব্দীতে এমন সৃজনশীল অন্তঃসংযোগ আর ঘটেনি কখনও। মডার্নিজ়মে এই দিগন্তমিলন (horizontverschmelzung) তার প্রবল শক্তির দিক, যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংকট-মুহূর্তে দেশ ও জাতির সীমারেখা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, শিল্পসাহিত্যের অন্তর্বর্তী দেয়ালগুলো মুছে যাচ্ছিল। শুধু চিত্রশিল্পের নতুন আবিষ্কারগুলো নয়, নির্বাক ছবি ব্লেজ় সাঁদ্রার্স্ ও আপোলিনের-কে আলোড়িত করছিল, চলচ্চিত্রের একটির পর একটি চলমান ফ্রেম কবিতার পুনর্ভাবনায় সাহায্য করছিল। সাঁদ্রার্স্ আর আপোলিনের এর পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছিলেন। দুঃসাহসিকতায় আপোলিনের কিউবিস্ট চিত্রশিল্পীদের চেয়ে কম নন।

এলাকা

...ওরা প্রত্যেকে এমনকী ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে কুচ্ছিৎ দেখতে সেও
তার প্রেমিককে ভুগিয়েছে অনেক যন্ত্রণায়

জার্সি দ্বীপের এক দারোগা ওর বাবা

ওর যে হাতগুলো আমি দেখিনি সেগুলো শক্ত আর ফুটিফাটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওর পেটের কাটা কাটা দাগগুলোর জন্য ওর ওপর আমার দারুণ করুণা
হয়
বীভৎস হি হি হাসির হতভাগা একটি মেয়ের দিকে আমি এখন
আমার মুখ নামাই
তুমি একা ভোর হয়ে এল বলে
রাস্তায় রাস্তায় দুধওয়ালারা তাদের দুধের পাত্রের টুংটাং আওয়াজ তোলে

দো-আঁশলা রূপসী মেয়েটির মতোই রাত্রি দূরে মিলিয়ে যায়...
ওরা সব অন্য এক চেহারার অন্য এক বিশ্বাসের খ্রিস্ট
ওরা হল অন্ধকার আশার নিকৃষ্ট খ্রিস্ট

বিদায় বিদায়

কাটামুণ্ড সূর্য

(অনু: পুষ্কর দাশগুপ্ত)

চলচ্চিত্র যেন একটি অ্যালবাম, যা কবিতাকে দেবে দুর্ধর্ষ দু'টি ডানা। আঁদ্রে ব্রতঁ, ফিলিপ সুপো, লুই আরাগঁ-র মতো তরুণ কবিরা আপোলিনেরের কাছে শিখলেন ছবি-আঁকার খেলা। গীতিময় ফ্যান্টাসি, হাস্যরস এবং অবাধ কল্পনাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক আগ্রাসী রাব্‌লেজীয় জীবনবাদিতা, যার স্বাক্ষর তাঁর প্রতিটি রচনায়, এমনকী যৌন-উপন্যাসগুলোতেও। দুঃসাহসিকতা, চমক (যার সঙ্গে কিউবিস্ট ছবির মিল) এবং বিষণ্ণতার এ এক ব্যতিক্রমী সহাবস্থান। ছোট ছোট কাহিনি হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন মিথ। আবিষ্কার ও ঐতিহ্যের মাঝখানে তিনি যেন এক স্বপ্ন-সেতু!

কেউ কেউ মনে করেন আপোলিনেরের গুরুত্ব প্রায় শার্ল বোদল্যেরের সমান, কারণ নতুন করে তিনি বদলে দিলেন দেখার দৃষ্টি। এক বিখ্যাত চিঠিতে র‍্যাঁবো বোদল্যের-কে 'কবিদের রাজা— প্রথম দ্রষ্টা' বলে অভিহিত করলেও তাঁর 'সেকেলে' আঙ্গিকের যে সমালোচনা করেন তা আপোলিনেরের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়। কবি যে আঙ্গিক নিয়ে যা ইচ্ছে তা করতে পারেন আপোলিনেরের 'কালিগ্রাম' গত একশো বছরে তার অন্যতম সেরা উদাহরণ,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মৃত্যুর কয়েক মাস আগে প্রকাশিত সেই কাব্যগ্রন্থে কবিতা কখনও হয়ে ওঠে বৃষ্টির মতো, কখনও মোমবাতির আগুনে পুড়ে যায় কবিতার পৃষ্ঠা।

ভাষার নানা পর্বাঙ্গের রহস্যময়তা নিয়ে যথেচ্ছাচার যেন আপোলিনেরের জীবন থেকে নিঃসৃত। তাঁর রহস্যময় জন্মসূত্রের মতো অনিশ্চয়তা-ই যেন তাঁর জীবনের মোক্ষ। একটির-পর-একটি নারীর প্রেমে পড়েছেন, ইংরেজ নারী অ্যানি প্লেডেন, লুইজ় দ্য কোলিনই-শাতিয়ঁ (যিনি আপোলিনেরের কবিতায় ও চিঠিপত্রে 'লু' নামে পরিচিত), মাদলেন পাজেস...। অবশেষে মৃত্যুর বছর (১৯১৮) 'লালচুল সুন্দরী' কবিতার নায়িকা জাকলিন কোল্‌ব্‌-কে যখন বিয়ে করলেন, স্প্যানিস ফ্লু-তে মৃত্যু সমাসন্ন। বিয়ের সময়ে সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস গির্জায় বরকর্তা বা 'বেস্ট ম্যান' ছিলেন বন্ধু পাবলো পিকাসো। একইভাবে দু' মাস দশ দিন পর পিকাসোর সঙ্গে অলগা'র বিয়েতে 'বেস্ট ম্যান' ছিলেন আপোলিনের!

১৯১৪ সালের অগাস্টে ফরাসি সেনাবাহিনীতে নাম লেখানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু জাতে ফরাসি না-হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত হন। পরে ডিসেম্বরে আবার চেষ্টা করেন, এবার তাঁর আবেদন গৃহীত হয়। অতঃপর তিনি নাগরিকত্ব পেয়ে যান। ব্রিগেডিয়ার কবির কপালে গোলা লাগে ১৯১৬ সালের ১৭ মার্চ। খুলিতে অস্ত্রোপচার হয়। সেই অবস্থায় পল দেরমে-কে লেখা একটি চিঠিতে (মার্চ ১৯১৭) 'স্যুররেয়ালিজ়ম্‌' শব্দটি সৃষ্টি করেন এবং দীর্ঘ অসুস্থতার পর 'টাইরেসিয়াসের স্তন' নাটকটি লেখেন, যার উপ-শিরোনাম ছিল 'দুই অঙ্কে স্যুররেয়ালিস্ত নাটক ও একটি মুখবন্ধ।'

সেই মুখবন্ধে আপোলিনের লেখেন:

> মানুষ যখন হাঁটাকে নকল করল সে চাকা তৈরি করল। চাকার সঙ্গে পায়ের কোনও মিল নেই। না জেনে এইভাবে সে স্যুররেয়ালিস্‌ম্‌ সৃষ্টি করল। থিয়েটার আর জীবন হুবহু এক নয়, যেমন চাকা আর পা।

শিল্প-সাহিত্যের স্নায়ুকেন্দ্রে 'মাকড়সার জালের মতো' বিরাজমান আপোলিনের হয়ে উঠেছিলেন নতুন যুগের মুখপাত্র। অথচ কোনও আন্দোলনে তিনি নাম লেখাননি, 'ঐতিহ্যবিরোধী ভবিষ্যৎবাদী' হিসেবে পাঠককে উত্তেজিত করেছেন, কিন্তু নিজে তকমাহীন থেকেছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পিকাসো তাঁর বাড়ি (ভিলা বিয়ারিৎস) সাজিয়ে ছিলেন আপোলিনেরের কবিতা দিয়ে। ৯ নভেম্বর ১৯১৮ যখন স্প্যানিশ ফ্লু-তে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে, পিকাসো তখন বাথরুমে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। আয়নায় নিজের বীভৎস বিষাদাক্রান্ত মুখ দেখেন তিনি। এরপর কুড়ি বছর তিনি আত্মপ্রতিকৃতি আঁকেননি।

অনেক সাদা-কালো ছবি। একের পর এক।

মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা মূর্তি।

প্যারিসে ২০২, বুলভার স্যাঁ-জেরম্যাঁ-র সামনে কফিনে শায়িত ফুলে ঢাকা এক ভিনদেশি। নাম যাঁর কস্ত্রভিৎস্কি। বয়স আটতিরিশ।

অবশেষে সেকেলে এই জগৎটা ক্লান্ত করছে তোমাকে
মেষপালক হে আইফেল টাওয়ার আজ ভোরে সেতুর পাল ব্যা ব্যা করে ডাকে
গ্রিস আর রোমের প্রাচীনতায় বেঁচে থাকার সাধ তোমার মিটেছে
(অনু: পুষ্কর দাশগুপ্ত)

৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৭

Memory of you is...a blue spear of flower.

ভোররাতে ঘড়াং করে আওয়াজ করে দুধের গাড়িটি দাঁড়াল। একটি সতেরো-আঠেরো বছরের ছেলে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনে দুধের বোতল রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়িটি দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পর দেখি রাস্তায় একটি প্ল্যাকার্ডে লেখা গেল্‌সবার্গ, ইলিনয়।

ছেলেটিকে ইউনিয়ন হোটেলের চুল কাটার সেলুনে কাজ করতে দেখেছি। একমনে ইট বসিয়ে পাঁচিল তৈরি করতে দেখেছি, গমের কলে গম পিষতে দেখেছি।

সে সুইডেন থেকে আসা অগাস্ট আর ক্লারা অ্যান্ডারসন স্যান্ডবার্গের ছেলে। সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। শিকাগোর কাছে বার্লিংটন আর কুইন্‌সি-র রেল-রাস্তায় এক কামারের সহকারী তার বাবা। গেল্‌সবার্গের ৩১৩ ইস্ট থার্ড স্ট্রিটে তিন কামরার কুঁড়েঘরে ছেলেটির জন্ম। নাম: কার্ল স্যান্ডবার্গ (১৮৭৮-১৯৬৭)। একদিন গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হয়ে উঠবে সে। কবি, জীবনীকার, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, সংগীতকার। 'Death was in the air./So was birth.' (The People, Yes)

At a Window

Give me hunger,
O you gods that sit and give
The world its orders.
Give me hunger, pain and want,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Shut me out with shame and failure
From your doors of gold and fame,
Give me your shabbiest, weariest hunger!

But leave me a little love,
A voice to speak to me in the day end,
A hand to touch me in the dark room
Breaking the long loneliness.

১৮৯১ সালে তেরো বছর বয়সে দারিদ্রের তাড়নায় ইস্কুল ছাড়তে হল। দুধের গাড়ি চালাতে শুরু করলেন কার্ল। দুধ সরবরাহ, বাসন ধোয়া, বরফ-কলে কাজ করা, রাজমিস্ত্রির কাজ, গম পেষার কাজ ছাড়াও জীবিকা অর্জনের জন্য জুতো পালিশ পর্যন্ত করতে হয়েছে তাঁকে।

১৮৯৮ সালে যখন স্পেনীয়-মার্কিন যুদ্ধ শুরু হল কার্ল স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন তাতে। তাঁকে পাঠানো হল পুয়ের্তো রিকো-র গুয়েনিকায় ষষ্ঠ ইলিনয় ইনফ্যান্ট্রি-তে। সরাসরি যুদ্ধ অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে করতে হয়নি।

গেল্‌সবার্গে ফিরে এসে তিনি লমবার্ড কলেজে ভর্তি হলেন। ডিগ্রি না-পেয়ে ১৯০৩ সালে কলেজ ছেড়ে দিলেও, ওই কলেজ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কিন কবির সৃজন-বিস্ফোরণে সাহায্য করবে। সেখানেই অধ্যাপক ফিলিপ রাইটের সাক্ষাৎ পাবেন তিনি, যিনি তাঁকে কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ করবেন। এই মুক্তমনা লিবারাল মানুষটি স্যান্ডবার্গের জীবনের গতিপথ বদলে দিলেন। স্যান্ডবার্গ সমাজবাদী হয়ে উঠলেন, কবিতা ও সমাজ তো একই দর্শনের দুই পিঠ! রাইট-ই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'In Reckless Ecstasy'-সহ তিনটি কবিতার বই প্রকাশ করবেন।

এরপর মিলওয়াকি-তে চলে যাবেন স্যান্ডবার্গ, সেখানে 'সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'-র সদস্য হবেন তিনি।

মানুষের দুর্দশা তাঁকে রাজনীতির গভীরে নিয়ে যায়। ইস্তাহার বিলি করা থেকে সংগঠনের জন্য কাজ— কোনও কিছুই তিনি বাদ দেননি। পার্টি অফিসেই দেখা হয় জীবনসঙ্গিনী লিলিয়ানের সঙ্গে। অতঃপর আবার ফিরে আসেন ইলিনয়ে। তারপর ১৯১২ সাল থেকে শিকাগো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেখানে প্রকাশিত হবে আরেক আমেরিকান তরুণ টি এস এলিয়টের প্রথম কবিতা, সেই 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় ১৯১৪ সালে একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হবে স্যান্ডবার্গের। মুহূর্তের মধ্যে সারা দেশ চিনে ফেলে তাঁকে, শত্রুরা এবং মিত্ররা। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হবে 'শিকাগো পোয়েম্‌স', যা আধুনিক মার্কিন-কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

শিকাগো যেন এক চিৎকার, শিকাগো যেন স্বর্গ ও নরক। স্যান্ডবার্গের ভাষায়, 'Here is the difference between Dante, Milton, and me. They wrote about hell and never saw the place.' কবিতাগুলোতে ছিল এমন এক ধারালো, সজল ও আক্রমণাত্মক তীক্ষ্ণতা, সজীবতা আর ঝাঁজ, যা মার্কিন-কানে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঠেকেছিল, যেন তারা এরই জন্য বসেছিল এত দিন।

Fog

The fog comes
on little cat feet.

It sits looking
Over harbor and city
on silent haunches
and then moves on.

Chicago

Hog Butcher for the world,
Tool Maker, Stacker of wheat,
Player with Railroads and the Nation's Freight Handler;
Stormy, husky, brawling,
City of the Big Shoulders:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

They tell me you are wicked and I believe them, for
I have seen your painted women under the gas lamps
luring the farm boys.
And they tell me you are crooked and I answer: yes, it is
true I have seen the gunmen kill and go free to kill again.
And they tell me you are brutal and my reply is: On the
faces of women and children I have seen the
marks of wanton hunger...

Bones

Sling me under the sea.
Pack me down in the salt and wet.
No farmer's plow shall touch my bones.
No Hamlet hold my jaws and speak
How jokes are gone and empty is my mouth.
Long, green-eyed scavengers shall pick my eyes.
Purple fish play hide-and-seek,
And I shall be song of thunder, crash of sea,
Down on the floors of salt and wet.
Sling me...under the sea.

I Sang

I sang to you and the moon
But only the moon remembers...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯১৮ সালে প্রকাশিত হল 'Cornhuskers'। কিন্তু খ্যাতি তাঁকে মানুষের যন্ত্রণা থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। শিকাগোর রায়ট তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে। দুঃখী শিশুদের জন্য রূপকথা লিখেছেন ('রুটাব্যাগা-স্টোরিজ', 'রুটাব্যাগা পিজন্‌স'), ভাবালুতা বর্জন করে পুনর্নির্মিত অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের ছ'-খণ্ডে রচিত বিরাট জীবনীটির প্রথমটি ('অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন: দ্য প্রেরি ইয়ার্‌স্') তাঁকে দিয়েছে বিশিষ্টতা ও অর্থনৈতিক নিশ্চিন্ততা। ১৯৪৩ সালে লিঙ্কন-জীবনীর দ্বিতীয় ভাগের ('দ্য ওয়র ইয়ার্‌স') পর পেয়েছেন পুলিৎজার পুরস্কার। কাব্যসমগ্র বেরনোর পর আবার পুলিৎজার পেয়েছেন ১৯৫১ সালে। তিনিই একমাত্র কবি যাঁকে মার্কিন কংগ্রেসে আমন্ত্রণ করা হয়, যেন বহুমাত্রিক মার্কিন সমাজের প্রখরতম প্রতিনিধি তিনি।

'রিমেম্‌ব্র্যান্স রক' নামে (তাঁর লেখা উপন্যাস থেকে ওই নাম) একটি লাল গ্র্যানাইটের বোল্ডারের নীচে রাখা আছে তাঁর ভস্ম, তাঁর জন্মভিটের ঠিক পিছনে স্যান্ডবার্গের নামাঙ্কিত এক পার্কে।

মুক্তছন্দের এমন পরিমিত, ধারালো ব্যবহার দুর্লভ। যেন মুখের ভাষা মিশে গিয়েছে কবিতার ভাষার সঙ্গে। স্যান্ডবার্গের ভাষায়:

> Before men invented the alphabet, so that poems could be put down in writing, they spoke their poems. When one man spoke to another in a certain timebeat and rhythm, if it happened that his words conveyed certain impressions and moods to his listeners, he was delivering poetry to them, whether he knew it or they knew it...

তিনি যেন হুইটম্যানের উত্তরসূরি: 'I celebrate myself, and sing myself.'

কখনও তাঁর কবিতা (যেমন 'Fog') হয়ে ওঠে মুক্ত ও স্বাধীন আমেরিকান হাইকু। 'ইমেজিস্ট'-দের সঙ্গে (হিউম, পাউন্ড) তাঁর পরিচয় ছিল না, কিন্তু তিনি অজান্তে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। একটি বাড়তি শব্দ ছিল না তাঁর কবিতায়, না কোনও অনাবশ্যক অলংকার। তীব্র সমাজচেতনার সঙ্গে অপরূপ সহজতায় মিশে গিয়েছে 'শুদ্ধ' বাক্‌প্রতিমা। প্রতিবাদের অক্ষর যেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফুল হয়ে ঝরে পড়ে তাঁর কবিতার পায়ের কাছে। নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে আফ্রিকান-আমেরিকানদের কথা বলেছেন। কিন্তু কবিতা হয়ে থেকেছে অন্তবিহীন এক রহস্য, 'mystery without end'।

স্যান্ডবার্গ জানতেন: 'Poetry is an echo asking a shadow dancer to be a partner.' তিনি জানতেন: 'Poetry is the cipher key to the five mystic wishes packed in a hollow silver bullet fed to a flying fish.' 'Poetry is the opening and closing of a door, leaving those who look through to guess about what is seen during a moment.

কত-শত মাইল দূরে আমাদের হারিয়ে যাওয়া স্কুলবাড়ির ধোঁয়াটে করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই কবেকার লাইব্রেরি ঘরের ঘ্রাণ বুকে নিয়ে দেখি, হিম ছায়াভূমির ভেতর সামনে লাইব্রেরিয়ান অশোকবাবু একই ভঙ্গিতে বসে।

বললেন, 'পড়লে? কার্ল স্যান্ডবার্গের কবিতা?'

আমি ষোলো-সতেরো বছর বয়সের বিস্ময় ও অনিশ্চয়তায় মৃদু শিহরিত, যেন স্নায়ুতট বেয়ে সমাহিত নদীদের আলো মিশে যাচ্ছে শরীর-মাটির ঢেউয়ে, কোনও ধূসর স্মৃতি-প্রস্তরের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পড়ি:

Killers

I am singing to you,
Soft as a man with a dead child speaks,
Hard as a man in handcuffs,
Held where he cannot move.

Our Hells

Milton unlocked hell for us
and let us [illegible]
Dante [illegible] fire.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Each of these hells is special.
One is Milton's, one Dante's.
...If you unlock your hell for me
And I unlock my hell for you

They will be two special hells,
Each of us showing what for us
        is hell on earth.
Yours is one hell, mine another.

Offerings and Rebuff

I could love you
as dry roots love rain.
I could hold you
as branches in the wind
brandish petals.

Love is a fool star.

White shoulders

Your white shoulders
        I remember
And your shrug of laughter.

        Low laughter
Shaken slow
From your white shoulders

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'পোয়েট্রি' পত্রিকায় স্যান্ডবার্গের আত্মপ্রকাশের একশো বছর হল।

একশো বছর?

একশো!

দেখছি পাঁচিলে ইট বসাতে-বসাতে, অথবা দুধের ভ্যান চালাতে-চালাতে স্যান্ডবার্গ কবিতা পড়ছেন। একজন স্যান্ডবার্গ নয়, অনেক স্যান্ডবার্গ।

Kin

Brother, I am fire
Surging under the ocean floor.
I shall never meet you, brother—
Not for years, anyhow;
Maybe thousands of years, brother.
Then I will warm you.
Hold you close, wrap you in circles,
Use you and charge you—
Maybe thausands of years, brother.

You will come

You will come one day in a waver of love.
Tender as dew, impetuous as rain,
The tan of the sun will be on your skin,
The purr of the breeze in your murmuring speech,
You will pose with a hill-flower grace.

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৮

ওয়াশিংটনের সেন্ট এলিজাবেথ মানসিক হাসপাতালে ওই দাড়িওলা অদ্ভুত বৃদ্ধকে দেখলে কেমন মায়া হয়। কমলালেবু খেতে-খেতে খোসা ছুড়ছেন। একা-একা শূন্যের সঙ্গে তাঁর কী কথা?

ওঁকে চেনো?

না। না।

সময়প্রসৃতির ঝিরিঝিরি শব্দ, তারই মধ্যে কে উত্তর দিল? আমি এদিক-ওদিক তাকাই। ইতিহাস? না কি কোনও ইতিহাসহীন কবি?

তাঁর ঘর আর বাথরুমের দরজার কাছে কয়েকটি কাগজের পৃষ্ঠা ইতস্তত উদাসীনভাবে উড়ছে। পাখির ডানার মতো একটিকে স্পর্শ করে আমি চমকে উঠি:

In a Station of the Metro

The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.

কবিতার এই রজদভ্র আলোর সামনে মুগ্ধতায় আমি ভাস্কর্য হয়ে গেছি। আরও একটি পৃষ্ঠা উড়ে আসে।

The Garret

...Dawn enters with little feet
like a gilded Pavlova,
And I am near my desire.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

April

Three spirits came to me
And drew me apart
To where the olive boughs
Lay stripped upon the ground:
Pale carnage beneath bright mist.

The Beautiful Toilet

Blue, blue is the grass about the river
And the willows have overfilled the close garden.
And within, the mistress, in the midmost of her youth,
White, white of face, hesitates, passing the door,
Slender, she puts forth a slender hand...

A Pact

I make a pact with you, Walt Whitman—
I have detested you long enough.
I come to you as a grown child
Who has had a pig-headed father;
I am old enough now to make friends.
It was you that broke the new wood,
Now is a time for carving.
We have one sap and one root—
Let there be commerce between us.

এ তো পাউন্ড, এজ্‌রা পাউন্ড! শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জল ভোরে এ কী অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার! তিনি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকালেন। সে চোখে কি ক্ষোভের আগুন ছিল? না কি হাহা মরু-বালি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯০৮ সালে আশি ডলার পকেটে নিয়ে মার্কিন দেশ ছেড়ে ইউরোপ রওনা হওয়া সেই কবি যিনি বিধাতার মতো ইংরেজি ও আমেরিকান কবিতার গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। পাউন্ডের নিঃস্বার্থ সাহায্য ছাড়া পৃথিবী চিনত না জেমস জয়েস ও রবার্ট ফ্রস্ট-কে, সর্বোপরি টি এস এলিয়ট-কে। উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়াম্‌স-এর মতে, 'before meeting Pound is like B. C. and A. D.' এলিয়টের প্রুফকের প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। হার্ভার্ডে ফিরে দার্শনিক হওয়ার চেয়ে ইংল্যান্ডে থেকে কবিতায় মনোনিবেশ করার জন্য এলিয়টকে বাধ্য করেছিলেন তিনি। এলোমেলো একটি জবরজং কবিতাকে হিংস্রভাবে কেটেকুটে 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর বর্তমান রূপও তিনিই দিয়েছিলেন। সেই মহাকবিতা উৎসর্গ করা হয়েছিল তাঁকেই ('Il miglior fabbro,' শ্রেষ্ঠতর নির্মাতা)। ফ্রস্ট যখন ৩৮ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে আসেন, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন একমাত্র পাউন্ড। তিন বছরের মধ্যে তাঁর দুটি বই ও বিপুল খ্যাতি। 'দ্য ইগোয়িস্ট' পত্রিকায় জয়েসের 'পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়ং ম্যান' প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এজ্‌রা।

এলিয়ট নোবেল পুরস্কার পেয়ে (১৯৪৮) বিশ্ববিখ্যাত, জয়েস ও ফ্রস্ট দুই আলোকস্তম্ভে পরিণত, আর পাউন্ড? ফ্যাসিজম-কে সমর্থনের জন্য বিচারের সময় অপ্রকৃতিস্থ প্রতিপন্ন হওয়ায় আজ তিনি এইখানে। দীর্ঘদিন ইতালিতে থাকার পর স্বদেশের এই হাসপাতালে ১৩ বছর (১৯৪৫-১৯৫৮)। এরপর আবার ইতালি, ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর মৃত্যু পর্যন্ত।

এলিয়ট, ফ্রস্ট ও উইলিয়াম্‌সের মতোই, ইংরেজি মডার্নিজ়মের এই পুরোধার জন্ম আমেরিকায়, এলিয়টের তিন বছর আগে ৩০ অক্টোবর ১৮৮৫ ইডাহোর খনি-শহর হেলি-তে। আঠেরো মাস পর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে পেনসিলভ্যানিয়ায় চলে যান পাউন্ড পরিবার। তারপর ফিলাডেলফিয়া। ১৩ বছর বয়সে ইউরোপ ভ্রমণ। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও হ্যামিলটন কলেজে পড়াশোনা, পেনসিলভ্যানিয়ায় এম. এ। ১৯০৮ সালে সামান্য পয়সা সম্বল করে ইউরোপ-যাত্রা। কবি তো হতেই হবে তাঁকে, সেটাই তাঁর ভবিতব্য। ভেনিস হয়ে— যেখানে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'আ লুমে স্পেন্‌তো'— লন্ডনে এসে উপস্থিত হলেন সেই ২৪ বছর বয়সি তরুণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অচেনাকে বন্ধু করার ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাঁর। বন্ধুত্ব করতে সটান চলে গেলেন স্বয়ং ইয়েট্স-এর কাছে। ইয়েট্স-এর বিয়েতে তিনিই 'বেস্ট ম্যান'। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হল কাব্যগ্রন্থ 'পার্সোনে', তারপর 'এগ্জাল্টেশনস' এবং 'দ্য স্পিরিট অফ রোম্যান্স'। সেকেন্ড পোয়েট্স্ ক্লাবে যোগ দিলেন। যার অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন টি ই হিউম আর এফ এস ফ্লিন্ট। পাঁচটি ছোট কবিতা নিয়ে হিউমের যুগান্তকারী 'কবিতাসমগ্র'-র মুখবন্ধও লিখবেন তিনি।

ওয়ার্ডর্সওয়ার্থ যেমন পালাবদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আঠেরো শতকের শেষে, তেমনই বিশ শতকের গোড়ায় এক নতুন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিলেন এজ্রা পাউন্ড। ১৯১৪ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হল তাঁর সম্পাদিত ৩৭টি কবিতার প্রভাবশালী সংকলন 'দে জ়িমাজিস্ত' (Des Imagistes)। তাতে ভূতপূর্ব প্রেমিকা কবি হিলডা ডু-লিট্ল্ ছাড়াও পাউন্ডের ছ'টি কবিতা ছিল। ছিল এমি লোয়েল, জেম্স জয়েস ('I hear an army'), ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড এবং উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়াম্স-এর কবিতাও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ইউরোপীয় কবিতার মতো ইংরেজি কবিতাও তখন নতুন ভাষা খুঁজছে। ১৯১১ সালে হ্যারিয়েট মন্‌রো 'পোয়েট্রি' পত্রিকা প্রকাশ করার সময় পাউন্ড-কে বিদেশি বিভাগের সম্পাদক হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'A Few Don'ts by an Imagist'। বলা হল, কবি যেন সরাসরি 'বস্তু'-র কথা বলেন, সে কবিতা আত্মগত বা নিরপেক্ষ যাই হোক। একটি শব্দও ব্যবহার করা যাবে না যার কোনও সামগ্রিক অবদান নেই। সাংগীতিকতাই আসল। কনফুশিয়াসের ভক্ত পাউন্ড বুঝেছিলেন চিনা ও জাপানি কবিতা ইংরেজি কবিতাকে সজীব করে তুলতে পারে। বিরাট এক রচনাবলির চেয়ে একটিমাত্র বাক্‌প্রতিমা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইমেজিজ্‌ম ইংরেজি কবিতায় এক তীক্ষ্ণ ও সময়োপযোগী আধুনিকতার জন্ম দিল।

এদিকে পাউন্ড ডরোথি শেক্সপিয়র-কে বিয়ে করলেন ১৯১৪ সালের এপ্রিলে। ওই বছরই ২২ সেপ্টেম্বর লন্ডনের হল্যান্ড প্লেস চেম্বারসে পাউন্ডের সঙ্গে দেখা করলেন এলিয়ট। পাউন্ড 'পোয়েট্রি' পত্রিকার সম্পাদক হ্যারিয়েট

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মন্‌রো-কে লিখলেন: '(Eliot) has sent in the best poem ['The Love Song of J. Alfred Prufrock]. (Eliot) has actually trained himself AND modernised himself ON HIS OWN. The rest of the promising young have done one or the other but never both. Most of the swines have done neither.'

অন্যের মৌলিক প্রতিভা তাঁকে উত্তেজিত করে, এমনকী রবীন্দ্রনাথের কবিতাও। যেন নেতৃত্ব তাঁর স্বভাবগত, তাঁর শ্বাসে-প্রশ্বাসে কবিতা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রকাশিত হল 'ইমেজ টু সেক্সটাস প্রপেরটাস' (১৯১৯) ও 'হিউ সেলউইন মবারলি' (১৯১৯)। শিল্প, সমাজ, পৃথিবীর বিবর্তন আর যুদ্ধ পাউন্ডের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে কবিতা-শরীর পায়।

১২ বছর লন্ডনে কাটিয়ে ১৯২০ সালে প্যারিসে চলে যাবেন এজরা পাউন্ড। স্যেন নদীর ধারে নত্র-দাম গির্জার পাশে 'শেক্সপিয়র অ্যান্ড কোং' নামে ইংরেজি বইয়ের দোকানে জয়েস আর হেমিংওয়ের সঙ্গে দেখা হয়। মেশেন ফরাসি দাদাবাদী ও স্যুররেয়ালিস্তদের সঙ্গে। কিন্তু প্যারিস ভাল লাগে না বেশি দিন। চলে যান ইতালির রাপাল্লো শহরে, দু'দশকের জন্য।

মডার্নিস্ট ইংরেজি কবিতার প্রধান ধাত্রী পাউন্ড কি উদাসীন হয়ে যাচ্ছিলেন ক্রমশ? মার্কিন বেহালাবাদিকা অল্‌গা রুজ এবং স্ত্রী ডরোথি-র দুই নবজাত সন্তান তাঁকে সরিয়ে নিচ্ছিল দূরে? তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'ক্যানটোজ়'-এ মনপ্রাণ সঁপে দিতে চাইছিলেন তিনি? পাউন্ডের কি মনে হয়েছিল তাঁর কর্মসূচি শেষ হয়েছে, ১৯২২ সালে বন্ধু এলিয়ট 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' কাব্য এবং জয়েস 'ইউলিসিস' প্রকাশ করে ইতিহাসে নাম খোদাই করে ফেলেছেন? এবার ধীরে-ধীরে তাঁর দূরে সরে যাওয়ার পালা?

১২০টি অংশে বিভক্ত 'ক্যানটোজ়' কাব্যে (১৯১৫-১৯৬২) পৃথিবী ও সমাজ নিয়ে ক্ষোভ স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯২৫, ১৯৩৪, ১৯৩৭ ও ১৯৪০-এ ছাপা হবে সেই কবিতা।

টি এস এলিয়টের মতোই বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে কবিতা থেকে ক্রমশ বৃহত্তর সমাজভাবনার দিকে প্রসারিত হতে শুরু করেন পাউন্ড। অর্থনৈতিক অবিচার তাঁকে মুহ্যমান ও ক্রুদ্ধ করে, এবং পাউন্ড ক্রমশ বিস্ময়করভাবে ফ্যাসিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। রোমের বেতারে পাউন্ডের কণ্ঠে বারবার মুসোলিনি-অনুরাগ ও মার্কিন-বিদ্বেষ ধ্বনিত হয়। ফলে ১৯৪৫ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মার্কিন সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথমে ইতালির পিসা-র কাছে মার্কিন সামরিক ক্যাম্পে ও পরে আমেরিকায় কারারুদ্ধ হন তিনি। কিন্তু বিচারের সময় দেখা যায় তিনি প্রকৃতিস্থ নন। ১৯৫৮ পর্যন্ত মানসিক হাসপাতালে রাখা হয় তাঁকে, যতক্ষণ না রবার্ট ফ্রস্টের চেষ্টায় মুক্তি পান। পাউন্ড আবার ফিরে যান ইতালিতে।

কিন্তু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে থাকলেও পিসায় বন্দি অবস্থায় লিখেছিলেন 'পিজ়ান ক্যান্‌টোজ়'। এবং আমেরিকায় মানসিক সেবাকেন্দ্রে দু'টি দীর্ঘ কবিতার অংশ ('সেকশন: রকড্রিল' এবং থ্রোন')।

সবচেয়ে আশ্চর্য, ১৯৬৫ সালে এলিয়টের মৃত্যুর পর এজ়রা পাউন্ড ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন বন্ধুর শেষকৃত্যে যোগ দিতে।

ভেনিসের সান জর্জিও মাজোরে দ্বীপে শুয়ে আছেন তিনি। মুখে স্বভাবসুলভ কৌতুকের চিহ্ন।

মোমবাতি হাতে এক লাজুক তরুণ তাঁর সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে। অ্যাজ়টেক ভাস্কর্যের মতো মুখ। টি এস এলিয়ট।

ইয়েট্‌স-ও এসেছেন। পর-পর তিন বছর শীতকালে সাসেক্সের স্টোন কটেজে পাউন্ডের সঙ্গে সময় কাটানোর সুখস্মৃতি তিনি ভোলেননি।

লরেন্স, জয়েস আর ফ্রস্ট-ও এসেছেন। এসেছেন পরের প্রজন্মের গিন্‌সবার্গ। কবিতার এমন নিঃস্বার্থ রাজকুমার তো তাঁরা আর কখনও দ্যাখেননি।

The tree has entered my hands
The sap has ascended my arms
The tree has grown in my breast
Downward
The branches grow out of me like arms.

True you are
Moss you are
You are violets with wind above them.
A child— so high—you are,
And all this is folly to the world.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৯

মাঝে-মাঝে রাত কী ভয়ংকর! অন্ধকার প্রগাঢ় হয়েছে আর সেখানে কোন অতল খাদের মধ্যে গিরগিটিদের নড়াচড়ার শব্দ। আমি ঠাহর করে বুঝতে পারি মৃত্যুর চুনি-মুখ রক্তের শিকড় খুঁজছে। ভয়ে ছুটতে ছুটতে আমি মহাসময়ের এক গ্যালারিতে গিয়ে সেঁধোই। সেখানে আধো-অন্ধকার ঘরে দু'জন প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজকের দুই ছেলে। আমি বুকের রক্ত ঢেকে ফেলে বলি, 'বাহ্, আপনারা!'

একজনের সামনে বই, তিনি পড়ছেন শিলার, নোভালিস, হফ্‌মান আর শোপেনহাওয়ার। উদ্ভ্রান্ত চোখ, সেখান থেকে একটা জ্যোতি কি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে আমাকে? অন্যজনের রক্তচোখ, হাতে তুলো, কানে বান্ডেজ। আত্মপ্রতিকৃতি আঁকছেন। নীৎশে আর ভ্যান গঘ।

এক জেসুইট পাদ্রি নীৎশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কী ঘৃণ্য আর বিষাক্ত!' ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করে তিনি এক ইতিহাস, কিন্তু আসলে তো তিনি ধর্মপ্রচারকের চেয়েও বিশুদ্ধাচারী। পুঁজ ও বিষ্ঠা মুছে দিচ্ছে এক অদ্ভুত হলদে শিখা।

আমি বলছি, বাবা দ্যাখো, নীৎশে! সেই গোঁফ, সেই চোখ। আমার বাবা কোন ধ্যানী নক্ষত্রমায়া থেকে নেমে এসে বললেন, তোমাকে সেই কবে 'দাস্ স্পেক জরথুস্ত্র' পড়তে দিয়েছিলাম, তোমার জন্য 'একে হোমো' আনিয়েছিলাম, সেই সময়টাকে বুঝতে। আর এই ক্ষোভিত সময়কে। এত কম পড়াশোনা করে বেঁচে আছ কী করে এই শীতার্ত গ্রহে!...

মশাল হাতে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহামানুষ।

আর সেই আগুনে পুড়ে যাচ্ছে হাজার হাজার বছরের জমে থাকা মোম।

তিনি 'হাইনরিশ' পড়ে নোভালিসের কাছে শিখেছিলেন প্রত্যেক মানুষই অপার সম্ভাবনাময়, প্রতিভাবান এক নায়ক। শুধু স্থিতি জাড্যই তাকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মধ্যমেধায় আবদ্ধ করে রেখেছে। এই পৃথিবীতে বাঁচার জন্য এক গীতিময় স্টোইসিজ়ম-কে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন নিজের মধ্যে। যখন মুতিউস স্ক্যাভোলা সম্পর্কে স্কুলের সহপাঠীরা সন্দেহ প্রকাশ করে, তিনি হাতের তালুতে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন একগুচ্ছ দেশলাই কাঠি।

'ভাগ্য ও ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখেছিলেন:

> ভবিষ্যতে বিরাট-বিরাট ঘটনা ঘটতে চলেছে, যখন মানুষ বুঝবে যে খ্রিস্ট ধর্মের কাঠামোটি অনুমানের ওপর নির্ভরশীল।... আমি সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করেছি।

ধর্মপ্রচারকের ছেলেটি ছোটবেলা থেকে ধার্মিক ছিলেন, সেই অন্তর্গত ধার্মিকতা তাঁর ধর্ম-বিদ্রোহকে তীব্র করে তুলল। 'যদি খ্রিস্ট ধর্ম মানে হয় এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি আস্থা', বন্ধু ফন গেরসডর্ফ-কে বলেছিলেন তিনি, 'আমার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এর অর্থ যদি হয় মুক্তির প্রয়োজন, আমি একে আগলে রাখতে রাজি।'

এক অন্তর্লীন তীব্রতা তাকে শেখাল, 'যে কোনও মূল্যে সত্যকে জানো। সত্যকে জানার জন্য জাগিয়ে তোলো এক যৌবনসুলভ পাগলামি...'। যেন তিনি এক নৈতিক শূন্যতার ভয়ংকরের সামনে দাঁড়িয়ে, এক মরণফাঁদের মুখোমুখি।

যেন এক সংকীর্ণ, নগ্ন ঘরে তিনি নিজের পায়ের শব্দ শোনেন, একা-একা হেঁটে যান, চেতনার স্তরের-পর-স্তর পেরিয়ে নেমে আসেন নীচে, আহ্, সব কিছু ছিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত, অথচ মিথ্যে যুক্তির নীচে আচ্ছাদিত। জাহাজডুবির পর জাহাজের ভাঙা-টুকরো আঁকড়ে ধরে এক হিংস্র শূন্যে ঝুলে থাকা। কোনও কিছুই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। একাকিত্ব, নির্জনতা, নির্বাসন, অভিশপ্ত মৃত্যুপথ।

নীৎশের ভাষায়:

> যন্ত্রণা... যা আমাদের দর্শনের চূড়ান্ত গভীরতার দিকে ঠেলে দেয়, আর খসিয়ে দেয় সমস্ত ছদ্মবিশ্বাস, যেখানে আমরা স্থাপন করেছিলাম আমাদের মানবতা। আমার সন্দেহ আছে যন্ত্রণা আমাদের উপকার করে কি না, কিন্তু আমি জানি যে তা আমাদের গভীরতা দেয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বিষণ্ণ দার্শনিক' শোপেনহাওয়ারের 'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ় উইল অ্যান্ড আইডিয়া' বইটি প্রথম পাঠের কথা এভাবে লিখেছেন নীৎশে:

> বুড়ো রোনের বইয়ের দোকানে ওঁর বই আমি প্রথম দেখি।... হাতে নিয়ে পাতা ওলটাই। জানি না কোন দৈত্য আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'এ-বইটা বাড়ি নিয়ে যাও' বাড়ি গিয়ে আমি সোফার কোণে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই শক্তিশালী, বিষণ্ণ প্রতিভাকে আমাকে গ্রাস করতে দিই। প্রতিটি বাক্য চিৎকার করছে ত্যাগ আর প্রত্যাখ্যানের জন্য, হাল ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এখানে আমি খুঁজে পেলাম এক আয়না যাতে দেখতে পেলাম পৃথিবী, জীবন এবং এক ভয়াবহ মহিমায় আমার আত্মাকে।

শোপেনহাওয়ারের কাছে ফ্রিডরিশ নীৎশে শিখলেন নিজেকে দূরত্ব থেকে দেখতে, যা আত্মজ্ঞানের প্রথম ধাপ।

একটি দমবন্ধ করা ঝড় আকাশে ঘনিয়ে উঠছে... প্রচণ্ড এক ধাক্কা, বিদ্যুৎ চমকানি আর বজ্রনিনাদ। আমার ভেতর জেগে উঠছে এক অবর্ণনীয় উন্মাদনা ও আনন্দ। আমি পাশের পাহাড়ে উঠে দেখি একটি কুঁড়েঘর, সেখানে একটি লোক দু'টি শিশুকে হত্যা করছে, আর তার ছেলে সেদিকে তাকিয়ে। এ এক অন্য জগৎ, এক স্বাধীন শক্তি যা নৈতিকতা দিয়ে বাঁধা নয়। বিশুদ্ধ ইচ্ছে, যা বৌদ্ধিকতার বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত— কী আনন্দ, কী স্বাধীন!

আপাতদৃষ্টিতে সরল শোনালেও নীৎশের দর্শনে এই অভিজ্ঞতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। রক্তের অপ্রিয় গন্ধ, ছুরির ঝলক, মুগ্ধ বালকের তাকিয়ে থাকা। স্বাধীন বিশুদ্ধ ইচ্ছেশক্তির অনুভূতি। 'চিন্তাক্লিষ্ট প্রকৃতি' থেকে মুক্তি, যা এত দিন তার প্রধান সমস্যা ছিল।

পরে ফ্র্যাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসে কাজ করতে করতে, আহতদের রক্ত আর কাটা শরীরে গ্যাংগ্রিন দেখতে দেখতে ভয় আর অবসাদে ডুবে গেলেন নীৎশে। ফেরার পথে মৃত্যুযাত্রী যুদ্ধযাত্রী সৈন্যদের মিছিল দেখে তাঁর মনে হল, 'জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী আর উঁচু ইচ্ছেশক্তিকে বাঁচার ক্ষুদ্র সংগ্রামের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে যুদ্ধের ইচ্ছেয়, ক্ষমতা জয়ের ইচ্ছেয়...'। 'Will' কথাটির আদ্যক্ষর বড় হরফে ব্যবহার করেছেন তিনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিন্তার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে 'মুক্ত শক্তি' (energy) আর 'বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি'-র আবহমান আনন্দকে অনুভব করলেন তিনি, অনুধাবন করলেন জীবনীশক্তির জয়।

জন্ম ১৫ অক্টোবর ১৮৪৪ লাইপজ়িগের কাছে প্রুশিয়ার রোকেনে। সেটা ছিল প্রুশিয়ার তৎকালীন সম্রাট চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের জন্মদিন, অর্থাৎ জাতীয় উৎসবের দিন।

এক একাকী অসুস্থ ছাত্র মহাজীবনের স্বপ্ন দেখলেন ইচ্ছাশক্তির মধ্যে, দুষ্ট ও মিথ্যুক বালকদের থেকে দূরে এক নিঃসঙ্গ শিখা। যার শক্তি শরীরের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যায়, ব্যক্তি ও চিন্তার নির্বুদ্ধিতাকে অতিক্রম করে যায়।

চব্বিশ বছর বয়সে সুইজ়ারল্যান্ডের বাজ়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসিকাল ফিললজি-র চেয়ার-প্রফেসর পদে অধ্যাপনা করতে করতে লিখলেন 'ট্র্যাজেডির জন্ম'। সেই বইয়ের প্রারম্ভে লিখলেন এই 'স্বর্গীয় উচ্ছ্বাসের' কথা, যা মানুষের, মানবপ্রকৃতির গভীর তলদেশ থেকে উত্থিত হয়ে ডায়োনিজ়ীয় ভাবনার সূত্রপাত করবে। এ এক মাতলামি।

দুই গ্রিক দেবতার কথা মনে করিয়ে দিলেন তিনি। এক) ডায়োনিসাস (বা ব্যাকাস), যিনি মদ ও আনন্দের দেবতা, উত্থিত জীবনীশক্তির সূত্রধর, তৃপ্তি ও উচ্ছ্বাস, অভিযান ও নির্ভীক যন্ত্রণাসহনশক্তির উদ্‌গাতা। সংগীত, নৃত্য আর নাটকের দেবতা। অতঃপর তুললেন আপোলো-র কথা। শান্তি ও অবসর, যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশীলতা, দার্শনিক সুস্থিরতা, চিত্র-শিল্প, ভাস্কর্য আর মহাকাব্যের দেবতা। গভীরতম গ্রিক থিয়েটার হতাশা ও বিষণ্ণতাকে জয় করতে পেরেছিলেন ডায়োনিজ়ীয় দেবতাকে দিয়ে।

ডায়োনিজ়ীয় আবেগ-ই নীৎশের বীজমন্ত্র। সকলকে স্তম্ভিত করে তিনি ঘোষণা করেন সক্রাতেস কখনও ডায়োনিজ়ীয় আবেগকে চেনেননি। তিনি গ্রিক অবক্ষয়ের প্রতীক। এই পদ্ধতিতে নীৎশে অন্যান্য দার্শনিককেও যাচাই করতে চেয়েছিলেন, কেউ তাঁর কাছে 'পাশ' করেননি, শুধু কুড়ি বছর বয়সের আবিষ্কার শোপেনহাওয়ার ছাড়া। সেই শোপেনহাওয়ার, হাতে যাঁর অন্ধকারের কালো আলো।

নীৎশে একা [illegible] তার বি[illegible] জন্য ভাগ্‌নার তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বন্ধু। একদিকে সারা পৃথিবী, অন্যদিকে তিনজন মানুষ। কিন্তু কী অসীম শক্তিধর তিনজন!

সংগীতকার ভাগ্‌নার তাঁর চেয়ে পঁয়ত্রিশ বছরের বড়। বাজ়েলের কাছাকাছি ট্রিবশেনে থাকতেন তিনি। রাষ্ট্র ও ধর্মকে জনতার আফিম চিহ্নিত করে নীৎশের প্রবন্ধ তিনি পড়েছিলেন। 'ট্র্যাজেডির জন্ম' বইতে নীৎশে ভাগ্‌নার-কে 'নতুন যুগের দেবদূত' বলে অভিহিত করলেন। ভাগ্‌নারও বইটিকে স্বীকার করলেন এক মহাগ্রন্থ বলে।

প্রথম পর্বে নীৎশে বলেছিলেন, চিন্তার চেয়ে জীবন বড়। জীবনের জয় হোক। তারপর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হল তাঁকে। সেই পর্বে 'দাস্ স্পেক জরথুস্ত্র'। 'শক্তি হল অনন্ত সুখ।' 'নৈতিকতা বলে কিছু নেই, আছে নৈতিক ভাষ্য'। এভাবেই চলল শেষ পর্যন্ত।

অদ্ভুত সব চিঠি লিখছেন তখন নীৎশে। শেষ চিঠিতে কসিমা ভাগ্‌নার-কে প্রেমপত্রে স্বাক্ষর করলেন, 'ডায়োনিসাস' নামে! ১৮৮৯ সাল থেকে মানসিক অবসাদে বিপর্যস্ত ছিলেন তিনি। পাগল হয়ে যাচ্ছেন তিনি। অগ্নিমান্দ্য, দীর্ঘ সময় ধরে মাইগ্রেন, চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যখন সুস্থ থেকেছেন তাঁর মেধা আকাশচুম্বী হয়েছে। তাঁর ভাষায়, তিনি যেন একটি যন্ত্র 'মাঝে মাঝে যার বিস্ফোরণ ঘটে।'

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছেন, তবু চিঠিতে এক আশ্চর্য প্রত্যয় আর আশা। 'Pleurs de joie', আনন্দাশ্রু। এ-কথাটাই পাসকালের মৃত্যুর পর কোটের ভেতরকার লাইনিং-এ সেলাই করা ছিল।

১৮৯৯ সালে যে-সময় ভ্যান গখ ভেঙে পড়লেন, ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর।

পাশ্চাত্যের সমস্ত দার্শনিককে প্রশ্ন ও সন্দেহ করেছেন নীৎশে, যাঁদের 'চিন্তাপদ্ধতি'-তে শুধু প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের সীমাবদ্ধতা। কান্ট এবং হেগেল-ও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। জীবনকে মুক্ত করে উচ্চতর মাত্রায় স্থাপনের প্রকল্পে এঁরা জীবনের অবমূল্যায়ন করেছেন, চিন্তা যে বিরাট জীবনপ্রবাহকে খুঁজে পাওয়ার অস্ত্র, অঙ্ক কষে জীবনকে বুঝতে গিয়ে এঁরা তা ধরতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত 'না', না কি 'হ্যাঁ'? খুব ধীরে ধীরে নীৎশে শিখলেন 'হ্যাঁ' বলতে। যিনি ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সুপারম্যান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
('Übermensch') পারবে, কারণ সে নির্ভর করে জীবনের প্রবল ইচ্ছাশক্তির ওপর। শুধু মানুষই তা পারে, সীমাহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জীবনের শক্তি ঘোষণা করতে পারে। সে পাথরের দেবতা নয়।

> কোথায় সেই বিদ্যুৎ যা তোমাকে তার জিহ্বা দিয়ে লেহন করবে? কোথায় সেই উন্মাদনা যা তোমাকে সংক্রামিত করবে?
>
> শোনো, আমি তোমাদের 'য়্যুবেরমেন্‌শ'-এর কথা বলছি। তিনি বিদ্যুৎ, তিনি উন্মাদনা...

জরথুস্ত্র বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সুপারম্যান শেখাচ্ছি। সে এক সমুদ্র যেখানে তোমার ঘৃণার অবসান হবে।'

...তোমার পাপ নয়, তোমার যোগ্যতা আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে, এমনকী পাপের মধ্যেও তোমার যোগ্যতা আকাশের পানে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে।'

কেউ কেউ বলেন, ইংরেজ বিবর্তনবাদ এবং জার্মান জাতীয়তাবাদকে বিদ্রুপ করলেও নীৎশে আসলে ডারউইন আর বিসমার্কের সন্তান।

তাঁর আত্মকথা 'একে হোমো' (১৮৮৮)-তে তিনি লিখেছেন:

> মানবজাতির উন্নতির শপথ আমার উদ্দেশ্য নয়। বিগ্রহগুলিকে (আমি সমস্ত আদর্শকে বিগ্রহ বলি) ছুড়ে ফেলে দেওয়া নিয়ে আমি অনেক বেশি ভাবিত। কোনও আদর্শকে মিথ্যে মিথ্যে পুজো করার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবকে তার মূল্য, অর্থ ও সত্যতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখানেই আদর্শের মিথ্যে আর বাস্তবের অভিশাপ।
>
> এর মাধ্যমে মানবজাতির অনুভূতিগুলিকে মিথ্যেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যেসব মূল্যবোধকে উপাসনা করা হয়েছে তার উলটোটাই শুধু মানুষের অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ আর ভবিষ্যতের মহৎ আবিষ্কারকে নিশ্চিত করতে পারে...।

সমস্ত দেবতা মৃত, এখন শুধু সুপারম্যান বাঁচুক... এই সুপারম্যান মানুষকে অতিক্রম করে যাবে, তাকে অতিক্রম করার জন্য তুমি কী করছ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাত্রীয় 'আঁগাজমাঁ'-র সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ মিল নেই, যদিও সার্ত্র নিশ্চয়ই নীৎশের কাছে ঋণী। নীৎশে বলেছিলেন জেগে উঠতে। জেগে ওঠাই আসল, সেটাই রাস্তা। না-হলে অসুস্থতা ঘুচবে না। নিজেকে অতিক্রম করার এ এক যুগান্তকারী দিশা।

নীৎশের মৃত ঈশ্বর জন্ম দিল আধুনিকতার শত স্রোতোধারার। যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠার দুই দার্শনিক কীর্কেগার্দ ও দস্তয়েভস্কি যা হতে পারেননি, নীৎশে তা হয়ে উঠলেন: ঈশ্বরহীন আধুনিক মানুষের দিকদ্রষ্টা।

অন্ধকার হিম হয়ে জমে থাকে রক্তবরফের মতো। আমি দেখতে পাই এক দিব্যোন্মাদের হাতে নতুন যুগের ভেরি। এক নতুন শক্তির উদ্বোধনে দীপিত হচ্ছে এক ছিন্নবিচ্ছিন্ন পৃথিবী।

সব সময় একা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীরা একজন 'অধ্যাপক'-কে চেয়েছিলেন, প্রফেট-কে নয়। তাঁর বিরুদ্ধে আত্মপ্রেম অথবা উন্মত্ততার অভিযোগ। বিয়ে করেননি, লু সালোমে নামে এক নারীকে বন্ধুর মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করেন, লু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে বন্ধুটিকে বিয়ে করেন। যে পথনারীর সঙ্গে একবারই শারীরিক সংসর্গ হয়েছিল, সে কি তাঁকে দিয়েছিল মৃত্যুবীজ?

সমাপ্তির আগে যখন তাঁকে ঢেকে ফেলেছে অন্ধকারের কালো আচ্ছাদন, তখন বোনকে বললেন, 'লিজ়বেথ, কাঁদছ কেন? আমরা কি সুখী নই?'

যে তীব্র দহন তাঁকে পুড়িয়ে খাক করে দিল, সে তো কবিতার। নীৎশের হাতে দর্শন হয়ে উঠেছিল এক গীতিকবিতা।

২ নভেম্বর ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪০

আমি এই মধ্যরাতে প্যারিসের 'পের লাশেজ' সমাধিক্ষেত্রে কী করছি? আমার না সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কথা! ডান আর বাঁপাশে জ্বলছে চৌকো চৌকো মৃদু আলো! কারা শুয়ে-বসে আছে আমার চারদিকে?

গিয়োম আপোলিনের মাথার জখমে ব্যান্ডেজ বেঁধে একটি বই পড়ছেন। ওই যে প্রুস্ত ঠিক সেই ভঙ্গিতে বসে, যেমন দেখেছি পরিচিত পোর্ট্রেটে। ওই তো মলিয়ের, লা ফঁতেন, বালজাক! চিত্রশিল্পী অ্যাঁগ্র, দ্যলাক্রোয়া! কবি আলফ্রেদ দ্য ম্যুসে, সংগীতকার শোপ্যাঁ! অসকার ওয়াইল্ড, পল এল্যুয়ার! ওই যে অভিনেত্রী সারা বের্নহার্ট। সবাই জেগে উঠেছেন, একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন। প্যারিস ছাড়া এমন চাঁদের হাট কোথায় পাব?

কিন্তু না!

আমি এখানে কাউকে খুঁজছি না! তবে এই হিমনিশীথে আমি এখানে কেন?

ঘুমের মধ্যে কী যে হয়!

হঠাৎ কখন রাতপাখির ডানায় ভর করে এসে পড়েছি সেন নদীর দক্ষিণ প্রান্তে মঁপারনাস সিমেট্রিতে। এদগার কিনে সরণির (এমন আশ্চর্য সুন্দর রাস্তাও হয়!) প্রধান ফটক হাট করে খোলা। ঢুকেই ডানদিকে সার্ত্র আর সিমোন দ্য বোভোয়ারের কবর, যা ফুলে ফুলে ঢাকা। জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে বোদল্যেরের সমাধি। চারপাশে শুয়ে আছেন এমিল দুর্কহাইম, ত্রিস্তাঁ ৎসারা, ব্রাঁকুসি, বেকেট, ইওনেস্কো, কোরতাসার, কার্লোস ফুয়েন্তেস, রজে কাইওয়া...।

রাশি রাশি বই। সমাধিগুলি যেন কোন অলীক সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে। কিন্তু না। আমি যাঁকে খুঁজছি, যাঁর জন্য দৌড়চ্ছি এই মৃত্যু-প্রহেলিকা ভেদ করে, তিনি কোথায়?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছ' নং ডিভিশনে এক জায়গায় ঝুঁকে পড়েছে একটি ছায়া। হাতে ছুরি। নিজের গলা কাটতে চাইছেন। রক্তবিন্দুটি গলা বেয়ে নেমে এসে একটি ব-দ্বীপ সৃষ্টি করল। এক মনোরোগ সেবাকেন্দ্র থেকে এনে শুইয়ে রাখা হয়েছে তাঁর অশান্ত, অস্থির সিফিলিস-আক্রান্ত শরীর। আমি যে তাঁকেই খুঁজছিলাম এতক্ষণ! ছোটগল্পের রাজকুমার মপাসাঁ।

রাজকুমার? শুনে তাচ্ছিল্যে বেঁকে গেল এক তত্ত্বচালিয়াত অধ্যাপকের মুখ। জানে না, পড়েনি, বলল, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু। (লুই ফরেস্তিয়ে কবে আবার বন্ধু হল আমার? ঘুমের মধ্যেই আমার হাসি পেল!) তীব্র ও নরম, হিংস্র ও ভয়ংকর, সহজ, ঘন ও চিত্ররূপময়। ফরাসি মাটি, ঘাস, জলের গন্ধে উদ্বেল। বাস্তবভিত্তিক কিন্তু নৈরাশ্যময় তিক্ততায় নীল। তিনি স্তাঁদাল নন, কিন্তু নিঃশব্দে বদলে দিতে পারেন জীবনকে দেখার চশমা।

ছোট ছোট জানলা। সেই জানলার সামনে সমাজজীবনের এক অবিশ্বাস্য বিস্তার! যা সাপের মতো ছোবল মারে, কেবলই ছোবল মারে। বইয়ের পৃষ্ঠার ভাঁজে শুয়ে থাকে জীবনের নগ্ন শরীর, বিশেষত নারী-শরীর।

আচ্ছাদনের আড়ালে এত যন্ত্রণা অতি ক্ষুদ্র গৃহকোণে, অথবা ঝোপের পিছনে। এক অগ্নিময় আংরাখা জ্বলছে। ওপরে বাস্তবের মুখোশ।

মপাসাঁ-র জন্ম (১৮৫০-১৮৯৩) ওত্-নরমাঁদিতে তুরভিল-স্যুর-আর্কে এক ধনী পরিবারে ৫ অগাস্ট ১৮৫০। চাষির ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করে কেটেছে ছোটবেলা। বাবা-মা'র সংঘাত ও বিচ্ছেদে তিনি বিপর্যস্ত ছিলেন। বাবা প্যারিসের আভিজাত্যের টানে মুগ্ধ। মা সূক্ষ্মতাপ্রিয়, মেধাবি ও ভঙ্গুর এক নারী। মপাসাঁর সাত বছর বয়সে প্রকাশিত হয় ফ্লবেরের উপন্যাস 'মাদাম বোভারি', বোদল্যেরের কবিতা-বই 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল', তুর্গেনিভের 'এক শিকারির বিবরণ'। একুশ বছর বয়সে দেখেন পারি-কম্যুন।

১৮৫৯-'৬০ সালে মপাসাঁ পড়াশোনা করেন প্যারিসের 'লিসে অ্যাঁপেরিয়াল নাপোলেয়ঁ'-তে, যা আজ 'লিসে আঁরি কাত্র' নামে বিখ্যাত। তিন-চার বছর পরে কবিতা লেখার চেষ্টা, সুইনবার্নের সঙ্গে দেখা। আঠেরো বছর বয়সে ফ্লবেরের বন্ধু লুই বুইলের সঙ্গে যোগাযোগ। স্নাতক হওয়ার পর প্যারিসে আইন পড়তে শুরু করেন। ১৮৭০ সালে শুরু হল ফ্র্যাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ। মপাসাঁ-কে যোগ দিতে হল সেই যুদ্ধে। ঘোষিত হল প্রজাতন্ত্র। ১৮৭১-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর মার্চ থেকে মে পর্যন্ত চলল পারি-কম্যুন। সেপ্টেম্বরে সেনাবাহিনী ছাড়লেন তিনি। পরের বছর যোগ দিলেন সমুদ্র-মন্ত্রকে। ফ্লবেরকে প্রবন্ধ লিখে দেখাচ্ছেন, তিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন গঁকুর ও এমিল জোলা-র মতো মহান 'ন্যাচারালিস্ট' ঔপন্যাসিকের সঙ্গে। ১৯৭৪ সালে প্যারিসে আয়োজিত হল প্রথম ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রপ্রদর্শনী। প্রকাশিত হল মপাসাঁ-র প্রথম ছোটগল্প জোসেফ প্রুনিয়ে ছদ্মনামে। নিরিবিলিতে একটি নাটক মঞ্চায়িত করলেন তিনি, যার দর্শক ফ্লবের ও তুর্গেনিভ।

১৮৭৮ সালে সমুদ্র-মন্ত্রক ছেড়ে শিক্ষাদপ্তরে কাজ নিলেন মপাসাঁ। এক বছরের মধ্যে আকাদেমি-র অফিসার। তারপর পালটে গেল সব।

মপাসাঁর মা লোর ছিলেন ফ্লবেরের বন্ধু আলফ্রেদ দ্য পোয়াতভ্যাঁর বোন। তিনিই মপাসাঁ-কে ফ্লবেরের কাছে পাঠান। ফ্লবের প্যারিসে থাকলে প্রতি রবিবার তাঁকে ডেকে পাঠাতেন, তাঁকে দিতেন রচনাশৈলী সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান পরামর্শ। ভাষাকে ঘষে-মেজে কাচস্বচ্ছ করে তোলার মন্ত্র। তিনিই এমিল জোলা ও গঁকুর ছাড়াও তুর্গেনিভ ও হেনরি জেম্‌সের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেন। 'ওকে আমি ছেলের মতো ভালবাসি' বলতে দ্বিধা করতেন না ফ্লবের। ফ্লবেরের কাছে শিক্ষানবিশির সময় ছদ্মনামে মপাসাঁর কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। সব বদলে যায় যখন ১৮৮০ সালের এপ্রিল মাসে জোলা-সহ ছ'জন লেখকের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ-বিষয়ে একটি ছোটগল্প সংকলন 'লে সোয়ারে দ্য মেদাঁ' প্রকাশিত হয়। মপাসাঁর সেই মর্মস্পর্শী ছোটগল্প 'বুল দ্য স্যুইফ' ('চর্বির গোলা') তাঁকে এক মুহূর্তে ছোটগল্পের সর্বকালের সেরা রূপকারদের একজন করে তোলে। ফ্লবের শিষ্যের সেই সাফল্য দেখে গিয়েছিলেন। এক মাসের মধ্যে ফ্লবেরের আকস্মিক মৃত্যু মপাসাঁকে পিতৃহীন করে দেয়।

সকলে তাঁকে চাইছে। দু'টি বিখ্যাত খবরের কাগজে লেখার সুযোগ পান তিনি। অতঃপর সব ছেড়ে সাহিত্য-সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ এই দশ বছরে প্রায় তিনশো ছোটগল্প, দু'টি উপন্যাস, তিনটি নাটক ও অসংখ্য সাংবাদিক রচনা প্রকাশিত হয়।

'সরল সত্য' তাঁর রচনার উপজীব্য, যা ছিল 'য়্যুন ভি' ('একটি জীবন', ইংরেজি অনুবাদে 'আ উয়োম্যান্‌স লাইফ') উপন্যাসের উপ-শিরোনাম। যেটিকে তাঁর পড়া সেরা উপন্যাস মনে করেছেন তলস্তয়!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেন ক্যামেরা তাকিয়ে আছে জীবনের ছোট ছোট নাটকের দিকে। দূরত্ব থেকে অতি সংক্ষিপ্ত তুলি-টানে মানুষের আনন্দ ও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ধরে রাখছে চিরকালের জন্য।

দু' বছরে ছ'টি বই। সবসুদ্ধ পনেরোটি। ফরাসি সমাজজীবনের অবিস্মরণীয় সব চিত্রপট। গ্রামীণ জগৎ থেকে বেশ্যালয়, প্যারিসের কেতাদুরস্ত দুর্নীতিময় সমাজ, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তকে চিরে-চিরে দেখান এত অনায়াসে যে মনে হয় তাঁর জন্মকবচ হল ভালবাসা ও সহমর্মিতা, যদিও তা বিষণ্ণতার বরফ দিয়ে ঢাকা। তাঁর উপন্যাস দু'টি: 'বেল আমি' ('প্রিয় বন্ধু') ও 'য়্যুন ভি' ('একটি জীবন') এর অবিস্মরণীয় উদাহরণ।

শুধু নৌকো বাইতে ভালবাসেন তিনি। একমাত্র ('seule passion') সেন নদী তাঁকে টানে। দশ বছর এমন আগ্রাসী আবেগে নৌকো বেয়েছেন তিনি, যেন তা তাঁকে জীবনের সারসত্য শেখাবে। 'Ah! La belle, calme, variée et puante rivière pleine de mirages et d'immondices. ('আহ্! এই সুন্দর, শান্ত, বৈচিত্রময় আর দুর্গন্ধময় নদী, যা মরীচিকা আর আবর্জনায় ভরা।') সেন নদী যেন জীবনের প্রবহমান প্রহেলিকার প্রতীক।

প্রবল যৌনকামনা মপাসাঁকে উত্তেজিত করে। অতিরিক্ত নারীসম্ভোগ তাঁকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঘুম আসে না। নিউর‍্যালজিয়া-র ব্যথা, দৃষ্টিবিভ্রম। মা আত্মহত্যাপ্রবণ, ভাই সিফিলিসের প্রকোপে পাগল হয়ে গিয়েছে, বাবা সেই কবে প্যারিসের মরীচিকার আকর্ষণে নর্মাঁদি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

অপরাধ, ধ্বংসের আনন্দ। মনোবৈকল্যের প্রতি ধারাবাহিক মুগ্ধতা। যেন স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের অনিশ্চিত সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তিনি। এ যেন মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা ও বিপন্নতার এক সম্পূর্ণ রেখাচিত্র। অবসেশন ('এক বৃদ্ধ'), আতঙ্ক ('স্বাস্থ্যভ্রমণ'), ফেটিশ ('পরচুলা'), মৃত্যুপ্রীতি ('কবর')...মপাসাঁ কঁৎ-এর পজ়িটিভিজ়মে বিশ্বাস করছেন না। মানুষের হিত নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। এমিল জ়োলা-র 'বিজ্ঞানসম্মত' বিবরণ-পদ্ধতি তাঁর পছন্দ নয়। তিনি যেন এক ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকর, কী অমোঘ তাঁর তুলি-প্রক্ষেপণ! বিস্ময়কে খুঁজছেন তিনি, যে বিস্ময় অপার্থিব, ইন্দ্রিয়াতীত। যে-বিস্ময় কবিতার, আর স্বপ্নের। সেদিক থেকে গুরু ফ্লবেরকে অতিক্রম করে গিয়েছেন তিনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক অপরিলিখিত অনন্ত শূন্যতা। যা শেষ হবে না, উৎকণ্ঠা যাকে তমসাময় করে তুলবে। 'জলের ওপরে' নামে এক অপার্থিব ছোটগল্পে জল তার বিষণ্ণ তরলতা দিয়ে এক মুগ্ধ আবেগের জাল বোনে। কখনও সমুদ্রজল হয়ে ওঠে আয়না। স্বচ্ছতার আড়ালে খেলা করে এক বিপজ্জনক অজানা অনিরাপত্তা, যা যে কোনও মুহূর্তে আমাদের গ্রাস করতে পারে।

শুধু 'চর্বির গোলা' বা 'সাজ' (যার ইংরেজি অনুবাদের নাম 'দ্য নেকলেস') নয়, অসংখ্য বিদ্যুৎময় মানবাবলোকন। 'বন্দর', 'স্বীকারোক্তি', 'শ্রীমতী হ্যারিয়েট', 'কুমারী ফিফি', 'সাইমনের বাবা', 'মৃত্যের সমীপে', 'পণ', 'অপেক্ষা', 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ', 'সুখ', 'তেলিয়ে নিবাস', 'পলের স্ত্রী', আরও কত!

'নিষিদ্ধ' বিষয়কেও ভয় পাননি। পিতৃহত্যা ('একটি পিতৃহত্যা'), সমকামিতা ('পলের স্ত্রী'), অবৈধ সন্তান ('স্বীকারোক্তি'), অজাচার ('ঋষি') সব কিছুই তাঁর রচনার উপজীব্য।

১৮৮৮ সালে তাঁর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ভাই এর্ভে-র মৃত্যু। শোকে মুহ্যমান হয়ে যান মপাসাঁ। কম বয়সের মারাত্মক সিফিলিস তাঁকে উন্মত্ততার দিকে ঠেলে দেয়। ১৮৯২ সালে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁকে পাসি-র উন্মাদাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আঠেরো মাস থাকার পর ১৮৯৩ সালে ৪৩ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে তাঁর মৃত্যু হয়।

উন্মত্ততা নিয়ে এমনভাবে লিখেছিলেন যা উন্মত্তের পক্ষেই সম্ভব।

আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মেয়ের বন্ধু অরুণিমা রাত তিনটেয় পাখা থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। তার পায়ের কাছে উড়ছে একটি ছোটগল্পের পৃষ্ঠা। 'লা পারুয়র', দ্য নেকলেস।

২৩ নভেম্বর ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪১

I can't go on, I'll go on.
(The Unnamable)

প্যারিসের এই সমাধিক্ষেত্র থেকে বেরনোর পথ কোথায়? যেদিকে তাকাই মৃত্যুর জ্বলন্ত আয়তক্ষেত্র।

কোমরে তলোয়ার এঁটে মাথার ওপর কালপুরুষ আমাকে বলে, দাঁড়াও।

রাতের নক্ষত্রমালা আমাকে বলে, দেখো। ওরা দাঁড়িয়ে উঠবে এবার।

আমার চারদিকে অসংখ্য ছায়াশরীর কী অসম্ভব যন্ত্রণায় কম্পমান! একজন নির্জন দ্বীপের মতো মানুষ নীচু হয়ে লিখছেন। সামনে সাদা পৃষ্ঠার ভয়াল শূন্যতা।

মুখের বলিরেখায় পৃথিবীর বয়স আঁকা। কোনও ভাস্কর খোদাই করেছে সেই যন্ত্রণাপাথর? গোল চশমার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের অস্থি ও কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে। সেই তীব্র আতসকাচের থেকে আমি চোখ সরিয়ে নিই। তিনি আমার চোখে চোখ রাখলেন। যেন ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে গাছের পাতা। সেই সঙ্গে আনন্দের একটা শিহরণ। স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯)! কে জানত নৈরাশ্যের মহাকবি এই আইরিশ নাট্যকার, কবি ও ওপন্যাসিককে প্যারিসের মঁপারনাস সমাধিক্ষেত্রে খুঁজে পাব অবশেষে? তাঁকে সেই কবেকার সূর্য-প্রদক্ষিণ কাল থেকে ভালবেসেছি।

আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁর দেহ নিয়ে আসা হয়েছে নার্সিংহোম থেকে। পারকিন্‌সন্‌স ডিজ়িজ়ে তাঁর হাত কাঁপছে। আমি চমকে উঠে দেখছি বেকেটের হাত ও পা দু'টি কঙ্কালের।

তিনি হাঁটছেন প্যারিসের রাস্তায়। একা।

রু্য দ্যুল্‌মের বিশ্ববিখ্যাত একোল নরমাল স্যুপেরিয়র থেকে বেরিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে আছেন। মঁপারনাসের এক কাফেতে একা বসে। তাঁর চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে আমাদের আবরণ! আমাদের কঙ্কালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি।

স্যামুয়েল বেকেটের জন্ম আয়ারল্যান্ডের ফক্সরকে ১৯০৬ সালের গুড ফ্রাইডের দিন ১৩ এপ্রিল। বাবা সার্ভেয়ার, মা নার্স। অস্কার ওয়াইল্ড যে-স্কুলে পড়েছিলেন সেই পোর্টোরা রয়্যাল স্কুলের ছাত্র। পরে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে ফরাসি, ইতালীয় ও ইংরেজি পড়ে গ্র্যাজুয়েট হন ১৯২৭ সালে। প্রিয় লেখক টি এস এলিয়ট, জেমস জয়েস, প্রুস্ত। কাফকা-ও কি? তিনি তো কাফকারই সন্তান!

বাঁ-হাতি বোলার ছিলেন, বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে খেলেছেন। সেটা কি সুদূর পূর্বজন্মের স্মৃতি?

বেলফাস্টের ক্যাম্বেল কলেজে কিছু দিন পড়ানোর পর প্যারিসে ইংরেজি পড়ানোর চাকরি পান একোল নর্মাল স্যুপেরিয়রে। সেখানেই দেখা সমদেশি ঔপন্যাসিক জয়েসের সঙ্গে। শতাব্দীর দুই মহীরুহের সেই নিঃশব্দ সংলাপ থেকে আজও কবিতার রেণু ওড়ে।

স্তব্ধ সমুদ্রের মতো নৈঃশব্দ্যের ভেতর জয়েস ও তরুণ বেকেট একই ভঙ্গিতে বসে আছেন। এখন আর 'ইউলিসিস'-এর রচয়িতা তাঁকে 'মি. বেকেট' বলে ডাকেন না, বলেন 'বেকেট', যাতে তরুণটি খুশি হন। মাঝে মাঝে তাঁকে নতুন উপন্যাস 'ফিনেগান্‌স ওয়েক' থেকে ডিক্টেশন দেন। তারপর নীরবতা। দরজায় কেউ টোকা দেয়। জয়েস বলেন, 'এসো।' বেকেট লেখেন, 'এসো।' নীরবতা। 'কী লিখলে দেখি?' 'এসো।' 'এর মানে কী?' 'আপনি যে বললেন।' নীরবতা। 'কেটে দেব?' 'না। রেখে দাও।' নীরবতা।

মাঝখানে এক নিঃশব্দ উপস্থিতি। জয়েসের স্নায়ুবিপর্যস্ত উন্মাদিনী কন্যা লুসিয়া। কর্তব্যবোধ থেকে বেকেট তাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় থিয়েটারে যান। ধীরে ধীরে লুসিয়া তার প্রেম গোপন রাখে না। বেকেট শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। পরে তিনি পেগি গুগেনহাইম-কে বলেন যে তিনি তো ইতিমধ্যেই মৃত।

ভাষার ওপর যাঁদের অধিকার কিংবদন্তিপ্রতিম সেই দুই আইরিশ। 'বইটা পড়েছেন?' নীরবতা। 'কোন বই?' 'ফ্রিৎস মাউটনারের 'ক্রিটিক অফ ল্যাংগুয়েজ'। নীরবতা। ভাষা যে ভাবনাকে সঞ্চারিত করতে পারে না আর, ভাষা যে বিযুক্ত হয়ে আছে! নীরবতা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জয়েসের দুর্বোধ্যতা/ অস্পষ্টতার সপক্ষেই বেকেট লিখেছিলেন তাঁর প্রথম ভাষ্য। কিন্তু জয়েসের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে বেরতে গিয়ে তিনি খুঁজে নিলেন অন্য এক ভাষা, যা অতি সংক্ষিপ্ত অক্ষরের চুম্বক। জয়েসের 'বেশি জানা'-র বিপরীতে 'কিছু-না-জানা অনিশ্চয়তার' ভাষা।

এ এক অসম্ভব প্রকল্প! বেকেটের উপন্যাস হাত বাড়িয়ে তাৎপর্যকে খোঁজে, নাটককে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় ইস্পাত-শীতল এক নৈঃশব্দ্য। ন্যূনতমের দিকে কথার এই যাত্রা তাঁকে শূন্যতার লিপিকার করে তোলে। যা শূন্যতার ঢেউ অতিক্রম করে জীবনকে এক ন্যূনতম বোধিবিন্দুতে ধরতে চায়।

শব্দের উদ্গারের সঙ্গে এ এক যন্ত্রণাক্ত লড়াই। এই যন্ত্রণাকে আশিরনখ অনুভব করতে বেকেট মাতৃভাষা ইংরেজিতে না লিখে বিদেশি ভাষা ফরাসিতে লেখার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ বিদেশি ভাষা, যার ওপর তাঁর পর্যাপ্ত দখল নেই, তাঁকে আরও নিরাভরণ ও অসহায় করে তুলবে। শৈলীহীন ও নিরালম্ব করে তুলবে।

কোন হাত দিয়ে তিনি ধরবেন এই শূন্যতাকে? শূন্যতাকে বিন্যস্ত করে নেন ঈশ্বরের মতো করে। স্যামুয়েল বেকেটের নাটক ও উপন্যাস যেন শূন্যের সাংগীতিক বিন্যাস। যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা, ক্লান্তি ও অবসাদ, স্নায়ুর কেঁপে ওঠা, এসবের আড়ালে কির্কেগার্দ না শোপেনহাওয়ার তা জানতে চেয়ে লাভ নেই। রহস্যময় ও বিপজ্জনক এক ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে জরিপ করা? না কি মহাবিশ্বের কোনও উপগ্রহ থেকে মানুষকে দেখা?

যেখানে এক, দুই, তিন, চারজন মানুষ (যারা হতে পারে 'গোদোর জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে' নাটকে দিদি ও গোগো, পোৎসো ও লাকি; 'শেষ খেলা' নাটকে হ্যাম, ক্লোভ, ন্যাগ ও নেল; 'শেষ টেপ' নাটকে ক্র্যাপ; 'ফিল্ম' ছবিতে 'ও' এবং ক্যামেরা; 'সুখী দিন'-এ উইনি; 'নাটক'-এ W1, W2 বা M) হয়ে ওঠে ধ্বংস-হতে-থাকা এক মহাবিশ্বে মানুষের প্রতিনিধি।

যুদ্ধকালীন ফ্রান্স তাঁর কাছে মুক্ত আয়ারল্যান্ডের চেয়ে বেশি বাসযোগ্য মনে হয়েছিল বলে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন চিরকালের মতো। প্যারিসের বিপন্নতা ও আধুনিকতা তাঁকে দিয়েছিল নতুন এক দার্শনিক পরিসর। যা নামহীন, unnamable, যা মানবযন্ত্রণাকে পূর্ণতা দেবে। তাৎপর্যহীনতাকে তাৎপর্য, অসুখকে সুখ, ভালবাসাহীনতাকে ভালবাসা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার নাম কি গোদো? যে ঈশ্বরের মতো, কিন্তু ঈশ্বর নয়। নামহীন এক আপন প্রতিমা। বেকেটের 'গোদোর জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে' প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ৩ জানুয়ারি যে ছোট থিয়েটার তেয়ার্ত্র দ্য বাবিলোনে, তার হতভম্ব দর্শকরা (যাঁর মধ্যে ছিলেন জাঁ আনুই, যিনি ধরতে পেরেছিলেন সেই নাটকের যুগান্তকারিতা) কি জানত ওই প্লটহীন শূন্যতা একদিন হয়ে উঠবে মানবকথার নতুনতম চিহ্ন?

১৯৩৮ সালে প্যারিসে প্রুদাঁ নামে একটি লোক বেকেট-কে ছুরি মারার পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বেকেট সোজা জেলখানায় গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন এমন করলে?' লোকটি উত্তর দিয়েছিল, 'জানি না।' এই পিছল পৃথিবীর শেষ মডার্নিস্ট বেকেটও 'গোদো কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে উদ্ভ্রান্ত ভাবে বলেছেন, জানি না।

সমকালীন আরেকজনের মতো (চার্লি চ্যাপলিন) চটুল হাস্যরস আর গভীর দর্শনকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বেকেট। যেন দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' উপস্থাপন করছেন কয়েকজন ভাঁড়। তারপর দর্শনের পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় ভাসতে থাকল।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর (১৯৬৯) তিনি ঘামছিলেন, চোখে অদ্ভুত এক বিপন্নতা। তাঁর স্ত্রী সুজানের ভাষায়, এ এক বিপর্যয়।

৩৫ সেকেন্ডের একটি নাটকে ('নিশ্বাস'), অথবা কথাহীন এক মঞ্চে, অথবা অন্ধকারের ভেতর যেখানে শুধুই একটি ঠোঁট, মানুষের মহত্তম চিত্রপট কি তাঁরই আঁকা?

ESTRAGON. I can't go on like this.

VLADIMIR. That's what you think.

ESTRAGON. If we parted? That might be better for us.

VLADIMIR. We'll hang ourselves tomorrow.

[Pause]

Unless Godot comes.

ESTRAGON. And if he comes?

VLADIMIR. We'll be saved.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

VLADIMIR. Well? Shall we go?

ESTRAGON. Yes, let's go.

They do not move.

'ফিল্ম' নামে ছাব্বিশ মিনিটের যে ছবি করেন বেকেট, তাতে অভিনয়ের জন্য চ্যাপলিনকে চেয়েছিলেন তিনি। চ্যাপলিন রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত অভিনয় করেন কমেডিয়ান বাস্টার কিট্‌ন। সেখানে শুধু একটিমাত্র শব্দ ছিল, 'শ্‌শ্‌.....'।

ভাষা কি জীবনকে ছুঁতে পারে?

না।

NAGG. Our sight has failed.

NELL. Yes.

[Pause. They turn away from each other.]

NAGG. Can you hear me?

NELL. Yes. And you?

NAGG. Yes. [Pause.] Our hearing hasn't failed.

NELL. Our what?

NAGG. Our hearing.

NELL. No. [Pause.] Have you anything else to say to me?

NAGG. Do you remember?

NELL. No.

প্যারিসের এই সমাধিক্ষেত্রে দীর্ঘকায়, শীর্ণ ছায়ামূর্তিটি হেঁটে চলে যায় কুয়াশার ভেতর।

নৈঃশব্দ্য জমে থাকে বরফের মতো। আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে ওঠে। আর শব্দরা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে। টুকরো টুকরো কাগজে ঢেকে যায় পৃথিবী। আমাদের মুখে ছাইয়ের আস্বাদ।

৭ ডিসেম্বর ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪২

নৈঃশব্দ্য সেই বন্ধু যে কখনও
বিশ্বাসঘাতকতা করে না।— কনফুশিয়াস

এত রাতে আমি প্লাস স্যাঁ-মিশেলে রাস্তার ধারে বসে একটি ফরাসি বই পড়ছি! কিন্তু এটা তো প্যারিস, কেউ অবাক হচ্ছে না। ডানপাশে তৃতীয় নেপোলিয়ানের তৈরি ফোয়ারার জল ছিটকে এসে পড়ছে পায়ের কাছে। সামনে সেন নদীর কালো জল শীতে কাঁপছে। সাঁকোর ওপারে 'সোনার সূর্য' রেস্তোরাঁয় কারা বসে। দূরে নত্র-দাম গির্জা জ্বলছে জলছবির মতো।

এতক্ষণে সামনের 'জিবের জোন' বইয়ের দোকান ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু অনতিদূরে বুলিনিয়ের পুরনো বইয়ের পসরার সামনে মানুষের ভিড়। কখন কোথা থেকে আমার হাতে এল এই বই?

বইটি চেষ্টা করে উড়তে, কিন্তু পারে না। এত রক্ত জমে আছে তার ডানায়! এত কুয়াশা তার শরীরে!

আমার পায়ের নীচের প্যারিস নৌকার মতো দোলে। আমি বইটির কানে-কানে বলি, 'কেসকো ত্যু দি?' তুমি কী বলছ? সে তার ভারী ডানা দু'টি অর্ধেক খুলে যন্ত্রণার মূর্তি হয়ে থাকে।

আমি দেখতে পাই বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে মোমবাতি হাতে মেয়েটি হেঁটে যায় হেঁটে যায় হেঁটে যায়। তার মুখ দেখতে পাইনি। সে-মুখে কি কান্নার গোঙানি ছিল? সে-মুখ কি খুঁজেছিল লুকিয়ে পড়ার গর্ত?

মেয়েটি তার অস্বীকৃত পিতার হাত ধরে দূরে চলে যায়। সে কি এত রাতে লুকসাঁবুর বাগানের দিকে গেল, না আইফেল টাওয়ারের দিকে? হে শতভিষা, কত দূর আমি তোমার সঙ্গে যাব বলো?

আফ্রিকার দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের মরিশাস নামে এক দারুচিনি দ্বীপে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার]সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। মাজ়ারিন। আজ মাঝরাতে প্যারিসের ফুটপাথের এক কোণে বসে আমি তার লেখা উপন্যাস 'নিঃশব্দ' অনুবাদ করছি।

> Pour la première fois, je désire an enfant. Je fais ce livre pour toi, I'enfant qui viendra un jour...
>
> এই প্রথম আমি একটি সন্তান চাইছি। তোর জন্য এ বই আমি লিখছি।
>
> হে শিশু যে একদিন আসবে যাতে সে সেই শব্দগুলি এড়িয়ে যেতে পারে যারা আমার চোয়াল সেলাই করে দিয়েছে।... আটান্ন বছর তিনি আমার বাবা ছিলেন না। তুই সেই আটান্ন বছরকে খুঁজে পাবি না। তুই বুঝতে পারবি ওই আটান্ন বছর কোথাও নেই।
>
> দীর্ঘদিন আমি বাবার নামের বানান পর্যন্ত জানতাম না। আরও অনেকের মতো আমি বুঝে উঠতে পারতাম না সেই বানানে একটা r না দু'টো। আমার লজ্জা করত, মা'কে জিগ্যেস করতে পারতাম না, বাবাকে তো নয়ই, মি-তে-রাঁ নামটা কী করে লিখব।
>
> তিনি আমায় সব কথা বলেননি। অন্যদের কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই। ওই লোকগুলো শুধু নিজেদের কথা বলে। আমার নিজের কাছে আমার সাক্ষ্য সবচেয়ে জীবন্ত।

মাজ়ারিন। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁ-র অঘোষিত মেয়ে। সে লিখেছে সে বৃষ্টিকে চেনে না। না, না, চেনে না। তার কি মনে পড়ে তলস্তয়-কন্যা তাতিয়ানা-র কথা?

হ্যাঁ, পড়ে। সে তাতিয়ানার রুশ-উক্তিকে ফরাসিতে উদ্ধৃত করেছে। তাতিয়ানা লিখেছিল:

> আমি যদি নৈঃশব্দ্য থেকে নির্গত হয়ে থাকি, তার কারণ আমার বাবার বন্ধুদের কল্যাণে কয়েকটা বই বেরিয়েছে। যেখানে আমার বাবা-মা'র সম্পর্কে এক ভুল ছবি তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মা'র এক আংশিক বিকৃত ছবি। ওই বইগুলোতে বর্ণিত ঘটনাগুলো মোটের ওপর সত্যি, কিন্তু নিকোলাই গোগোলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, সেই সত্যের চেয়ে জঘন্য আর কিছু নয় যে-সত্য সত্য নয়।

সার্ত্র লিখেছেন, সমস্ত বৈধ সন্তান পয়সা না-দিয়ে পৃথিবীকে উপভোগ করতে পারে। Pas toi, pas moi। তুমি নও, আমি নই।

প্যারিসের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ছিন্নবেশ এক তরুণী। ভিক্তর য়্যুগো-র 'লে মিজ়েরাব্‌ল' উপন্যাসের কোজ়েৎ। সে যে জারজ! শুধুই জাঁ ভালজাঁ-র নয়, কোজ়েৎ-এর যন্ত্রণার রক্তদীপময় চিত্রপট এঁকেছেন য়্যুগো।

'কী আমার পরিচয় মা।' শঙ্খ ঘোষের কবিতার পংক্তি।

আমি দেখতে পাচ্ছি রাস্তায় ছড়ানো আছে অসংখ্য বই। রাজা আর্থারের কাহিনি, ভলতের-এর 'কাঁদিদ', 'টম জোন্‌স'-এর টম, জেন অস্টেন-এর 'এমা' উপন্যাসের হ্যারিয়েট, ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্‌ট্‌'-এর অলিভার, শেক্সপিয়রের 'রাজা লিয়ার' নাটকের এডমন্ড, 'ঝড়' নাটকের ক্যালিবান, 'তৃতীয় রিচার্ড' নাটকের রিচার্ড... ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে সামনে।

আমি মাথা তুলে দেখি মৃত্যুতমিস্রা পার হয়ে, নক্ষত্রলোক পার হয়ে, কালপুরুষের হিরের বর্শা ঝলমল করছে। সেই বর্শার ফলায় এত রক্ত!

মাজ়ারিন। তোমার নতুন উপন্যাসের নাম 'ল্য সিম্‌তিয়ের দে পুপে,' পুতুলের সমাধিক্ষেত্র। আমরা তো পুতুল মাজ়ারিন, সবই তো পুতুলনাচের ইতিকথা।

একজন, দু'জন, তিনজন, চারজন, পাঁচজন মানুষ বর্শা হাতে এগিয়ে আসছেন অন্ধকার অলিন্দের নীচ দিয়ে এই আলোর ফোয়ারার সামনে।

ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনা—আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায় উৎসব!

হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থ
শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরের প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এই সব ভয়াবহ আরতি!

তুমি কি জানো ওরা কে?

রাত-শেষের মৃদু আলোয় ওঁদের চিনতে পারছি। চলো, মহাপৃথিবীর ফোয়ারা থেকে একটু জল নিয়ে আসি, ওঁদের পায়ে দেব।

বর্শা হাতে ওই অবৈধ সন্তানদের নাম কনফুশিয়াস, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি আর টম পেন।

আপোলিনের আর আরাগঁ।

ওই ওরা বসে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই ঋদ্ধপরিচয়?
বনে ভরে আকাশকুসুম—
আপন সোপানে কারা জলস্রোতে দেখেছিল মুখ?
বুকে জ্বলে আগুনকুসুম—
আমি যে আমিই এই পরিচয়ে ভরে না হৃদয়?

('জাবাল সত্যকাম', শঙ্খ ঘোষ)

সামনে দাউ-দাউ চিতা জ্বলে। অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে সেদিকে হেঁটে চলেছেন তাঁরা।

৪ জানুয়ারি ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৩

এই নক্ষত্রহীন অমানিশার মধ্যে ওঁরা কারা?

উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সংগীতকারেরা। শ্যুবার্ট, শ্যুমান, শেষ পর্বের বেঠোফেন। এত রক্তাভ কেন তাঁদের মুখ?

যেন ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে যাচ্ছি আমি। বালুতটের অন্য কিনারে ওটা কে বসে? গ্যোয়েটে? তিনি বলছেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এই নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে আমি আর তরুণ নই!'

সমুদ্র এত চিৎকার করে যে, আরও সরে আসি আমি।

কী করে এত অসম্ভব বিষণ্ণ হতে পারে কারও মুখ? কে তুমি বসে আছ বেলাভূমিতে এত রাতে?

তিনি কাউকে বিশ্বাস করেন না। কাউকে না। সবই যে মৃত্যুতমসায় ঢাকা, অশুভ। বালিশের পাশে গুলি-ভরা রিভলভার, ধূমপানের আগুনও সরিয়ে রাখেন। দাড়ি কামাতেও ভয়, যদি ক্ষৌরকার তাঁর গলায় বসিয়ে দেয় ছুরি! বেঁচে থাকার জন্য একটু নিশ্বাস খুঁজছেন তিনি। শব্দহীন এক নির্জনতা। শব্দ তাঁর মাথায় ধাক্কা দেয়, তাঁকে উত্ত্যক্ত করে, পাগল করে দেয়। নৈঃশব্দ্যের জন্য মানুষের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করতে তিনি প্রস্তুত।

একটিও বন্ধু নেই তাঁর, বন্ধুহীন-ই থাকতে চান। মা নেই, স্ত্রী নেই, পরিবার-পরিজন নেই। শুধু বিষাদ-সিন্ধু। আর্তুর শোপেনহাওয়ার।

পোল্যান্ডের দানৎসিগে তাঁর জন্ম ১৭৮৮-র ২২ ফেব্রুয়ারি, ফরাসি বিপ্লবের দেড় বছর আগে। ব্যবসায়ী পিতা তাঁকে মানুষ করেন টাকাপয়সার লেনদেনের মধ্যে, যা তাঁকে করে তুলতে চাইল অনুভূতিহীন। মানুষের ধরনধারণ সম্পর্কে ভীত ও সন্দিহান এক বাস্তববাদী।

বাবা আত্মহত্যা করেন! ঠাকুমা উন্মত্ত হয়ে মারা যান। অসুখী মা মুক্তপ্রেমে বিশ্বাসী হয়ে ভাইমার চলে যান। মা'র সঙ্গে অন্তহীন বিরোধ ও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মতানৈক্য তাঁকে নারীদের সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু সরলীকৃত ধারণার দিকে ঠেলে দেয়। আর্তুর হয়ে ওঠেন উনিশ শতকের হ্যামলেট।

এত তিক্ত?

গ্যোয়েটে না কি তাঁর মা'কে বলেছিলেন তাঁর ছেলে এক বিরাট প্রতিভা! মা ক্রুদ্ধ ও হতাশ। একই পরিবারে দু'টি প্রতিভা কী করে সম্ভব? অন্ধকার এক সিঁড়ি থেকে বিবদমান সন্তানকে ঠেলে ফেলে দেন তিনি। শোপেনহাওয়ার বলতে-বলতে যান যে একদিন পৃথিবী তাঁকে চিনবে তাঁর মা হিসেবে, উলটোটা নয়। আর তাঁদের দেখা হয়নি।

যিনি মা'র ভালবাসা পাননি, তিনি বিশ্বচরাচরকে ভালবাসাহীন মনে করবেন না? সমস্ত মাঠ বিষণ্ণতার কুয়াশা দিয়ে মোড়া, সমস্ত খোরল থেকে উপচানো গরল। একেক দিন শীতের রাতে যখন রাইন নদীর জল ইস্পাতকঠিন হয়, শোপেনহাওয়ারের জ্বর আসে। জীবনের ঘূর্ণির ভিতর দাঁড়িয়ে এই মৃত্যুজ্বরকে এমন করে ক'জন অনুভব করেছেন? নারীর ক্ষণিক ভালবাসা তাঁকে স্বস্তি দেয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, গবেষণাপত্র লিখেছেন, কিন্তু মাথায় ঘুরেছে পৃথিবীর নতুন পাঠ: 'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ় উইল অ্যান্ড আইডিয়া', এক স্বতন্ত্র মহাগ্রন্থ, পাশ্চাত্য দর্শনের সবচেয়ে সুগঠিত ভাবনা-কাঠামোগুলির একটি।

আংটিতে স্ফিংকসের আত্মহত্যার ছবি, পৃথিবীর বিষণ্ণতম দার্শনিক। লোকে পড়ুক না-পড়ুক, বাহবা দিক না-দিক, কিছু এসে যায় না। কে যেন বলল, বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে সেই বই। শোপেনহাওয়ার উত্তর দেন, গর্দভ যদি আয়নার মধ্যে তাকায়, সে কি দেবদূতকে দেখতে পায়? কান্ট আর ভারতীয় দর্শন ছাড়া কাউকেই স্বীকার করেননি তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এবং তাঁর বইগুলিকে অগ্রাহ্য করে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একবারই যখন আমন্ত্রণ করে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী হেগেলের অধ্যাপনার মুহূর্তটিই বেছে নেন। যাতে ছাত্ররা, ভবিষ্যতের পৃথিবী হেগেলের শ্রেষ্ঠ প্রতিপক্ষকে বেছে নিতে পারে। তাঁর ক্লাসে প্রায় কেউই উপস্থিত ছিল না।

বোদল্যের তো বলেই ছিলেন কবিতার অন্যতম প্রধান শত্রু বিশ্ববিদ্যালয়। শোপেনহাওয়ার বিশ্বাস করতেন, দর্শনের প্রকৃত নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] গতের বাইরে। শিষ্য নীৎশে লিখেছেন, জার্মান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পণ্ডিতরা তাঁদের সঙ্গে শোপেনহাওয়ারের অমিল দেখে রাগে অন্ধ হয়ে যান। উনিশ শতকে এক হতাশ পাশ্চাত্য কি নতুন করে হতাশার কথা শুনতে চায়? না, কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করা যাবে কতকাল? যিনি জীবনের শিরা-ধমনীকে আচ্ছন্ন করা এক বিষণ্ণতার কথা বলেন? দারিদ্র আর ব্যর্থতা আর যুদ্ধের ভেতর পশ্চিমের মানুষকে ধীরে-ধীরে যতই ঘিরে ফেলে হতাশা, শোপেনহাওয়ার ততই খ্যাতির শীর্ষে উঠে যান!

শেষ তিরিশ বছর ভাড়া বাড়ির দু'টি ঘরে বাস করেছেন। সঙ্গে একটি কুকুর। যার নাম আত্মা!

১৮৬০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর একা প্রাতঃরাশ করতে বসেছেন। একটু পরে বাড়িওয়ালি এসে দেখলেন তখনও তিনি চেয়ারে বসে।

মৃত।

পাশে বসে তাঁর বেড়ালটি।

পৃথিবী আমার ভাবনা। পৃথিবী আমার উপস্থাপনা। এমন কথা লেখার সাহস ক'জনের হত? জীবন ছোট। সত্য শুধু কয়েকজনের জন্যই। আমাদের সত্য বলা ছাড়া উপায় নেই, কারণ সত্য টিকে থাকে। নির্বুদ্ধিতা বাঁচার শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। যান্ত্রিক ব্যাখ্যা নয়, অন্তরের ভাষ্য-ই পারে আলো, উত্তাপ আর বিদ্যুৎকে ধরতে।

ব্যক্তির প্রণোদনাকে একান্তভাবে বুঝতে চেয়েছেন তিনি। শোপেনহাওয়ার হেগেলের সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিচেতনাকে অস্বীকার করেছেন, তাঁর যুক্তিনির্ভর আশাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন মানুষের বেঁচে থাকাকে নির্ধারণ করে তার প্রাথমিক বাসনা, বাঁচার ইচ্ছে।

এই দিগ্বিদিকজ্ঞানহীন, যুক্তিহীন, অর্থহীন বাসনা এই পৃথিবীতে মানবকর্মের প্রধান চালিকাশক্তি। মানুষ যা চায় তা সে করতে পারে, কিন্তু যা চায় তা সে কামনা করতে পারে না। শোপেনহাওয়ারের 'will' ক্ষতিকর ও অশুভ এক 'অস্তিত্ব', যাকে এক যৌনতামুক্ত শুদ্ধতা ছাড়া কোনওভাবে মোকাবিলা করা যাবে না।

ইচ্ছে শুধু যন্ত্রণাই এনে দেয়। নান্দনিকতাই শুধু তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। সংগীত তাঁর কাছে শিল্পের শুদ্ধতম রূপ, একমাত্র রূপ, কারণ তা ইচ্ছের প্রতিলিপি নয়, ইচ্ছে নিজেই। সময়োত্তর, সর্বজনীন এক কথামুখ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুক্তিকে চিরকাল অস্বীকার করেছেন শোপেনহাওয়ার। কারণ তা শুধু এক আজগুবি চূড়ান্ততায় পৌঁছে দেয়। অনুভূতিগ্রাহ্য অন্তর্দৃষ্টি (intuition) ছাড়া কী আছে মানুষের?

পারে, শুধু করুণাই পারে, নৈতিকতার দিকে পৌঁছে দিতে। স্বার্থচিন্তা, ক্রোধ ও মাৎসর্যকে অতিক্রম করতে।

মানুষের উন্নতি হবে না। শেষ বিচারের আগে মানুষের জন্য কিছু অবশিষ্ট নেই। পৃথিবীটাই তো শেষ বিচার।

যৌনতার মতো এক অপরিহার্য উপাদানকে দার্শনিকরা কখনও ব্যাখ্যা করতে চাননি দেখে বিস্মিত হয়েছেন শোপেনহাওয়ার। মানুষের অন্দরে এই প্রবল শক্তি যুক্তির আগে ক্রিয়াশীল। যা কোনও মতেই তুচ্ছ ও তাৎক্ষণিক নয়, যা গভীর ও অতুল, যা নতুন প্রজন্মের জন্ম দেয়। ফ্রয়েডের প্রকৃত পূর্বসূরি কি তবে শোপেনহাওয়ার?

পশুদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা তাঁকে অন্য দার্শনিকদের চেয়ে আলাদা করেছে। মানুষ ও পশুর প্রকৃতিকে মিলিয়ে দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। এ যেন এক যৌথ অস্তিত্ব।

ভাগ্‌নার তাঁর মহাগ্রন্থটি প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছেন চারবার, তাঁর ওপর শোপেনহাওয়ারের ভয়ংকর প্রভাব স্বীকার করেছেন তিনি। পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে শোপেনহাওয়ার পড়তে পড়তে প্রায় আধ্যাত্মিক সুখ পেয়েছেন তলস্তয়। এমন অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কখনও হয়নি। আর নীৎশের 'গুরু' তিনি। তিনিই তাঁর অতিমানবের পথদ্রষ্টা।

শোপেনহাওয়ার ছাড়া আধুনিকতা হয়? বিশ শতকে শিল্পসাহিত্যের যে অন্যরকম দেখার দৃষ্টি, তার অনেকটাই জুড়ে আছেন তিনি। ফ্রয়েড, নীৎশে আর তিনি।

ওই যে সামনের বেলাভূমিতে তিনি বসে।
স্থির ও কঠিন।
এক রক্তদীপময় অন্ধকারে তাঁর ক্ষমাহীন চোখ জ্বলছে।

১৮ জানুয়ারি ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৪

অন্ধকার ক্রমশ তার ঈগল-ডানা বিস্তার করছে। কালশিরেয় ভরে উঠছে পৃথিবী। একটা সাদা হিমস্রোত আমার স্নায়ুমোহানার দিকে এগচ্ছে।

হে আকাশহংসী, বলো, এই পাতালজল থেকে বেরোব কী করে?

মাটিতে ছড়ানো আছে ছেঁড়া ক্যানভাস, পিকাসো-র 'গের্নিকা', কবিতার উর্ণ-কঙ্কাল। আমি এলোমেলো পা ফেলে পাথর পেরিয়ে হাঁটি। এই মেরুনিশীথে কী খুঁজছি আমি? কোন সবুজ সোনালি নীহারিকা? কোন অনাবিষ্কৃত অন্তরীপ?

আমার পায়ের কাছে কার শব? রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্তের? আমার মাস্টারমশাই জ্যোতিভূষণ চাকীর? অন্য কোনও বিদ্যার্থী দেবতার? না কি এক হারিয়ে-যাওয়া ধ্রুবতারার? হে নক্ষত্রবলাকা, ফেনশীর্ষ সাগরপারে নিয়ে চলো আমাকে।

না।

সময় থেমে গিয়েছে। ঘড়ির হাত দু'টি নতজানু।

অন্ধকারের ভিতর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি রক্তপলাশের মতো জ্বলছে, যা তিনি লিখেছিলেন তরুণ অমিয় চক্রবর্তীকে:

> আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু তার পরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশলাভ করলে। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায় তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তার পরে তার ঔদার্য্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাল্কা হয়ে দেখা দেয়।... কোনো শোকদুঃখের খুঁটিতে আমরা কেউই বাঁধা থাকব না। আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা— আমরা অনন্ত উৎসের মত সকল ঘটনার মধ্য দিয়েই নিজেকে নিত্য উৎসারিত করব, কোনো ঘটনাই পাথরের মত আমাকে অন্ধকারের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখবে না।

(২২ জুন ১৯১৭)

অন্ধকারে প্রত্যেক ছায়াটাকেই ভূত বলে মনে হয়—মনটা অন্ধকার করে থাকলে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে অকারণে বা অল্পকারণেই অপদেবতা বলে কেবলি ভ্রম হতে থাকে। খুব জোরে হাসতে শিখলে তারই আলোয় অনন্ত সংসারের মিথ্যে ভূতগুলো দৌড় মারে।

(২০ অগাস্ট ১৯১৭)

সুখ-দুঃখের খুব কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এ পর্যন্ত্য চলে এসেচি—কতবার হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়েচে। কিন্তু এইটেকেই আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি যে, বেদনার ভিতর দিয়েই জীবনটাকে নিবিড়ভাবে পেয়েচি।

(৩১ অক্টোবর ১৯১৭)

তুমি ঠিক জায়গাতেই গেছ—প্রকৃতি জীবনের ক্ষতস্থানে হাসপাতালের মত ত ব্যান্ডেজ বাঁধাবাঁধির উৎপাত করে না; সে মন্ত্র পড়ে চুম্বন করে দেয়। তার আদরের অ্যান্টিসেপ্টিকে না আছে জ্বালা, না আছে কড়া গন্ধ।

(৯ নভেম্বর ১৯১৭)

তুমি তোমার শক্তির অস্ত্রকে উল্টো করে ধরেচ, তার তীক্ষ্ণ ধারটা কেবলি তোমার নিজেকে বিঁধচে।

(১০ জানুয়ারি ১৯১৮?)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুমি তোমার মনের কোণে কেন অন্ধকার সৃজন করে তার মধ্যে আবৃত হয়ে আছ?... ঈশ্বর তোমাকে তোমার আত্মগুহান্ধকারশায়ী ব্যর্থতার মোহাবরণ থেকে উদ্ধার করে বিশ্বের উদার আলোকে মুক্তি দান করুন এই প্রার্থনা করি।

(১৬ এপ্রিল ১৯১৮)

তুমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলে, মাঝি তোমাকে নৌকোয় তুলে নিয়েচেন, এখন নির্ভয়ে তুফান কাটিয়ে পারের মুখে চলে যেতে থাক। এখনো মাঝে মাঝে পালের হাওয়ার বদলে ঝড়ের হাওয়া বইবে কিন্তু তাতে ভয় কোরো না।

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)

পুরু কাচের চশমা পরে নিয়ে জ্যোতিবাবু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। হাত দিয়ে ধুতির কোঁচা ধরা।

বললেন, দ্যাখ।

অন্ধকার আকাশের তলায় দেখতে-দেখতে একটি আলোর ময়ূর ফুটে উঠল। অবিকল সেইরকম কণ্ঠ, সেই পুচ্ছ। আলোর ফুলকিগুলো যেন ভাসছিল। তারপর ওই আকৃতি তরল হয়ে ভাসমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতন কাঠিন্য হারাতে শুরু করল। ময়ূরটির আকার যত বাড়ছিল, তার প্রত্যঙ্গগুলো ততই গলে যাচ্ছিল। কিছু সোনালি তারা, কিছু রূপালি স্ফুলিঙ্গ আরও ওপরে উঠে আকাশের তারাদল প্রায় যেন স্পর্শ করল...

এ তো বিমল করের 'খড়কুটো'-র শুরু। তাই না?

আজ আমাকে কয়েকটা প্রেমের কবিতা পড়ে শোনা। ফরাসি...

স্যর, বাংলা কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে যে—

বেশ, বাংলা, ইংরেজি—

বলে, হাজার অদৃশ্য নক্ষত্র-চুম্বিত নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দিয়ে বললেন, পড়্।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নীলিমাকে

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে-সাগর
অন্ধকারের সাগর—
তুমি তাতে স্নান করে এসো, নীলিমা,
তোমার চোখ হোক আরো নীল
চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরীর মতো।
আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ ক'রে ওঠে চাঁদ
তোমার আঁচলে লেগে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না
তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ;
বলতে পারো, সে-জ্যোৎস্না কি নীল হবে, নীলিমা,
নীল পাখির পালকের মতো?

জানি তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা ক'য়ে উঠলো—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এল স্বপ্নরা?)
নীল পাখির পালকের মতো?
জানি তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা ক'য়ে উঠলো—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এল স্বপ্নরা?)
আমার চোখ নরম হ'য়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

(সঞ্জয় ভট্টাচার্য)

রাত্রি

অতন্দ্রিলা,
ঘুমোওনি জানি
তাই চুপিচুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে
বলি, শোনো,
সৌরতারা-ছা[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—সুক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি—
কত দীর্ঘ দু-জনার গেলো সারাদিন,
আলাদা নিশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য দু-জনে দু-জনা—
অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না,
দেখি তুমি নেই।

(অমিয় চক্রবর্তী)

She tells her love while half asleep

She tells her love while half asleep
In the dark hours,
With half-words whispered low
As Earth stirs in her winter sleep
And puts out grass and flowers
Despite the snow.
Despite the falling snow.

(Robert Graves)

নীল রঙের পৃথিবী

পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো নীল
ভুল কোরো না, শব্দেরা মিথ্যে কথা বলে না
চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ওরা আর তোমায় গান গাইতে বলে না
পাগল ও প্রেমিকেরা
মেয়েটির প্রেমিল মুখ
সমস্ত গোপনীয়তা সমস্ত হাসি
আর উদারতায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেন সে পুরোপুরি মগ্ন হয়ে আছে।
ভোর তার গলায় পরেছে

ফুলগুলি সবুজ ফুল
একটি জানলার হার
ডানাগুলি ঢেকে ফেলা পাতা
তোমার মুখে সূর্যস্নাত আনন্দ
পৃথিবীর সমস্ত রোদ্দুর
তোমার সৌন্দর্যের রাস্তা জুড়ে।

(পল এল্যুয়ার)

নারী

সে যখন নারীর ওপর দিয়ে বয়ে যায়,
জল খুঁজে পায়
তার উৎস।

(য়্যুজেন গিলভিক)

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো:
চারিদিকে পিরামিড— কাফনের ঘ্রাণ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো: এশিরিয়— দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, স্নান।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের— ঘুছে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে?' শুধালো সে— শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'

(জীবনানন্দ দাশ)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছোট-ছোট নীল হীরের কুচির মতো বৃষ্টি পড়ছে। স্ফটিকের মতো সাদা জলের উল্লাস। বুকে হাঁটা কৃমি-কীটদের দেখা যাচ্ছে না আর।

একটিকেও না।

ধীরে-ধীরে খুলে যাচ্ছে আকাশময়ূরীর পেখম।

আকাশতলায় এখন আলোর ফুলঝুরি।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৫

'শিশুতীর্থ' কবিতার অগ্নিদগ্ধ পৃষ্ঠা উড়ছে। বিংশ শতাব্দীর সেই উল্কার মতো মহাকবিতা।

'পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো,/ স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে...'

এর মধ্যে এত আলো আসছে কোথা থেকে? এত স্বর্ণস্রোত?

প্রত্যুষের প্রথম আভা তাঁর কপোলে। অলৌকিক উষ্ণীষের মতো তাঁর সাদা চুল, দাড়িতে মৃদু শিহর। এমন আশ্চর্য দীপস্তম্ভ দেখেছে কি কেউ, কোথাও? মানুষের ইতিহাসে?

আবার জাগিনু আমি।
রাত্রি হ'ল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।
এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।

('বিস্ময়', 'পরিশেষে')

ওই তো বেতের চেয়ারে তিনি বসে আছেন, যেমন রানী চন্দ লিখেছেন, সামনে ছোট টেবিলে দু'খানি লিখবার খাতা, ছোট্ট ডায়েরিটি— তাতে কবিতা লেখেন, আর রয়েছে কলম রাখার ছোট্ট লম্বা রুপোর তারের কাজ করা তামার বাক্সটি। ধবধব করছে সাদা রেশমের মতো চুল ও দাড়ি।

সন্ধে নেমে আসছে। আস্তে-আস্তে হেঁটে কোনার্কের পশ্চিম দিকে ছোট্ট বাগানটিতে চলেছেন। একা।

'বিজয়া'-র চিঠি এসেছে। ছোট্ট একটি কার্ড: 'যদি তুমি আমায় কিছু লেখো।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইজিচেয়ারে বসে আছেন আধ-শোওয়া অবস্থায়। হাতে বই। রানীকে পড়ে শোনাচ্ছেন গোর্কির আত্মকথা। 'উদীচী'র পাশে বাগানে বহু দিন আগে বকুল গাছ লাগিয়েছিলেন। এত দিনে সে-গাছে ফুল ফুটেছে। সেই ফুল কেউ কুড়িয়ে এনে দিল তাঁর সামনে।

মাথা নীচু করে, ছবি আঁকছেন। পাশে কালি, কলম, রং আর হরেকরকম তুলি। পাশে পড়ে আছে প্রুফ। একটি প্রজাপতি উড়ে এসে বসেছে তাঁর চুলে।

আজ ভোরে তাঁর মুখ একেবারে রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। না কি জেকব এপ্‌স্টাইনের ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তি? এমনও হয়? মানব-মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি এমন আশ্চর্য রূপ কেউ দ্যাখেনি কোনও দিন, লিখেছেন স্যাঁ-জন পের্স।

ভাষার গর্ভযন্ত্রণা যাঁর শরীরে, যিনি প্রায় এককভাবে ইড়া-পিঙ্গলায় ধারণ করেছেন কবিতার অন্দরের ইতিহাস, তিনি এখন চিত্ররেখার গহনে ডুবে আছেন। কখনও রঙিন পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকছেন, রানী চন্দ ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে তাঁর হাতের কাছে রাখছেন।

> জানিস, আমি আর্টিস্ট নই। আমি যা আঁকি, তা মনের আগোচরে। ইচ্ছে করে আঁকা বা আঁকতে চাওয়া, তার একটা রূপ দেওয়া—তা আমার দ্বারা হয় না। হিজিবিজি কাটতে কাটতে, একটা কিছু রূপ নিয়ে যায় আমার আঁকা।... এবারে আমার একট আস্তানা করব। দোতলায় একটি ঘর শুধু, চার দিক থাকবে খোলা সেখানে বসে বসে কেবল ছবি আঁকব আর কিছু করব না; কোনও কাজের ভাবনা থাকবে না। ছবি আঁকতে আমি আনন্দ পাই; সেটা আমার খেলার মতন।
>
> (২৪ জুলাই ১৯৩৯)

> দেখ্ তো অন্ধের মতো বসে বসে এই ছবিখানি করলুম। শুধু লাইনেই রেখে দিলুম। এইতেই যখন ছবি একটা কথা বলছে তখন আর তাতে কিছু করা উচিত নয়।... আমার সব ছবিরই ভাব কেমন যেন বিষাদমাখা। হয়তো ভিতরে আছে আমার ওটা।
>
> (৩১ জুলাই ১৯৩৯)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষের কতকগুলো অহংকারের বিষয় আছে। যেমন আমার গান। আমি জানি সেখানে আমার একটা বিশেষত্ব আছে। আমি আপনার একটা অবজেকটিভ— মনস্তত্ত্বের একটা দৃশ্য পাই। কীরকম করে হৃদয়ে ভেসে উঠছে— কতখানি সত্য, সুখ, দুঃখ আইডিয়ালাইজ করছে। যেখানে সকল বিশ্বের হার্মনির মূল— আমার গানে সেখানে পৌঁছই।

আমার নাটকে অন্তত একটা কল্পলোকের ছায়া আছে, একটা কোণ অধিকার করেছি মাত্র।

কিন্তু আমার ছোটগল্পগুলো স্রোতের মতো বয়ে গেছে—বসন্তের ফুলের মতো ফুটে উঠেছে।

আমার ছবির বিষয়ে আমার নিজের বলবার কিছুই নেই।... ছবির জন্য এখনও অনেক সবুর করতে হবে আমাদের।

(২৬ মে ১৯৪১, দুপুর)

হাতড়ে হাতড়ে বেড়াই।

যখন ছবি আঁকতে শুরু করি, আমার একটা পরিবর্তন দেখলুম। দেখলুম গাছের ডালে পাতায় নানা রকম অদ্ভুত জীবজন্তুর মূর্তি। আগে তা দেখিনি। আগে দেখেছি, বসন্ত এল, ডালে ডালে ফুল ফুটল—এইসব। এ একেবারে নতুন ধরনের দেখা। কিন্তু এই রিয়ালিস্টিক মূর্তি কে দেখালে। আর্ট দেখালে।

(২৭ মে ১৯৪১)

ভাষা যে নদীর কলস্রোতের মতোই, কেবলি যাচ্ছে আর নূতন আসছে। আজকের ভাষা কাল থাকছে না। তাই আমিও মেনে নিয়েছি; দুঃখ নেই মনে। যতদিন আমি আছি, তারপরে দোরে তোমরা তালা বন্ধ করে দিও— বাতি নিভিয়ে দিও— আমার কিছু বলবার থাকবে না।

(২৩ এপ্রিল ১৯৪১। উদয়ন)

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে কল্পনা করছেন সাপে কামড়েছে। 'দেখতে দেখতে আমার সমস্ত শরীর ঝিমিয়ে এল, তারপরে মৃত্যুটা পর্যন্ত অনুভব করতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারি।' কখনও তন্দ্রার ঘোরে বলে উঠছেন: 'আকাশে তারা উঠেছে— আকাশে তারা উঠেছে—'

তাঁর কপালে মৃদু স্বেদ মুক্তোর মতো ফুটে আছে। এত যুদ্ধ কেউ কি লড়েছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে? বাণীমুখর ঋতুর ফসলে ভরে আছে এই স্বেদাক্ত শিল্পীর গোলা।

ওই তো 'পুনশ্চ' বাড়ির জানলার ধারে তিনি বসে। হাতে তাঁর আকাশপ্রদীপ। আমি আরেক রানী, রানী মহলানবিশকে লেখা, 'পথে ও পথের প্রান্তে'-র চিঠিগুলি খুলে বসি।

ভূমিকায় লিখেছেন (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫):

> পৃথিবী আপনাকে প্রকাশ করে দু'-রকমের চলন দিয়ে। একটা চলন তার নিজেকে ঘিরে-ঘিরে, আর একটা চলন বড়ো যাত্রাপথে— সূর্যের চারদিকে। পৃথিবীর বর্ষচক্রমণ্ডলে দেখা দেয় তার ঋতুপর্যায়, নানা জাতের ফল-ফসলের ডালি ভ'রে ওঠে, সর্বজনের পণ্যশালায়। আর তার দিনযাত্রায় দেখা যায় জলে স্থলে আলো-ছায়ার ইশারা, আকাশে আকাশে প্রকৃতির মেজাজ-বদল, সকাল-সন্ধ্যার দিকসীমানায় রঙের খেয়াল, ঘুম জাগরণের আনাগোনার পথে নানা কণ্ঠের কলকাকলি।
>
> এখন বেলা দু'টো। কেয়াফুলের গন্ধ আসছে— টেবিলের একপাশে কে রেখে দিয়েছে। এই বর্ষাদিনের দুপুরবেলাকার রোদ্দুর ঈষৎ আর্দ্র, তার উপরে যেন তন্দ্রার আবেশ...
>
> (৮ জুলাই ১৯২৮)
>
> আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে একটা সংকল্পের সম্পূর্ণ ধ্যানমূর্তি জেগে উঠেছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে vision। তখন বয়স ছিল অল্প, মনে দৃষ্টিশক্তিতে একটুও চালশে পড়েনি। জীবনের লক্ষ্যকে বড়ো করে সমগ্র করে স্পষ্ট করে দেখতে পাবার আনন্দ যে কতখানি তা ঠিকমত তোমরা বুঝতে পারবে কিনা জানিনে। সে আনন্দের পরিমাণ পাবে আমার ত্যাগের পরিমাপে। আমার শিলাইদা, আমার সাহিত্য-সাধনা, আমার সংসার— সমস্তকেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বঞ্চিত করে আমি বেরিয়ে এসেছিলুম। আমার ঋণের বোঝা ছিল প্রকাণ্ড, কাজের অভিজ্ঞতা ছিল নাস্তি। তার পরে সুদীর্ঘকাল এই দুস্তর অধ্যবসায়ে একলা পাড়ি দিয়েছিলুম। কাউকে দোষ দিইনি, কারো উপর দায় চাপাইনি, কারো কাছে ভিক্ষে চাইনি। তারি মাঝখানে সংসারের নানান দুঃখ গেল। কিন্তু সেই সময়টাতেই মনের ভিতরমহলে যেন সব আলোই জ্বলে উঠেছিল।

...দইওয়ালার হাঁক বলো আর প্রহরীর ঘণ্টা বলো কিছুই তুচ্ছ নয়— তারা বিরাট বাহিরের বাণীতেই প্রকাশ পাচ্ছে, সেই বাহির আমাকে সেদিন বলছিল আমার মধ্যে তোমার স্থান।

(৯ শ্রাবণ ১৩৩৫)

সবই তো সুরের আগুন, সবই তো সুর।

রানী মহলানবিশকে লিখেছেন, 'লিপিকা'-র গদ্যে সুর লাগাতে ইচ্ছে করে তাঁর। সেই গদ্যটি কি, যেখানে শ্মশান থেকে ফিরে আসা বাপ ছাদে উঠে দ্যাখে, তারায়-তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল?

সেদিন শ্রাবণে যখন বেলা দ্বিপ্রহরে ১২টা ১০-এ তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ল, তাঁর হাতে কে ধরিয়ে দিল পদ্মকোরক?

দূর থেকে দূরে আরও দূরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাঁর মুখাবয়ব। ওই 'সোনার তরী' কি এই ঘাটে এসেছিল, কোনও দিন?

হে শব্দের দেবতা, হে সুরের দেবতা, বলো, কত হাজার আলোকবর্ষ ধরে তৈরি হওয়া ওই অলোকসামান্য জীবাশ্মকে কেন আজ এক মায়াবীর নদীর পারের রূপকথা বলে মনে হয়?

১ মার্চ ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৬

সার্ত্র-এর কথা কি সহজে ফুরোয়?

চারপাশে ভনভন করছে মাছি। সারা ঘর, সারা রাস্তা, চতুর্দিকে এত চলমান মৃতদেহ দেখে তারা দল বেঁধে এসেছে। সমাধিহীন এইসব মৃত। ওই মাছিরা সন্ধের আবছায়ায় এক পচনের গল্প বলে। এক অবসন্ন গোধূলিতে যখন শরীর-নৌকো আর চলে না, জমে পাথর হয়ে থাকে কুয়াশার নদী, তখন ফিরে আসেন সার্ত্র। কোন প্রকৃত জীবনকে খুঁজে চলেছেন তিনি? একা।

অন্ধকার বাদুড়ের ডানার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সার্ত্র লিখেছেন, তাকে গ্রাস করছে অদ্ভুত এক বিষাদ যা উন্মত্ততার রহস্যময়ী সহোদরার মতো। চোখ দু'টি টনটন করে। ছোটবেলা থেকে ডান চোখে জ্যোতি প্রায় ছিলই না, অন্য চোখে আলো চলে যাবে যে কোনও মুহূর্তে, এই ভয়। কিন্তু কাজ থামানো যাবে না যে! চোখ বন্ধ করে লেখেন। কেউ কি জানে? ন'-দশ বছরের শৈশবের বিভ্রান্তি আর বিষণ্ণতা, যখন মা বিয়ে করলেন আবার, কি সেই বন্ধ চোখের পাতায় মুদ্রিত হয়ে থাকে?

সংগীতের স্রোত আছড়ে পড়ছে সেই নিশ্বাস-বন্ধ-করা মৃত্যুকর্দমের ভিতর। এত রাতে কে বাজায়? কে?

আমি প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারে ৪২, রু্য বোনাপার্তে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। এত দ্রুত? চারটি সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে সেই দরজা, যা নিজে-নিজে খুলে গেল।

দেখি পিয়ানোর সামনে বসে আছেন তিনি, সার্ত্র।

যন্ত্রণার সীমাহীন খোরল থেকে বেরিয়ে, স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সার্ত্র, এখন মাথা নিচু করে পিয়ানোর সামনে নিথর।

বাজাচ্ছেন শোপ্যাঁর 'নকটার্ন Op 15 No. 3 in G minor' এত কোমলতা?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বন্ধুরা জানে না।

সার্ত্র একমনে বাজাচ্ছেন বেঠোফেন, শ্যুমান, বাখ। বারবার দুই, তিন, চার ঘণ্টা ধরে, সারা সকাল। কখনও-বা সিমন দ্য বোভোয়ার-এর সঙ্গে, সারা সন্ধে। গুনো'র ফাউস্ট, ভাগনার। জিওভান্নি পেরগোলেসি।

মোৎসার্ট, মেনডেলসন। সংগীতের সঙ্গে একা, সার্ত্র। পাশে সিমন, অথবা দত্তক-কন্যা আর্লেৎ।

পাঁচ ফুট উচ্চতার এক আশ্চর্য মানুষ বাজাচ্ছেন বেঠোফেনের 'সোনাটা'গুলির কোনও-কোনও অংশ। 'মুনলাইট সোনাটা' বাজাতে কষ্ট হয়, শেষ দিকের 'সোনাটা'গুলি যে খুব কঠিন! বাইশ বছর বয়সে একোল নরমাল স্যুপেরিয়্যারে নিয়মিত সংগীতের ক্লাস নিয়েছিলেন তিনি।

ছবিটি ঝাপসা হয়ে যায়।

মা'র সঙ্গে প্যারিসের রু্য বোনাপার্তের বাড়িতে পিয়ানো বাজাচ্ছেন, সহকারী জাঁ কো অবাক হয়ে দেখছেন সেই দৃশ্য। বাজাচ্ছেন অপেরা।

ন'-দশ বছর বয়সে আলজ়াসে মামাবাড়ি শোয়াইৎজার পরিবারে বই আর সংগীতে ঘেরা তাঁর শৈশব ফিরে আসে। দাদামশাই, দিদিমা, মা সকলে সংগীতকার। মামারাও। মা'র জ্যাঠতুতো ভাই অ্যালবার্ট শোয়াইৎজারের সংগীতপ্রেমের কথা সকলের জানা। তার দীর্ঘকেশী, সুন্দরী, তন্বী মা বাজাতেন বেঠোফেনের দুরূহ 'সোনাটা'গুলি, গাইতেন শ্যুবার্ট আর ব্রাহ্‌মস্‌-এর লিডার। যখন আবার বিয়ে করে সমুদ্র-শহর লা রশেল চলে যান মা আন-মারি, বিরাট বসার ঘরে মা'র সঙ্গে বসে পিয়ানো বাজায় সেই দুঃখী বালক।

বন্ধুরা জানে না, জানতে চায়নি এই সার্ত্রকে। শতাব্দীর এক মহত্তম চিন্তকের এই অনন্ত নির্জনতা। রু্য বোনাপার্তে সিমন দ্য বোভোয়ার যখন লিখতেন নতুন কোনও লেখা, সার্ত্র নিঃশব্দে ফিরে যেতেন পিয়ানোতে। মেয়ে আর্লেৎ যখন গাইত গান, অথবা বাজাত বাঁশি, সঙ্গ দিতেন প্রবীণ সার্ত্র।

মৃত্যু-অন্ধকারের ঝড়ের মধ্যে 'সোনাটা' রচনা করছেন তিনি। তাতে ছিল প্রিয় সংগীতস্রষ্টা দ্যব্যুসি-র রেশ। ফরাসি সংগীতকারদের মধ্যে ক্লোদ দ্যব্যুসি আর মরিস রাভেল-কে তাঁর ভাল লাগে, ১৯৭৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন মিশেল কঁতা'কে। তখন হয়তো লেখার জন্য দিনে কুড়িটি করিডন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ট্যাবলেট খেতে হচ্ছে তাঁকে, অ্যাম্ফেটামাইন খেয়ে তিনি তিন গুণ গতিতে লিখতে চাইছেন।

'লিমাজিনের' বইয়ের শেষে শিল্পের 'néantisation' (শূন্যায়ন) আর অবাস্তবতার (I'irréel) কথা লিখেছিলেন একদিন ('T'oeuvre d'art est un irréel'), বেঠোফেনের সপ্তম সিম্ফনির উদাহরণ দিয়ে।

সামনের পার্কে শিকড়-বের-হওয়া এক উদ্ভট গাছের সামনে বসে আছেন কে? সার্ত্র? না, তাঁর 'বিবমিষা' উপন্যাসের আঁতোয়ান রোকাঁত্যাঁ! ওই উন্মুক্ত শিকড় কি তার অসহায় অস্তিত্বের প্রতীক?

ফ্রান্সের বুভিল শহরের এক হোটেলের কাফেতে এক কৃষ্ণাঙ্গিনীর গাওয়া জ্যাজ় রেকর্ড ('Some of these days you will miss me honey') বিপন্ন রোকাঁত্যাঁ-কে এক আশ্চর্য সুখানুভূতি দিয়েছিল। সে চলে যাওয়ার আগে হোটেলের ওয়েট্রেস মাদ্‌লেন সেই রেকর্ডটি আরেকবার বাজাতে চায়। রোকাঁত্যাঁ'র মনে হয় তা তার নীরস, তালগোল পাকানো, আকারহীন যন্ত্রণা ছিন্ন করে তার অস্তিত্বমূলে প্রবেশ করছে। রোকাঁত্যাঁ বোঝে ওই সংগীতের এক নিজস্ব জীবন আছে। ওই গ্রামোফোন, ওই রেকর্ড, ওই ছুঁচ সুরটির বাহ্যিক অস্তিত্বের চিহ্ন হলেও, ওই সংগীত তো বাস্তবের অতীত। ওই অকিঞ্চিৎকর সংগীতের গোপন আবেদনকে হাড়ের কন্দরে অনুভব করে সে।

রোকাঁত্যাঁ'র মাথায় শব্দ হতে থাকে। সেও তো সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু, হয়তো একটি বই, যা মৃত্যুকল্লোলকে অতিক্রম করে এক অন্তর্গত শৃঙ্খলায় সংহত হতে চায়।

ধমনী সরু হয়ে আসছে। রক্তে শর্করা। মস্তিষ্কের বাঁদিকে রক্তপ্রবাহ কমছে। রক্তক্ষরণের ফলে সুস্থ বাঁ-চোখটি ১৯৭৩ সালে অন্ধ হয়ে এল। রেটিনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শূন্যতাকে ভরাট করার জন্য সিমন দ্য বোভোয়ার নিরন্তর কথা বলে যান। সার্ত্র তবু ধূমপান ও মদ্যপান থামাচ্ছেন না। ১৯৭৭ সালে আথেন্সে দর্শনের ওপর বক্তৃতা দিয়ে ফিরে এসে প্রবল রক্তচাপে প্যারিসের রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফুসফুসে জল।

অ্যাক্টিভিস্ট, র‍্যাডিকাল, চিরবৈপ্লবিক সার্ত্র।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, প্রবল জ্বর। ২০ মার্চ ১৯৮০ ব্রুসে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। ধীরে-ধীরে সার্ত্র কোমায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাঁজ করা সাদা চাদরে মোড়া শব, ১৫ এপ্রিল।

'ফিগারো' লিখল সার্ত্র-এর মৃত্যুতে পৃথিবী দরিদ্র হল। মানবমর্যাদা ও ন্যায়ের জন্য তাঁর অন্তহীন সংগ্রাম একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে, লিখল 'ল্য মাত্যাঁ দ্য পারি'। বিংশ শতাব্দী ছিল সার্ত্র-এর শতাব্দী, লিখল 'লা লিবেরাসিয়ঁ'।

সার্ত্রপন্থীরা রাষ্ট্রপতি জিস্‌কার দেস্ত্যাঁর রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রত্যাখ্যান করলেন।

তিন কিলোমিটার রাস্তা ধরে মাথা-উঁচু মানুষের ভিড়। রাষ্ট্রের ধামাধারীদের কোনও স্থান সেখানে নেই।

'আমি মৃত্যুর কথা ভাবি না। আমার জীবনে তা আসবে না, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। একদিন জীবন শেষ হবে। কিন্তু মৃত্যু তাকে বিপর্যস্ত করবে না। আমি চাই মৃত্যু তাকে বিপর্যস্ত করবে না। আমি চাই মৃত্যু আমার জীবনে প্রবেশ করবে না, তাকে সংজ্ঞায়িত করবে না, আমার জীবন হয়ে থাকবে বাঁচার জন্য একটি আবেদন।'

১৯ এপ্রিলের সেই ভিড়। কালো কাপড়ে ঢাকা কফিন, প্যারিসের দাঁফের-রশ্‌রো'র ব্রোঞ্জের সিংহের ওপর চড়ে বসা মানুষরা। সার্ত্র-এর শরীর বুলভার রাসপাই, রু্য শোলকার, লা কুপোল রেস্তোরাঁ, লা রোতঁদ, রু্য দ্যু দেপার পার হয়ে ২৯ বুলভার এদ্গার কিনে'র (যেখানে কেটেছে তাঁর শেষ বছরগুলি) পাশ দিয়ে সাড়ে চারটেয় মঁপারনাস সমাধিক্ষেত্রে ঢুকল। বোদল্যের-এর অনতিদূরে সমাহিত করা হবে তাঁকে। ১৯৮৬ সালে একই দিনে ১৯ এপ্রিল সার্ত্র-এর পাশে রাখা হবে সিমনের শবাধার।

কিন্তু সেই ভিড় ঝাপসা হয়ে আসছে এক গভীর নীলাভতম ঘুমের ভিতর। দেখছি নির্জন এক ঘর।

সেখানে মাথা নিচু করে পিয়ানো বাজাচ্ছেন সার্ত্র। দর্শন, উপন্যাস, নাটক, আত্মকথা সব ফেলে।

একা।

১৫ মার্চ ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৭

কোন মহাজিজ্ঞাসার খোঁজে এত রাতে আমি এক টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে? চারপাশে পৃথিবী 'হাড়কংকরের মতো শুয়ে'। নীচে দীর্ঘকায় এক সাদা আলখাল্লা পরা মানুষ, তাঁর শুভ্র শ্মশ্রু উড়ছে! পায়ে জুতো নেই। পা থেকে রক্ত ঝরছে।

তিনি পড়ে চলেছেন তাঁর 'স্বীকারোক্তি' ('ইসপোভেদ', ১৮৭৯-৮০) থেকে:

> আমার জীবন থেমে গিয়েছে। আমি নিশ্বাস নিচ্ছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কারণ সেগুলো যান্ত্রিকভাবে হয়। কিন্তু আমার মধ্যে জীবনের কোনও লক্ষণ ছিল না।...
>
> কোনও জাদুকর এসে আমাকে যদি জিগ্যেস করতেন আমি কী বর চাই, উত্তর দিতে পারতাম না। আমার উত্তেজিত মুহূর্তে কামনা যদি থেকেও থাকে তা সত্যিকারের কামনা-বাসনা নয়। স্বাভাবিক মুহূর্তে আমি বুঝেছি সেটা একটা বিভ্রম ছাড়া কিছু নয়, আমি কিছুই কামনা করিনি। আমি সত্যকে জানতে চাইনি, তার সম্পর্কে আগাম একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম মাত্র। সত্যি কথা হল জীবনের কোনও মানে ছিল না।

আমার মাথা নত হয়ে এল। এ তো তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)! আমি কি তবে ইয়াসনাইয়া পোলিয়ানা-তে? তাঁর সঙ্গে হাঁটছি কোন লুপ্তপ্রায় নীড়ের খোঁজে? তাঁর পায়ের রক্ত অন্ধকারে জ্যোৎস্নায় মিশে নীল নক্ষত্রপথ তৈরি করেছে। যাঁর মহাগ্রন্থ 'যুদ্ধ ও শান্তি' (১৮৬৩-'৬৯), 'আন্না কারেনিনা' (১৮৭৩-'৭৭), অগ্নিশলাকা দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল অনেক তৃষ্ণার্ত অন্তরাত্মা, তাঁরই স্বীকারোক্তি শুনছি আমি:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি বেঁচে থাকা, হেঁটে চলা চালিয়ে গিয়েছি যতক্ষণ না পর্বতচূড়ায় উঠতে পেরেছি, যেখান থেকে স্পষ্ট বুঝেছি আমার সামনে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বাকি নেই। কিছু নেই শুধু জীবন আর মুখের বিভ্রম ছাড়া, যন্ত্রণা আর মৃত্যুর বাস্তব ছাড়া, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া।

এই সেই মুহূর্ত যখন আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, আর যেহেতু আমি মৃত্যুকে ভয় পেতাম, আত্মহত্যা এড়ানোর জন্য আমাকে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে যেতে হত।

ভয়, ঘৃণা আর বুকে কষ্ট ছাড়া ওই বছরগুলোর কথা আমি মনে করতে পারি না। আমি যুদ্ধে মানুষ মেরেছি (ক্রিমিয়া-র যুদ্ধের কথা বলছেন তিনি), অন্যদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছি তাদের হত্যা করব বলে, তাসের জুয়ো খেলেছি, চাষিদের শ্রমের ফসল খেয়ে তাদেরই শাস্তি দিয়েছি; যৌনসংগম করেছি, প্রতারণা করেছি। মিথ্যে কথা বলেছি, চুরি করেছি, সবরকমের ব্যভিচার করেছি, মাতলামি, হিংসা, খুন... এমন কোনও অপরাধ নেই যা আমি করিনি। অথচ এসবের জন্য আমাকে প্রশংসা করা হয়েছে। আমার সমসাময়িকরা ভেবেছেন, এবং এখনও ভাবেন, যে আমি তুলনামূলকভাবে নৈতিক।

এভাবে দশ বছর কেটে গেল।

সেই সময় আমি লিখতে শুরু করেছিলাম দম্ভ থেকে, স্বার্থপরতা থেকে, আত্মশ্লাঘা থেকে। জীবনেও যেরকম, লেখার ক্ষেত্রেও তাই। যশ ও অর্থের লোভে আমার ভালত্ব'কে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল, খারাপ মনোবৃত্তিগুলোকে প্রকাশ করতে হয়েছিল। আর আমি সফল হয়েছিলাম, প্রশংসিত হয়েছিলাম।

বলতে অদ্ভুত লাগছে, ভণ্ডামি ছাড়া কিছু ছিল না এই পেশার মধ্যে, যা আমি খুব শিগগিরই বুঝতে এবং ছুড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু লোকে যে-মর্যাদা আমাকে দিয়েছিল তা আমি প্রত্যাখ্যান করিনি: সেটা হল কবি, শিল্পী এবং গুরুর মর্যাদা। আমি মূর্খের মতো বিশ্বাস করেছিলাম যে আমি কবি ও শিল্পী, এবং নিজে কিছু না-জেনে অন্য সকলকে শেখাতে পারি।

যখন আমি সেই সময়ের কথা ভাবি, আমার মনের অবস্থার কথা চিন্তা করি, তাদের কথা ভাবি যারা আমাকে ঘিরে ছিল (এখনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেরকম হাজার-হাজার মানুষ আছে), আমার মনখারাপ হয়ে যায়, নিজেকে অত্যন্ত হাস্যকর লাগে।

সে-সময় আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমরা শুধু সর্বক্ষণ কথা বলে যাব। আর লিখব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর যত বেশি সম্ভব প্রকাশ করব, কারণ তাতে মানবজাতির মঙ্গল। আমরা হাজার-হাজার লেখক পরস্পরের বিরোধিতা করে, পরস্পরকে গালমন্দ করে, পরস্পরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য লিখে যেতাম আর প্রকাশ করে যেতাম। আমরা খেয়াল করতাম না যে আমরা আসলে কিছুই জানি না, আমরা জীবনের আসল প্রশ্নগুলোরই উত্তর জানি না— কোনটা ভাল, আর কোনটা অশুভ! আমরা একযোগে কথা বলে যেতাম, পরস্পরের কথা না-শুনে। কখনও-কখনও আমরা প্রশংসা পাওয়ার জন্য পরস্পরের প্রশংসা করতাম, কখনও আবার রেগে আগুন হয়ে পরস্পরের ওপর চিৎকার করতাম। অবিকল একটা পাগলা-গারদের মতো।

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, পৃথিবীর এক মহত্তম কথাশিল্পীর পক্ষে এমন নির্মম ও নির্মোহ আত্মনগ্নায়ন কি সম্ভব? পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে অতিক্রম করে, সেন্ট অগাস্টিন, রুসো'কে পার হয়ে স্বীকারোক্তির কোন স্তম্ভ রচনা করেছেন তলস্তয়!

দস্তয়েভস্কি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন, ফ্লবের তাঁর বিশালতা ও মনস্তত্ত্বে হতবাক হয়েছেন, মার্সেল প্রুস্ত ও টমাস মান তাঁর গুণগ্রাহী। প্রকৃতি ও উপন্যাস কি কখনও কোনও স্বর্ণিল বালুকাবেলায় মিশে গিয়েছে এইভাবে? রম্যাঁ রলাঁ-র 'জাঁ-ক্রিস্তফ' যে অন্য সব শৈলীর চেয়ে আলাদা, তার মূল উৎস যে তলস্তয় তা কেউ জানে?

আমি দেখতে পাচ্ছি তলস্তয় এখন হাঁটছেন ইয়াসনাইয়া পোলিয়ানা-র চাষিদের সঙ্গে, অথবা মস্কোয় বা সেন্ট পিটারস্‌বার্গে। ফ্রান্সে বসে আছেন ভিক্‌তর য়্যুগো-র সঙ্গে, যাঁর 'দুর্গতরা' ('লে মিজ়েরাব্‌ল') উপন্যাস তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, যাঁর সহজ সরল যুদ্ধের বর্ণনা তাঁকে 'যুদ্ধ ও শান্তি' লেখার সময় প্রভাবিত করে।

রাতের নীল আলোয় আমি দেখতে পাচ্ছি ১৮৫১ সালে ককেশাস চলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছেন ওই অ্যারিস্টোক্র্যাট, সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন, শুরু করছেন লিখতে।

গোর্কি আর চেখভের সামনে বসে নিজের লেখা পড়তে-পড়তে কাঁদছেন। 'আন্না কারেনিনা'-র লেভিন কি লিও তলস্তয়?

চাষিদের সঙ্গে কথা বলছেন আভিজাত্যকে পরিত্যাগ করা এক 'নৈরাজ্যের দার্শনিক'। পড়ছেন কনফুশিয়াস থেকে ক্রপতকিন, যাঁদের পৃষ্ঠা উড়ছে আগুনপাখির মতো। জীবনজিজ্ঞাসার আকাশজোড়া রামধনুর নীচে তলস্তয়।

'স্বীকারোক্তি'-তে লিখেছেন:

> সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন, আমার সমস্ত ইচ্ছে। যা নিরুত্তর রয়ে গিয়েছে।... উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি এক অরণ্যে হারিয়ে গিয়েছি।

আত্মানুসন্ধানের জন্য তলস্তয় গিয়েছেন রাজা সলোমনের কাছে। সলোমন বলছেন, 'দম্ভ, আত্মশ্লাঘা, শুধুই তাই। সূর্যের নীচে কী লাভের আশা করে মানুষ তার শ্রমের জন্য? প্রজন্ম যায়, প্রজন্ম আসে, পৃথিবী টিকে থাকে।... প্রজ্ঞাকে জানার জন্য আমি হৃদয় সঁপে দিয়েছি, উন্মত্ততা আর অপরাধকে জানার জন্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার মধ্যে আছে দুঃখ। যার জ্ঞান বাড়ে, তার কষ্ট বাড়ে।... জীবিতেরা জানে তারা বাঁচবে না, মৃতেরা কিছুই জানে না, তাদের কোনও পুরস্কার নেই, তাদের স্মৃতি মুছে যাবে, মুছে যাবে তাদের প্রেম ও ঘৃণা, তাদের ঈর্ষা ধ্বংস হয়ে যাবে। সূর্যের নীচে কোনও কিছুর একটি টুকরোও তারা পাবে না।'

বুদ্ধের সমীপে এসেছেন 'যুদ্ধ ও শান্তি'-র লেখক। তিনি বললেন, 'যন্ত্রণা, দুর্বলতা, বার্ধক্য আর মৃত্যুচেতনা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা অসম্ভব। জীবন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে হবে, জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা থেকে।'

নিজেকে মুক্ত করতে শিখলেন তলস্তয়। তলস্তয়ের সে কী মুক্ত রূপ! আজ মধ্যরাতে এক ভেসে যাওয়া মহাদেশের টিলার ওপরে তাঁর মাথায় নক্ষত্রের মুকুট।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি আত্মহত্যা থেকে ফিরে এলাম।

অভিজাত শ্রেণির জীবন প্রত্যাখ্যান করলাম আমি, কারণ সেটা জীবনই নয়, জীবনের ছায়া শুধু। যে-বিলাসিতার মধ্যে আমি বাস করেছি তার মধ্যে জীবনকে অনুধাবন করা যায় না।

এ এক নতুন তলস্তয়। 'যুদ্ধ ও শান্তি' ও 'আন্না কারেনিনা' (যেটিকে একসময় তাঁর প্রথম সত্যিকারের উপন্যাস বলেছিলেন) বাস্তবানুগ নয় বলে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি।

প্যারিসে এক প্রকাশ্য গিলোটিন দেখার পর ভাসিলি বডকিন-কে লিখেছিলেন তিনি: 'রাষ্ট্র হল সেই ষড়যন্ত্রী যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল শোষণ করা এবং মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলা।...এরপর সরকারের অধীনে কোথাও কোনও কাজ করব না আমি।'

অন্নদাশংকরের বিনুর ভাষায়, 'মাটির প্রাণরহস্যের এই মহান সন্ধানী' সব পোশাক খুলে, জুতো পর্যন্ত, নেমে এলেন ঘাসের ওপর। তুলে নিলেন এক অন্য কলম। ব্যক্তিসম্পত্তির বিরোধী রাজকুমারটি এখন শুধু কৃষকের বন্ধু। শরীর-মোহ ও স্বাদ থেকে মুক্ত এক শুদ্ধতার পূজারি।

বিনু লিখেছিল, তলস্তয়ের কাছে তার শিক্ষানবিশি স্টাইলের জন্য নয়, স্টাইলকে অতিক্রম করার জন্য।

লিখেছিল:

'টলস্টয়ের কিছুই গোপন নেই। তিনি কিছুই হাতে রাখেননি,... পাঠকের হাতে সঁপে দিয়েছেন জীবন-যৌবন পাপ-পুণ্য জ্ঞান-অজ্ঞান। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন, বোধ হয় পেরেছেন।

...এ কেবল স্টাইলের বেলায়, তা নয়। টলস্টয় তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে গৃহত্যাগ করেছিলেন। জীবনের কাছে সত্যরক্ষার জন্য তেমন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। যার জীবন সত্য নয় তার লিখন সত্য হবে কোন জাদুবলে?'

এককালের প্রধান সহযোগী স্ত্রী সোনিয়া দুর্ব্যবহার করছেন, নিষিদ্ধ হচ্ছে তাঁর লেখা, গির্জা তাঁকে বহিষ্কার করছে। কিন্তু তাতে কী? লিখে চলেছেন, 'ইভান ইলিচের মৃত্যু' (১৮৮৬), 'ক্রোয়েটজার সোনাটা' (১৮৮৯),

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ভাসক্রেসেনিয়ে' (১৮৯৯), 'হাজি মুরাদ' (১৯০৪)। সন্তর্পণে প্রত্যাখ্যান করছেন নোবেল পুরস্কারের প্রস্তাব, যা প্রায় কেউই জানে না।

১৯১০ সালের ২০ নভেম্বর আস্তাপোভা রেল স্টেশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। স্টেশন মাস্টার নিয়ে এসেছেন তাঁর ঘরে। মর্ফিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে।

হাজার-হাজার চাষি হাঁটছে তলস্তয়ের শবযাত্রায়। প্রশাসন হিমশিম যাচ্ছে সেই ভিড় সামলাতে!

সমাধিক্ষেত্রে নীল আগুন জ্বলছে। দূরে সিলুয়েটের মতো বসে আছেন য্যুগো, দস্তয়েভস্কি, গোর্কি, চেখভ। 'জাঁ-ক্রিস্তফ' হাতে রম্যাঁ রলাঁ, একটু দূরে দক্ষিণ আফ্রিকার এক তরুণ আইনজীবী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি তলস্তয়ের 'এক হিন্দুকে লেখা চিঠি' (যেখানে বলা হয়েছিল অহিংসা-ই ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতের মুক্তির একমাত্র পথ) পড়ে একবছর ধরে তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখেন। তিনি তলস্তয়কে সম্মান জানাতে এসেছেন 'সমকালে অহিংসার শ্রেষ্ঠ পুরোহিত' হিসেবে। এসেছেন মার্টিন লুথার কিং।

জলের শব্দ।

আজ ভোররাতে মহাদেশ কেঁপে উঠছে। আকাশে উড়ন্ত ফেনার মতো অগণন পাখি।

৫ এপ্রিল ২০১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৮

এক ধূসর প্রান্তর দিয়ে খুব জোরে ধাবমান এক ক্যামেরা। ছিটকে যাচ্ছে জ্বলন্ত ল্যাম্পপোস্ট, অন্ধকার বাড়ি, উলটে থাকা মাস্তুল, কার যেন গোঙানি, কেউ হেসে উঠল, বন্দরের দৃশ্য। জল, জল।

ঘুমের ভিতর আমি বলছি, এটা কি ভেনিস? একটি সুপুরুষ ঊনত্রিশ-তিরিশ বছর বয়সি যুবক রাসকিনের 'স্টোন্‌স অফ ভেনিস' পড়ছে। পাশে 'সেন্ট মার্কস রেস্ট'। কখনও দেখছি সে ফ্রান্সে গ্রামের বাড়িতে বসে তলস্তয়ের 'রবিবার'-এ (ইংরেজিতে অনুবাদে যার নাম 'রেজারেকশন') মগ্ন হয়ে আছে। কিংবা রাসকিনেরই 'দ্য সেভেন ল্যাম্পস অফ আর্কিটেকচার'-এ। ইংরেজি পড়তে কষ্ট হলেও সে রাসকিন অনুবাদ করে। পড়ে স্তাঁদাল, ফ্লবের, দস্তয়েভস্কি আর জর্জ এলিয়ট।

প্যারিসের লিসে কঁদরসে-র এগারো-বারো বছরের ছেলেটি অ্যাজমায় ভোগে। কাশির দমক কমাতে তাকে ইলিয়ে গ্রামে পাঠানো হয়। জন্মস্থান ওতোই-এর স্মৃতি মিলেমিশে থাকে তার মনে, তৈরি করে এক অভ্রময় জগৎ, এক কল্পনার শহর, যার নাম 'কঁব্রে'। গুঁড়ো-গুঁড়ো সোনা-রূপোয় ভরে ওঠে তার স্নায়ু। ধীরে-ধীরে ঘুমের দরজা ঠেলে তৈরি হবে খণ্ড-সময় ও মহাসময়ের এক নিশ্বাস-বন্ধ করানো ভাস্কর্য, আধুনিক সাহিত্যের আশ্চর্য এক মিনার। যা রং-তুলি, ছেনি-বাটালি আর অনেকখানি হীরকদ্যুতি দিয়ে তৈরি।

প্রুস্ত! মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২)! নামটা উচ্চারণ করতেই একটা সাতরঙা বিদ্যুৎ-বিভা জ্বলে উঠল কোথাও, জলের ওপর ঝরে পড়ল একটি ফুল, থেমে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর নাচের ছন্দে ভেসে গেল।

টুকরো-টুকরো জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুপুঙ্খ জুড়ে-জুড়ে এ কি অব্যক্ত যন্ত্রণা আর শরীর-স্বাদের কাহিনি! দু'হাজার চরিত্রের এক অবিস্মরণীয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্যালারিতে লণ্ঠন হাতে নিয়ে চলেছেন প্রুস্ত, সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার এক সাত খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসে, যার নাম 'হারিয়ে যাওয়ার সময়ের সন্ধানে'। কোনও-কোনও চরিত্র আলোয় ভাস্বর, কারও ওপর মৃদু আলো পড়েছে। কেউ-কেউ আধো-অন্ধকারে থিরথির করে কাঁপছে। কেউ জ্বলছে দীপশিখার মতো, কেউ আবছায়ায় পাথর হয়ে আছে।

আমি ঘুমের মধ্যেই বলছি, আহ্ কী করে হল, কী করে হল! এ কী আশ্চর্য জীবনপাঠ! এখানে ছড়ানো আছে কন্দরে-কন্দরে অভিজাতদের বিবরণ, নারীরহস্য, সমকামিতা, কারুকার্যখচিত কাচ, মৃত্যুচেতনা... জীবনের সব কিছু।

ঘুমের মধ্যেই সমালোচক জাঁ-ইভ তাদিয়ে আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'লা কাতেদ্রাল দ্যু তাঁ' ('দ্য ক্যাথিড্রাল অফ টাইম')। সময়ের অনন্ত প্রবাহ ও প্রতিপ্রবাহের ঢেউ তার স্বর্ণিল চঞ্চলতা নিয়ে স্থিরচিত্র হয়ে আছে এই সাত খণ্ডে। সর্বকালের সেরা? হয়তো তাই, এত স্ফটিক তার সারা গায়ে, এত ক্ষত!

প্রুস্তের জন্ম ফ্রান্সের ওতোই-তে ১৮৭১ সালে। বাবা প্যাথলজিস্ট ও কলেরা-বিশারদ। ১৫ বছর বয়সে মেধাবী ছাত্র প্রুস্ত লিখেছিলেন, দুঃখ মানে মা'র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। প্যারিসের ফ্যাশনদুরস্ত সালোঁতে ঘুরে-ঘুরে জীবনকে দেখা।

১৯০৮ সালে পঁচাত্তর পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস শুরু করেন। পরের বছর আবার। এবার 'সোয়ানের বাড়ির কাছে' আর 'গেরমাঁতের দিকে'-র খসড়া। ১৯১১ সালে একদিকে ভাগনার আর দ্যব্যুসি শুনছেন, অন্যদিকে চলছে প্রস্তুতি; টাইপ করা শুরু হল। প্রকাশকের খোঁজ চলে। বিখ্যাত প্রকাশনা-সংস্থা ওলেনডর্ফ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯১৩ সালে প্রকাশক 'বেরনার গ্রাসে' রাজি হল বই ছাপতে।

ফরাসি সাহিত্যের এক প্রধান সৌধ প্রথমবার ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হল হলুদ রঙের প্রচ্ছদে। বইয়ের নাম ছিল 'হারিয়ে যাওয়া সময়ের সন্ধানে: সোয়ানের বাড়ির কাছ থেকে'। বলা হয়েছিল পরের বছর বেরবে আরও দুটি খণ্ড: 'গেরমাঁতের দিকে' আর 'ফিরে পাওয়া সময়'। বোঝা গিয়েছিল তিনটি উপন্যাসের একটি বৃত্ত রচিত হতে চলেছে।

'কঁব্রে' নামে সেই কল্পনার শহর জেগে ওঠে ঘুম থেকে, হয়ে ওঠে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের ধমনী। কথকের (যার পারিবারিক নাম নেই) বয়স হয়েছে। রাতে ঘুম হয় না (প্রুস্ত রাতে ঘুমোতেন না, লিখতেন), তার মনে পড়ে যায় সেইসব ঘরের কথা, যেখানে সে শৈশবে দিনরাত্রি অতিবাহিত করেছে। ছেলেবেলায় তার গ্রামের বাড়ির শোওয়ার ঘরে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছিল! অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত মা'কে সে জোর করে ঘরে এনে তাকে চুমু খেতে বাধ্য করেছিল, বাধ্য করেছিল, গল্পের বই পড়ে শোনাতে। সেদিন থেকেই তার অস্তিত্বের বেদনার বিন্দুগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তকে ঘিরে রাখে অসংখ্য চরিত্র, আত্মীয়, বন্ধু— যাদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। যেমন, সোয়ান, প্যারিসের সেই অত্যাশ্চর্য ধনী।

ছিল অন্যরকম ধাক্কাও। সেই স্মৃতি যা অনর্গল অপ্রতিরোধ্য গতিতে বয়ে চলে, প্রবীণ কথক চায়ে চুমুক দিলে যা মনে পড়ে। আদল্‌ফকাকা, ওদেৎ, ব্লক, সাহিত্যিক বের্গৎ, ফ্রাঁসোয়াজ়, এক বৃদ্ধা পরিচারিকা। তারপর একটু পরে রাস্তার দুটি দিক যা শুধু রাস্তা নয়, নায়কের জীবনকেও দুটি ভাগ করে দিল; সোয়ানের বাড়ির (যেখানে ছিল সোয়ানের মেয়ে জিলবের্ত) পথ আর গেরমাঁতের পথ (যা এক বিরাট পৃথিবীর সিং-দরজা)। বেড়াতে-বেড়াতে কথক দেখেছিল এক ভয়ংকর কষ্টের দৃশ্য: কুমারী ভ্যাঁতই আর তার এক বান্ধবী ভ্যাঁতই-এর একটি ফোটোগ্রাফ নষ্ট করছে। ওই দৃশ্যে সমকামিতার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ধর্ষকাম। হঠাৎ দৃশ্যটি মুছে যায়।

'সোয়ানের প্রেম' ('লামুর দ্য সোয়ান') ছিল পনেরো বছর পিছিয়ে যাওয়া এক কাহিনি। যেখানে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল গণিকা ওদেৎ-এর প্রতি সোয়ানের ভালবাসা, যে-ওদেৎ তাকে ভালবাসে না এবং তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে। এখানে আমরা প্রুস্তীয় প্রেমের প্রথম আভাস পাই— যা ভালবাসা, ঈর্ষা আর বিস্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

কথকটির বাল্যস্মৃতি তাকে জায়গার নাম নিয়ে খেলা করায়, প্যারিসের শাঁ-জ়েলিজ়ে'তে সে ঘুরে বেড়ায় জিলবের্ত-এর সঙ্গে, আর নিঃশব্দে প্রেমে পড়ে।

১৯১৩ সালে কথক ফিরে আসে প্যারিসের পশ্চিম উপকণ্ঠে বুলন-বনে, যা বদলে গিয়েছে। কথক বলে, 'বাড়িঘর, রাস্তা, রাজপথ সব হারিয়ে যায়, দিনগুলোর মতো।'

প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্র যেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পটে আঁকা একেকটি পূর্ণ চালচিত্র,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
একটি উপন্যাস। যেন আলাদা-আলাদা 'হারিয়ে যাওয়া সময়ের সন্ধানে।' লিখতে-লিখতে এমনকী টাইপ করা পাণ্ডুলিপিতেও নিরন্তর কাটাকুটি করেন প্রুস্ত, যতক্ষণ না এক অসামান্য জীবন-স্রোত তৈরি হয়।

Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire 'Je m'endors.'

(দীর্ঘদিন আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তাম। মাঝে-মাঝে যখন আমার মোমবাতিটা সবেমাত্র নিভেছে কি নেভেনি, আমার চোখ দুটো এত দ্রুত বুঁজে যেত যে নিজেকে এটুকু বলারও সময় পেতাম না: 'আমি ঘুমিয়ে পড়ছি।')

Jean releva la tête et vit que sa mère regardait Santeuil sans parler...

(জাঁ মাথা তুলে দেখল তার মা সাঁত্যই-এর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্য, যেমন ডিনারের পরে প্রায়ই ঘটত, বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার ভুরু কুঁচকে আছে, ঠোঁটে একটি ভঙ্গি শুধু, এবং যেহেতু তিনি এখন আর তাকিয়ে নেই, সেই অভিব্যক্তির অর্থ করা যাচ্ছে না, যা এখন চোখের পাতার নীচে নিপুণভাবে ঢাকা, এবং পুরো মুখমণ্ডল একই সঙ্গে দুর্বোধ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে আছে একটি শক্তিশালী ও দুরধিগম্য ইচ্ছের মতো। আমরা শুনতে পাচ্ছি নিয়মিত শ্বাসের ওঠাপড়া। শব্দ, যা কোনও ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কোনও ইচ্ছেপ্রসূত নয়, যা একটি কথা বা একটি গান নয়, কেবল একটি আওয়াজ যা ধ্বনিত হচ্ছে নিজেকে না-শুনে, বালির ওপর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দের মতো আপন ও রহস্যময়, কিংবা গাছের পাতায় হাওয়ার মতো। জাঁ এবং তার মা একটিও কথা না-বলে একসঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে থেকেছে, পরস্পরের দিকে তাকানোর সাহস না-পেয়ে, দু'জনেই ভয় পেয়েছে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাতে, পাছে সেখানে ধরা পড়ে যায় সেই চিন্তা, একদিন সাঁত্যই-র ঘুম আর ভাঙবে না)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এভাবে খুলতে থাকে শরীর ও মনের নানা স্তরের পাপড়ি। অনুভব করা যায় প্রেমিকার গালের স্পর্শ, নিশ্বাস। শারীরিক উত্তেজনার তাপ। আলবের্তিনের ঘুমের যে দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন প্রুস্ত সাহিত্যের ইতিহাসে তার জুড়ি নেই।

প্রুস্তের সবচেয়ে বিখ্যাত চরিত্র শার্ল সোয়ান এক ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীর ছেলে। সে এক ইজরায়েলি বংশোদ্ভূত ড্যান্ডি, ফুলবাবু। কঁব্রে-র তাঁসঁভিল প্রাসাদের এই মালিক তরুণ কথকের মনে গভীর ছায়া ফ্যালে তার ঝোড়ো আবির্ভাব দিয়ে। পনেরো বছর আগে সে ওদেৎ নামে এক বেশ্যার প্রেমে পড়ে। তাঁকে খুঁজতে একটি সালোঁ-তে ঢুকে সে হঠাৎ শোনে পিয়ানো আর বেহালায় বাজানো এক স্বপ্ন-সোনাটা, যার ছোট একটি ধুয়ো তার কাছে হয়ে ওঠে প্রেমের 'জাতীয় সংগীত': 'ধীর পায়ে ওই সে আসে, ওই আসে সে সুখের খোঁজে, যা মহৎ অধরা কিন্তু স্পষ্ট।' ঈর্ষার যন্ত্রণাকে চিনে, তারপর বিস্মৃতির নানা স্তর, সেই প্রেম হয়ে ওঠে সমস্ত প্রুস্তীয় প্রেমের রূপরেখা।

শিল্পরসিক সোয়ান এক বিস্মৃত শিল্পীর (ভেরমের) কাজ ('শিল্পের অবিবাহিত') নিয়ে গবেষণা করে, যা অসমাপ্ত থেকে যাবে। সোয়ান সেই বর্ণিল মানুষ যে প্রতিভাবান অথচ অলস, যার জীবনের শেষ পর্যন্ত কোনও অর্থ নেই, যা নারীপ্রিয়তা ও পার্থিব সুখের পিছনে অস্থিরভাবে ধাবমান।

একটি পার্টিতে দেখা হওয়া প্রিয় কথাশিল্পী আনাতোল ফ্রাঁস রূপান্তরিত হন বের্গৎ-এ। প্রুস্তের তিনজন বন্ধু (দানিয়েল আর্লেৎ, ওরাস ফিনালি ও ফ্রাঁসিস ক্রোয়াসার) মিলেমিশে তৈরি হয় সোয়ানের প্রবীণ বন্ধু আলবের ব্লক। যুদ্ধের সময় সে কেউকেটা বনে যায়, ছদ্মনাম ধারণ করে, ওপর-মহলে যাতায়াত শুরু করে। সেইসঙ্গে শুরু করে কথকের লেখা থেকে চুরি!

প্রেম, তা সে ওদেৎ-এর জন্য সোয়ানের প্রেমই হোক, কিংবা জিলবের্তের জন্য কথকের, এক অধরা মায়া হিসেবে শুরু হলেও ক্রমশ একটি অসুখের রূপ নেয়। ভালবাসার মানুষটি এক গোপন রহস্যমদির অরণ্যের মতো, কখনও তার প্রকৃত দৃষ্টিকোণ বোঝা যায় না, সত্যিকারের অনুভূতি ছোঁয়া যায় না। অতঃপর সে অনিবার্যভাবে প্রতারণা করে, অস্তিত্বের খাঁজে-খাঁজে ছোবল মারে ঈর্ষা, যা অতীত ও বর্তমানকে প্রভাবিত করে।

চিন্তার প্রতিটি বিন্দু ধরা আছে এর পাতায়, কণ্ঠস্বরের কম্পন পৃষ্ঠার ঠোঁটে। সোয়ান কথা বলুক, বা ব্লক, আলবের্তিন, শার্লুস কিংবা ভেরদ্যুর‍্যাঁ,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা শুনতে পাই, লিখেছেন জাঁ ককতো, এক নিবিড় হাস্যোদ্ভাসিত গলা, যা কাঁপছে, যা এক দীর্ঘ কথনের ছোট ছোট কক্ষ, বারান্দা, করিডর, সৌজন্য, অট্টহাসি পেরিয়ে প্রুস্তের মুখরেখা ছুঁয়ে থাকে।

এই কণ্ঠস্বর কণ্ঠা থেকে নয়, শরীরকেন্দ্র থেকে শরীরস্বাদুতা নিয়ে উঠে আসে। কেউ পারেনি এমন করে কণ্ঠস্বরের অনুগামী হতে, লিখনের সুষুম্নায় মিশে যেতে। এমন এক চোখ যা সব দেখতে পায়, বাহির ও অন্দরের সব প্রতিফলন যা বিস্ময়কর এবং যা আটপৌরে, চেনা।

প্রুস্তের রচনায় স্মৃতিকে উপস্থাপনের আনন্দের কথা বলেছেন মরিস ব্লাঁশো, যা সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ এই টেক্সটের ভিতর অন্তঃস্যূত হয়ে আছে।

রাতের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখি জীবনের লাভা গড়িয়ে পড়ছে, কেবলি গড়িয়ে পড়ছে।

এত রাতে প্যারিসের ১০২ বুলভার ওসমানে আমি প্রুস্তকে খুঁজছি, রু্য লোরাঁ-পিশায়, ৪৪ রু্য হ্যামলিনে।

ওই যে প্রুস্ত পুড়িয়ে ফেলছেন পাণ্ডুলিপির বত্রিশ পৃষ্ঠা।

শুয়ে আছেন বিছানায় সারা রাত না-ঘুমিয়ে। মুখে কী অপার বিষণ্ণতা!

১৯২১ সালে আঁদ্রে জিদ'কে তিনি বলেন যে তাঁর নিবিষ্ট পুরুষপ্রেম তাঁকে নারীপ্রেম বুঝতে সাহায্য করেছিল, জিদ লিখেছেন তাঁর জার্নালে।

১৯২২ সালে মৃত্যুর কিছু দিন আগে ডিনার খাচ্ছেন পিকাসো, জেমস জয়েস আর স্ত্রাভিন্সকি-র সঙ্গে। কী কথা হয়েছিল জয়েসের সঙ্গে প্রুস্তের? না, তেমন কিছু নয়।

শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে। নিউমোনিয়া। কাজ থামাচ্ছেন না। মৃত্যু নিয়ে দুটি অংশ শ্রুতিলিখন দিলেন মৃত্যুর আগের দিন। ১৮ নভেম্বর বেলা সাড়ে চারটেয় একান্ন বছর বয়সে নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের ঘায়ে মার্সেল প্রুস্তের মৃত্যু।

মৃত্যুর পর 'হারিয়ে যাওয়ার সময়ের সন্ধানে'-র তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়।

যে-ধূসর প্রান্তরে আমি দাঁড়িয়ে সেখানে ঝড় উঠেছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ক্রমশ শীর্ণকায় প্রুস্ত। তাঁর মুখে কী অপরিসীম ক্লান্তি! হাতে একরাশ কাগজের স্তূপ। তাতে ঝরনা-কলমে অসংখ্য কাটাকুটি। সেগুলো নদী, শাখানদীর মতো আমাদের শিরা-উপশিরা বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

১৯ এপ্রিল ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৯

তার গলায় নেমে আসছে কে দানবীয় গিলোটিনের ব্লেড। তার ভয়ার্ত মুখ বেঁকে গিয়েছে। সে প্রাণপণে গলাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে, পারছে না। একরাশ রক্ত।

আমি ধড়মড় করে উঠি। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' না? বাইরে কোথাও বেড়াল ডাকে। আমি জল খাই। জানলা থেকে বেড়ালদের তাড়াতে চেষ্টা করি।

একটু পরে আবার একঝাঁক পায়রা ওড়ার শব্দে ঘুম ভাঙে। অনন্ত আকাশ জুড়ে তারা চক্রাকারে উড়ছে। তার সঙ্গে এক বুক-ছেড়া আর্তনাদ: কী হল! কী হল!

এ তো 'অপরাজিত' ছবিতে হরিহরের মৃত্যুদৃশ্য। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যে-দৃশ্যের তুলনা পাওয়া যাবে না!

ভোর। মৃত্যুপথযাত্রী হরিহর জল চায়। অপুকে গঙ্গার ঘাটে জল আনতে পাঠানো হয়। শুনশান ঘাট। ভোরের কুয়াশার মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্যাখে একজন পালোয়ান মুগুর ভাঁজছে! কাট্। হরিহরের মৃত্যুগোঙানি। তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মুখে জল দেওয়ামাত্রই মাথাটি পড়ে যায়। পায়রারা সশব্দে উড়ে যায়। ভোরের আলোয় নদীর ধারে পালোয়ানটির ব্যায়াম করার দৃশ্য... এক প্রবল শক্তির অনুভূতি, পাখি ওড়ার উজ্জ্বল গরিমা, আমাদের ভয়, বেদনা, অনিশ্চয়তা। চিত্রকরের কয়েকটি ফ্রেমে জীবন-মৃত্যুর অপরিলিখিত রূপালি বিস্ময়।

আমি চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখি সেই চলচ্চিত্রের মহামানবের ভাস্কর্য-মুখ। একহাতে তুলি, আরেক হাতে ক্যামেরার ম্যাজিক-লণ্ঠন। কী তীব্র তাঁর দৃষ্টি, কী কঠিন তাঁর মুখরেখা। পাশে তাঁর দু'বছর চার মাস বয়সে মৃত পিতার শব!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি পিছন দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বলে চলেছি: 'দিনরাত্রি পার হয়ে, জন্ম-মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়... তোমাদের মর্ম্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না... চলে... চলে... চলে... এগিয়েই চলে...

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ...

('পথের পাঁচালী')

সেই রাত।

দুর্গার অবস্থা ভয়ংকর খারাপ। বাইরে প্রকৃতির প্রলয়নাচ। দুর্গার কপালে জলপটি দেয় সর্বজয়া। চলচ্চিত্রের সেই মহামানব এখন ঝড়ের তাণ্ডবের সামনে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে। হাওয়ার ধাক্কায় ছেঁড়া পর্দা ফুলে ফুলে উঠছে। প্রদীপশিখা কাঁপছে, নড়ে উঠছে গণেশের দীপ্ত মূর্তি, দরজার হুড়কো ভেঙে যেতে চায়, কোনওভাবে তাকে রোখা যায় না, দরজা খুলে যায়। আ—

একটি কড়া। সেখানে ধাক্কা দেয় ছোট একটি হাত। অপু। 'দিদি কেমন করছে।' তিনটি শব্দ। আমি দেখছি মহাপৃথিবী ও আমাদের মতো ছোট ছোট মানুষ, তার যন্ত্রণাক্ত ছিন্ন হাত, স্নায়ু, রক্তনালিকা।

ঝড়ের তাণ্ডবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া উঠোন, ভাঙা উপুড় করা মালসা, চিৎ হয়ে থাকা মরা ব্যাঙ, একা একটি বাছুর চালহীন, জলমগ্ন, দাঁড়িয়ে। একটি রান্নার কড়া ঝুলছে।

পুকুরের ধারে দাঁত মাজতে গিয়ে অপুর আঙুল থেমে আছে। জলের বালতি নিয়ে কুয়োর ভিতর একটি দড়ি উঠে আসে, উঠে আসে।

হরিহর ফিরেছে।

চুরমার উঠোন, নিরাশ্রয় গোরু ও বাছুর। কীসের ইঙ্গিত? হরিহর ডাকে, 'দুগ্গা—।' সর্বজয়া বেরিয়ে আসে, অসাড়, নিরুত্তর। হরিহর গর্ব-ভরে তার কিনে আনা জিনিসপত্র দ্যাখায়। একটি নতুন শাড়ি দেখিয়ে বলে, 'আর এই দ্যাখো—দুগ্গার জন্য— একখান—দ্যাখো, দ্যাখো না।'

ক্যামেরা উঠে আসে সর্বজয়ার মুখে। তারসানাই ছিঁড়ে ফেলে সর্বজয়ার কান্নার শব্দ। ক্যামেরা উঠে সরে আসে হরিহরের মুখের ওপর। কী হয়েছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে বোঝে। সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। তার মাথা ফ্রেমের বাইরে, শুধু তার ভাঁজ-করা হাঁটু ও অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে থাকা হাত যন্ত্রণার স্থাপত্যকে ধরে রাখে।

রাতের জলকল্লোলে কয়েকটা নীল তারা। বেলাভূমি দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দেখি জলের ধারে একটি নৌকো। জীবনের? তার পাশে ঘোড়া থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বিশ্বম্ভর রায়। দূরে পড়ে আছে উষ্ণীষ। বিশ্বচরাচর, নৌকো ও একটি উষ্ণীষ।

...মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।

ও-সব শূন্যতা ছাড়া কোনও দিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ-পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

("পৃথিবীলোক", 'মহাপৃথিবী', জীবনানন্দ দাশ)

নেগেটিভে দেখা যায় একটি মৃতদেহকে ঘর থেকে বের করে আনা হচ্ছে। আমার পাঁজর হিম হয়ে যায়। আমার বাবা? না, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র সিদ্ধার্থর। সাতটি নেগেটিভ শট দিয়ে মৃত্যুর ধ্বংস-রেখা আঁকছেন চলচ্চিত্রের পর্দায় মৃত্যুর শ্রেষ্ঠ রূপকার।

পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই কি একমাত্র ছবি, যা একটি মৃতদেহ দিয়ে শুরু, মৃতদেহ দিয়ে শেষ?

কষ্ট হচ্ছে, 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির করিডোরে কঙ্কালের রাশি সরিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এত কঙ্কাল তো মেডিকেল কলেজে ছিল না। নিচু হয়ে প্লাস্টার অফ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্যারিস দিয়ে অশোক বসুর সঙ্গে কঙ্কাল তৈরি করছেন সত্যজিৎ। চিন্তার ভাস্কর।

ছবির সেই অভ্রময় স্বপ্নদৃশ্য। সমুদ্রের পাশে বালুকাবেলায় খবরের কাগজ পাতা। একটি কাচের জারে মানুষের বিবর্তনের রূপ। কারা ইন্টারভিউয়ের টেবিলে বসে। একটি দুর্ঘটনা-ঘটানো গাড়ি, বোনের অর্ধনগ্ন বিজ্ঞাপন-দৃশ্য। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে— যা নেগেটিভ হয়ে যায়— একটি বিদ্রোহী ছেলের মৃত্যু। সিদ্ধার্থর ভাই। মুখে কী আশ্চর্য দীপ্তি! একজন নার্স ছুটে আসে। সিদ্ধার্থর বোন, যার মুখটা পালটে গিয়ে মোমের আলোর মতো প্রেমিকার মুখ হয়ে যায়। সিদ্ধার্থ বলে, 'ওহ্, তুমি!'

তারপর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির সেই বিস্ফোরণ।

আপনারা কী ভেবেছেন কী?

আমরা কি চাকরবাকর? আমরা কি জানোয়ার?

সত্যজিতের সেই গায়ে-কাঁটা-দেওয়া দীর্ঘ ট্র্যাক-শট। 'মাও-সে-তুং লাল সেলাম'-এর দেওয়াল-লিখন, নানা ধরনের প্রতিবাদ-কথা পেরিয়ে... শহর ছাড়িয়ে ঘাস ছুঁয়ে অস্তিত্বমূলে।

নাভিমূলে?

সেই পাখির শিস, যা হারিয়ে গিয়েছিল।

দূর থেকে একটি মৃতদেহ আসছে। যা এখন নেগেটিভ নয় আর। কোন মৃত্যু-অতিক্রমী সত্যের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে? যেখানে সিদ্ধার্থ একটি বিন্দু শুধু। শুধুই একটি বিন্দু।

দ্যাখো, ওইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে। 'অশনি-সংকেত'-এর মতি! অস্পৃশ্য মতি। যার স্থির হয়ে খুলে থাকা মৃত চোখের সামনে ঘাস এখন বৃক্ষরাজির মতো বিশাল।

মৃত্যুকে কত গভীর করে চিনলে তাকে ছবির অস্থিপঞ্জরের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া যায়?

ভোররাতে বাইরে এসে দেখি, 'অপরাজিত'-তে হরিহরের মৃত্যুর পর সচকিতে উড়ে যাওয়া পায়রারা এখনও চক্রাকারে উড়ছে। বারাণসীর আকাশ ছাড়িয়ে এখন সারা পৃথিবীর আকাশে।

১৭ মে ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫০

মধ্য-সুইজারল্যান্ডের ভ্যভে-তে সমুদ্রের মতো বিশাল লেমাঁ হ্রদের নীল জলের পাশে, চ্যাপলিনের মূর্তির সামনে সন্ধে নামছে। দূরে আল্পস পর্বতের দিকে তাকিয়ে রাজহংসীরা বলছে, চলো, ওই তো শিয়ঁ-র দুর্গ, le château de chillon, যেটিকে নিয়ে বায়রন লিখেছিলেন এক আশ্চর্য কবিতা। 'The eternal spirit of the chainless mind...'

বায়রনের আগুন-পঙ্‌ক্তিটি অনসূয়া আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি সামনের দোকানের সুইস মেয়েটিকে বলছি, রম্যাঁ রলাঁ-র গাঁ ভিলন্যভ এর পাশেই না? বারো বছর আগে জেনিভা থেকে এসেছিলাম, এখন ভাল করে মনে পড়ছে না। মেয়েটি মাথা নাড়ছে, না, জানি না রলাঁ কে! তবে ভিলন্যভ পাশেই। ওই যে ওখানে। পাঁচ মিনিটের রাস্তা। কাঠের পুল পেরলেই ডানদিকে।

ঘাসপথ পেরিয়ে রলাঁ-র ভিলা। জানলার কাচ বেয়ে বৃষ্টিধারা নামছে। দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, গেট খোলো, কেউ আছে? হে ইতিহাস-পুরুষ, জানো, ওখানে দোতলার ঘরে কে বসে?

আমি ঘুমের বারান্দা পেরিয়ে সেখানে দাঁড়াই। বর্ষণস্নাত মৃদু আলোয় তাঁকে চিনতে অসুবিধে হয় না। এক বরফে-ঢাকা আগ্নেয়গিরি, un volcan sous la glace...। দীর্ঘকায়, রোগা, কালো পোশাক-পরা মানুষটি চেয়ারে বসে, পা-দু'টি ভাঁজ করা, অস্থিসার একটি হাত চিবুকের নীচে রাখা, যেন রদ্যাঁ-র ভাস্কর্য। কী বিষণ্ণ তাঁর মুখ!

একশো বছর আগে আপনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তলস্তয় একমাত্র আপনাকে চিঠি লেখার যোগ্য মনে করেছেন, গোর্কি-রবীন্দ্রনাথ-হেরমান হেস্‌সে-রাসেল-ফ্রয়েড আপনার বন্ধু। লেনিন আপনার ভক্ত, স্টেফান ৎসোয়াইগ ও আরাগঁ আপনাকে পথদ্রষ্টা মনে করেছেন...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মৃত্যুর সাত দশক পরে ২০১৫ সালের মে মাসে আপনার জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছি দু'টি শীর্ণ হাত! ভাইবোনে নীচু হয়ে একমনে কী বই ধরে আছেন হাতে?

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'।

বোন মাদলেনের সঙ্গে বসে বাংলা থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করছেন রলাঁ। আমি দেখতে পাচ্ছি, গুহার ভিতর শচীশের সঙ্গে রুদ্ধশ্বাস দাঁড়িয়ে আছেন 'জাঁ-ক্রিস্তফ' আর 'বিমুগ্ধ আত্মা'-র স্রষ্টা আর তাঁর ছোট বোন মাদলেন। আমি কাচের ওপর থেকে জল মুছে দেখি সেই ফরাসি অনুবাদের নাম 'আ কাতর্ পার্তি।' ভূমিকা লিখছেন রলাঁ নিজে।

সারা পৃথিবী জ্বলছে দাউদাউ করে। সারা পৃথিবী তাঁর দিকে অসহায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সুবিচারের প্রশ্ন রলাঁ-র কাছে হয়ে উঠেছে বাঁচার বীজমন্ত্র। সেই সঙ্গে চলছে ফরাসি বিপ্লব— নাট্যমালার কাজ, তাঁর দ্বিতীয় মহা-উপন্যাস 'লাম আঁশাঁতে' ('বিমুগ্ধ আত্মা')-র সৃষ্টি।

তারই মধ্যে এই ভারত-আবিষ্কার, যার সোপান রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। কালিদাস নাগ আর মাদলেন ছাড়া লেখা কঠিন হত গান্ধীকে নিয়ে লেখা রলাঁ-র জীবনী, অথবা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী দু'টি। তৈরি হত না ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষার সঙ্গে সংলাপের অজস্র সেতু।

রলাঁ মাতৃভাষা ফরাসি ছাড়াও জার্মান, ইতালীয়, লাতিন ও গ্রিক জানতেন, কিন্তু ইংরেজি জানতেন না, মাদলেন ছাড়া তাই তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই যে বৃথা হয়ে যেত! মাদলেন ১৯০১ সালে ইংরেজিতে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পরীক্ষা 'আগ্রেগাসিয়ঁ' পাশ করেন। আমি রলাঁ-র লাইব্রেরিতে ঘুরতে-ঘুরতে ভাবছি এই শত-শত ভারতগ্রন্থ দুই ভাইবোন কখন পড়লেন? এই আশ্চর্য অরণ্যের খোঁজ আমি কি একাই পেলাম? রলাঁ-র ভারতগ্রন্থের তালিকা তো আমাদেরও ইতিহাসের অঙ্গ। আমি বইগুলোর নাম টুকে নিতে যাব, হঠাৎ দেখি রলাঁ ও মাদলেন উঠে এসেছেন আমার সামনে, তাঁদের নীল চোখে অপরিমেয় মমতা ও বিস্ময়! আমি বিব্রত হয়ে বলছি, এই জুন মাসে আপনার নোবেল পুরস্কারের শতবর্ষে প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম আপনার সঙ্গে ভারতবর্ষের সংলাপ নিয়ে বক্তৃতামালা হতে চলেছে, সূচক-বক্তৃতা আমিই দেব। রবীন্দ্রনাথ ও আপনার বন্ধুর বন্ধুত্ব নিয়েও আমার বলার কথা। রলাঁ-র নীল চোখ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
স্থিরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে। মাদলেন ফিরে যাচ্ছেন সেই অলীক গ্রন্থাগারে।

না, মাদলেন। কেউ তোমার কথা ভাবেনি তোমার দাদা ছাড়া। ভারতবর্ষের সঙ্গে ওই বরফে-ঢাকা আগ্নেয়গিরির সাক্ষাৎ তুমি ছাড়া হত না। তুমি দোভাষীর ভূমিকা না-পালন করলে ভারতের আকাশে রলাঁ-র অনুসন্ধান থমকে যেত!

ছোট বোন মাদলেন পাঁচ বছর বয়সে গলাব্যথার অসুখে ভুল চিকিৎসায় মারা গেলে পরের মেয়েটির নামও 'মাদলেন' রেখেছিলেন রলাঁ-র মা।

১৯০১ সালে ক্লোতিল্‌দ ব্রেয়ালের সঙ্গে রলাঁ-র বিবাহ-বিচ্ছেদের পর জুন-জুলাই মাসে যখন চূড়ান্ত অবসাদে তিনি আত্মহননের পথে চলেছিলেন, পাশে ছিলেন মাদলেন। এরপর দশ বছর ধরে 'জাঁ-ক্রিস্তফ' রচনা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের বিপর্যয়ের পর তাঁর ভারত-পর্যায়ে তুমি ছিলে তাঁর সহযোদ্ধা। যখন রলাঁ-র টানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষা এসে উপস্থিত হল প্রথমে প্যারিসে, তারপর সুইজারল্যান্ডের এই গাঁয়ে, রবীন্দ্রনাথ থেকে গান্ধী, নেহরু থেকে সুভাষচন্দ্র, দিলীপকুমার রায় থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও কালিদাস নাগ, তুমি ধরেছিলে হাল।

যেদিন তিরিশের দশকের মাঝামাঝি শেষ হল রলাঁ-র ভারত-আবিষ্কার, তিনি ঘুরে দাঁড়াতে চাইলেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভুবনের দিকে, কেউ কেউ বলেন, মেলাতে চাইলেন গান্ধী ও লেনিনের সমাজভাবনাকে, যা হতে পারত মানুষকে নিয়ে শতাব্দীর মহত্তম পরীক্ষা, তিনি বিয়ে করলেন এক রুশ নারীকে, যার নাম মারিয়া কুদাশেভা, তুমি হঠাৎ সরে গেলে দাদার পাশ থেকে। সেই নারী কি সত্যিই সোভিয়েত গুপ্তচর ছিলেন?

মাদলেন, তোমার মনে আছে তুমি দাদার দোভাষী ছিলে, ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথকে 'মুক্তমনের স্বাক্ষরপত্র' সই করতে আহ্বান জানান যখন রলাঁ, রবীন্দ্রনাথের ২৪ জুনের উত্তর তুমিই অনুবাদ করে দিয়েছিলে দাদাকে? যখন মুস্‌সোলিনি-র সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ১৯২৬ সালের জুন মাসে তোমাদের এই একরত্তি শহরের এই বাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ একটু শান্তির সন্ধানে? বলেছিলেন, এইখানেই থেকে যাবেন সারা জীবনের মতো। কিন্তু হঠাৎ চলে যেতে হল যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠল আবহাওয়া মুস্‌সোলিনি'কে নিয়ে? অথবা ১৯৩০ সালে জেনিভায় তৃতীয় ও শেষবার যখন রবীন্দ্রনাথ রলাঁ-র দেখা হল, যেখানে একবারও গান্ধীর নাম করলেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
না রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম না-করে কালীর নাম করে বললেন, 'ওই জঘন্য দেবীকে আমি ধ্বংস করতে চাই!'

আমি দেখতে পাচ্ছি কাচের পিছনে ছবিগুলো ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে।

রলাঁ ও মাদলেন।

রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ ও মাদলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও মাদলেন। মাদলেন-কে পরম স্নেহে বাংলা শেখাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, লেমাঁ হ্রদের পাশে বায়রন হোটেলে ১৯২৬ সালের জুন মাসের শেষে, জুলাই মাসের গোড়ায়।

রলাঁ, গান্ধী ও মাদলেন, ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে, এই ঘরে। সঙ্গে গান্ধীর সঙ্গে আসা অসংখ্য বিচিত্র মানুষ।

রলাঁ, জগদীশচন্দ্র বসু ও মাদলেন।

রলাঁকে তানসেনের ভজন শোনাচ্ছেন দিলীপকুমার রায়, যা গ্রেগোরিয়ান চান্টের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে রলাঁকে। তাঁর রাগরাগিণীর ব্যাখ্যা ফরাসি ভাষায় দাদাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন মাদলেন।

রলাঁর 'ইন্টেলেকচুয়াল লেফটেন্যান্ট' তরুণ ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ ও মাদলেন। যেন তাঁরাও ভাইবোন।

যুদ্ধসঙ্গী।

চারপাশে নরকনৃত্য। শিল্পী কেনাবেচা। তুমি আর রম্যাঁ রলাঁ পৃথিবীতে আলাদা এক স্থান খুঁজছ ভারতবর্ষের জন্য! দুটি মহাদেশকে এক সুরের বাঁধনে মেলানোর কী অসম্ভব কঠিন এক প্রকল্প। যা কেউ পারেনি, না উইলিয়াম জোন্‌স, না ম্যাক্সমুলার।

'জাঁ-ক্রিস্তফ'-এর স্রষ্টার সঙ্গে তুমি এক নতুন-পৃথিবী তৈরি করতে চেয়েছিলে এই হতচ্ছাড়া গ্রহে, যেখানে শুধু অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধা, চাতুরি আর দ্বিচারিতা। তোমার দাদা প্রত্যাখ্যান করার পর দাদার বন্ধু সিগমুন্ড ফ্রয়েড যখন হিটলারের কাছ থেকে 'গ্যোয়েটে পদক' গ্রহণ করলেন, তুমি আর তোমার দাদা এই বাড়ি থেকে চুপ করে সব দেখেছ। তারপর প্রকাশ্য রাজপথে নাৎসি-রা শুরু করল বই পোড়াতে। তাতে রলাঁর বইও ছিল। শুধু বই নয়, প্রকাশকের মেটাল প্লেট।

এক বিরাট বিশ্বরঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে আগুনে-না-গলা ধাতু তোমার দাদা, তুমি জানতে। তাই তাঁর চোখ শেষ দিন পর্যন্ত রয়ে গেল সমুদ্রের মতো নিষ্পাপ নীল!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৩৪ সালে রলাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ের তিন বছর পর ১৯৩৭ সালে রলাঁ সুইজারল্যান্ডের বাড়ি ছেড়ে ফিরে গেলেন ফ্রান্সের ভেজলে'তে, কারণ সুইস কর্তৃপক্ষ তাঁর চিঠিপত্র খুলে দেখছিল। তুমি তোমার পরিত্যক্ত, অবিবাহিত জীবনকে নিয়ে কী করবে ভেবেছিলে? কে জানে কেন, ভারতীয় বন্ধুরাও তখন আস্তে-আস্তে দূরে সরে গিয়েছেন। এই বাড়িতে শেষ এসেছেন সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৬ সালে, ভিয়েনার হাসপাতালে অপারেশনের পর।

মৃত্যুর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার দামামার ভিতর রলাঁর কি খুব শীত করত? 'মস্কো বিচার'-এর প্রহসনের পর তিনি তখন রবেস্‌পিয়ের-কে নিয়ে নাটক লেখা শেষ করতে চলেছেন, যা ফরাসি বিপ্লবের এক নায়কের হাত ধরে তুলে ধরবে সমকালের পচন! তারই ফাঁকে বেঠোফেনের নতুন জীবনী লিখতে-লিখতে পিয়ানোতে বসে কি আরেকবার গাণ্ডীব তোলার স্বপ্ন দেখছেন প্রবীণ রম্যাঁ রলাঁ? দক্ষিণ ও বাম সবাইকে পরিত্যাগ করে ওই মহাশিল্পী সম্পূর্ণ একা তুলে নেবেন কলম-কুঠার? তাঁর জীবনীকারের ভাষায়, 'Romain Rolland: One against All.'

আজ রাতে ভিলা অলগা-র জানলার কাচের ভিতর দিয়ে রলাঁ আর মাদলেনের ছবি ধীরে-ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে।

শুধু শোনা যাচ্ছে পিয়ানোতে রলাঁ-র বাজানো বেঠোফেনের ষষ্ঠ সিম্ফনি! যার আরেক নাম 'প্যাস্টোরাল সিম্ফনি'। ওই নামে আঁদ্রে জিদ-এর উপন্যাসটির কথা মনে পড়ছে।

মাদলেন, শুনতে পাচ্ছ, লেমাঁ হ্রদে জলের শিহরন? দূরে আল্পস পর্বতে তিনদিন আগে ঝরে পড়া বরফ এখনও সাদা শিরস্ত্রাণের মতো হয়ে আছে।

রলাঁ চলে গিয়েছেন ১৯৪৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। আর তুমি? আঁকাবাঁকা দুষ্পাঠ্য হস্তাক্ষরে লেখা তোমার চিঠি আমি দেখেছি কালিদাস নাগের কোনও হারিয়ে যাওয়া ফাইলে। তোমার মৃত্যু হবে রলাঁ-র ষোলো বছর পরে ফ্রান্সের ক্রেতেই শহরে।

হে নর, হে নারী, কোন অতীন্দ্রিয় অতীত-পৃথিবী থেকে ফিরে এসে তোমরা আমাদের এই গহন মৃত্যুকুয়াশাকে মন্দ্রিত করে দিচ্ছ?

৭ জুন ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫১

ঘুমের চৌকাঠ পার হয়ে, নক্ষত্রের কিংখাব-পরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে, আমি দেখতে পাচ্ছি প্যারিসের বুলভার দ্যু মঁপারনাসে হেঁটে যাচ্ছেন 'সোনালি সূর্য যে ত্বক উপহার দেয় তেমন উষ্ণ ত্বক,' 'অপরূপ ভুরুর ছায়ায় ঘেরা উজ্জ্বল বাদামি চোখ', দীর্ঘ পোশাক পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত এক দেবকান্তি পুরুষ। তিনি ও তাঁর ছেলে এক ফরাসি সাহিত্যিককে খুঁজছেন, যাঁর নাম রম্যাঁ রলাঁ। যাঁর সঙ্গে তাঁর অন্তরের মিল। পথচারীরা কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে, কিন্তু তিনি যে রলাঁ-র সঙ্গে দেখা না-করে ফিরবেন না!

তাঁর সম্পর্কে ডব্লিউ বি ইয়েট্স বলেছেন, তিনি 'আমাদের সকলের চেয়ে বড়'; ইংরেজি কবিতায় আধুনিকতার পুরোধা এজ্‌রা পাউন্ড মনে করেছেন 'বোদল্যের বা রেমি দ গুরমঁ-র শেষতম আঙ্গিককে তিনি অতিক্রম করে যান'। স্যাঁ-জন পের্স, আঁদ্রে জিদ, হিমেনেস তাঁর কবিতার ভক্ত। জাঁ কক্‌তো একদিন বলবেন, 'মহান ও সূক্ষ্ম, তিনি তুলনাহীন। তাঁর মৃত্যুহীন সমাধিতে আমি একটি অদৃশ্য ফুল রাখলাম।' স্যুররেয়ালিস্ত্ ফিলিপ সুপো লিখবেন একদিন, 'পাশ্চাত্যের কোনও কবি যদি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করেন, ধরে নিতে হবে তিনি মিথ্যে বলছেন।' কিন্তু না, এঁরা নন, রবীন্দ্রনাথ দেখা করতে চান শুধু একজনের সঙ্গে, যাঁকে তিনি বলেছেন পাশ্চাত্যে তাঁর সবচেয়ে বড় আপনজন, রম্যাঁ রলাঁ।

তাঁদের দেখা হল, দুই গোলার্ধের দুই মহাশিল্পীর, কী জানি কী মহালগনে। 'দেখা হল, যেন জলের ভিতরে দেখা হল!' দেখা হল ১৯২১ সালের ১৯ আর ২১ এপ্রিল প্যারিসের মঁপারনাসে আর প্যারিসের পশ্চিম উপকণ্ঠে বুলন-স্যুর-সেন-এ। চারদিনে তিনবার রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমনটা আর কখনও হয়নি। ওঁরা বিশেষ করে বললেন সংগীতের কথা। পাশ্চাত্যের এক শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ কথা বলছেন প্রাচ্যের এক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মহত্তম সংগীতকারের সঙ্গে! সাংগীতিক সুরসমন্বয়ই কি তবে তাঁদের প্রসারিত করে দিয়েছিল বিশ্বজনীনতার দিকে?

ঘুমের পৃথিবীর আকাশ নৌকার মতো দোলে। সেই নৌকার গলুই ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ়'-এ প্রকাশিত হওয়ার ন'দিন পর রম্যাঁ রলাঁ ১৯১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর সোফিয়া বের্তোলিনি-কে লিখেছেন, 'তুমি জানতে চেয়েছ কী-কী ভাল বই পড়া যায়। সমকালীনদের মধ্যে বিশেষ কিছু পাবে না। তবে আমার বিশ্বাস, যে-ভারতীয় এবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়ে তুমি আনন্দিত ও সমৃদ্ধ হবে...এগুলো যেন জীবন-মৃত্যুর মহাসংগীত! প্রাচ্যের এই কবি এক আনন্দের প্রজ্বলিত শিখা বাঁচিয়ে রেখেছেন নিজের মধ্যে, যা আমাদের প্রতীচ্যে প্রায়ই বিষাদের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে থাকে।'

তারপর ১৯১৬ সালের জুন মাসে জাপানের ইম্‌পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সাংঘাতিক বক্তৃতা' (terrible discours)-র কথা লিখছেন তিনি সোফিয়াকে। সেই বক্তৃতার অংশ বোন মাদলেনের সাহায্যে ফরাসিতে অনুবাদ করে ডায়েরিতে টুকে রাখছেন তিনি। এ কী! এ তো তাঁর নিজের কথা। যা বলার জন্য তিনি নিজের দেশে নিন্দিত, কলঙ্কিত হয়েছেন! পশ্চিমি সভ্যতাকে এক দৈত্যাকার জিরাফের সঙ্গে তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যে-সভ্যতা কর্তৃত্ব করতে চায়, নরখাদকের মতো গিলে খেতে চায়। কালপুরুষের সুতোর টানে একসুরে মিশে যাচ্ছেন দুই জীবনশিল্পী।

এরপর বৃহস্পতিবার ১০ এপ্রিল ১৯১৯ রলাঁ-র লেখা একটি চিঠি এল সুদূর ভারতবর্ষে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। সঙ্গে 'মুক্তমনের স্বাক্ষরপত্র'। যা জাহাজ-ডাকে পৌঁছল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল) পর 'নাইটহুড' প্রত্যাখ্যানের (২৯ মে) কয়েক দিন বাদে। 'মনে হয় আমাদের চিন্তাভাবনা আলাদা নয়। একদিন পূর্ব-পশ্চিমের মিলন হবে, এমনটাই আমার স্বপ্ন। আমি আপনার গুণগ্রাহী, কারণ এ-বিষয়ে আপনার অবদান সবচেয়ে বেশি। আমি আপনাকে জানাতে চাই আপনার প্রজ্ঞা, আপনার শিল্প আমার কতটা প্রিয়।' ২৪ জুন শান্তিনিকেতনে 'মুক্তমনের স্বাক্ষরপত্রে' সই করলেন কবি। বেজে উঠল বীণা, অন্দরে বাহিরে। এ-বীণার সুরবিহার সকলে জানল না, তাতে কী?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছবি মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে আকাশের ফেনায়। ১৯২৬ সালের জুনের শেষ। সমুদ্রপ্রতিম লেমাঁ হ্রদে একটি নৌকায় ভাসছেন রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁ, সাভোয়া-র উপকূল পর্যন্ত। তেরিতে, মতঁরো, ভ্যভে পর্যন্ত মোটরে চেপে ঘুরছেন তাঁরা। মুস্‌সোলিনি-র সঙ্গে সাক্ষাতের বিপর্যয়ের পর সোজা সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে এসে উঠেছেন কবি। ১৯২১ সালে প্যারিসে দেখা হওয়ার পাঁচ বছর পর। এক ফ্যাসিবাদীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের করমর্দনের গ্লানি ভুলতে রলাঁ নিজে পিয়ানোতে বেঠোফেন আর গ্লুক বাজিয়ে শোনাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথকে।

রলাঁ আর রবীন্দ্রনাথ মধ্যাহ্নভোজন করছেন। বাগানে সকলে মিলে— রলাঁ-র প্রবীণ পিতা, বোন মাদলেন, প্রতিমা ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, প্রশান্ত আর রানী মহলানবিশ— ছবি তুলছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের দিকে, বিশ্রামের দিকে নজর রাখছেন রলাঁ আর মাদলেন।

সুদূর সুইজারল্যান্ডে লেমাঁ হ্রদের ওপর অন্ধকার নীলাভ হয়েছে। দুধসাদা এক স্বর্গীয় রাজহংসী ঠোঁটে করে এনেছে আশ্চর্য কয়েকটি চিঠি। সারা গায়ে রক্তস্ফটিকের রং।

১৯২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে রম্যাঁ রলাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি:

আমার অতি প্রিয় বন্ধু,

আমি ভগ্ন ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছি। আমি ফিরে আসছি সেই দেশে, যা অতিমাত্রায় ব্যস্ত, যার আমায় বা আমার আদর্শ নিয়ে ভাবার এতটুকু সময় নেই। আমি বুঝতে পারছি, এখানে আমার কোনও প্রয়োজন নেই, অন্তত এই মুহূর্তে নয়। আমার ভয় হয়, আমাদের দেশের মানুষ আমার আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ভাবনাকে অপরিণত ভাবতে চায়, ভাবতে চায় একটি কাব্যিক বিলাস হিসেবে যা এ-যুগে অচল।

তবু আমি জানি আমার নিজের একটা দেশ আছে, আছে আমার এক বন্ধু, আমার স্বপ্নপূরণের সহযোগীরা আর তাদের সমর্থন। এই সবই আমি পাই একজনের মধ্যে, আপনার ভেতর, আপনার গভীর বন্ধুত্বের ভেতর। এই আবিষ্কার আমায় শক্তি দেয়, বিশ্বাস জোগায়, আর দেয় অপর্যাপ্ত আনন্দ, আমার জীবনের এই সন্ধেবেলায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যদি আরও কিছু দিন বাঁচি, যদি চিকিৎসকেরা অনুমতি দেন, আমার প্রথম কাজ হবে আপনার কাছে পৌঁছনো, যাতে আপনাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা যায়, যেখানে আপনার আসন পাতা। ডাক্তাররা বলছেন এবার থেকে অসহ্য গ্রীষ্মে আমি যেন ইউরোপে কাটাই। সেক্ষেত্রে আমি একটি বাসা বানাব সুইজারল্যান্ডে আপনার বাড়ির পাশে, যাতে জীবনের এই শেষ কয়েকটা বছর আমি কাটিয়ে দিতে পারি আপনার কাছে, শুধু আপনার বন্ধু হিসেবে নয়, আপনার কর্মযজ্ঞে আপনার সঙ্গী হিসেবে।

আপনার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ই জুলাই ১৯২৬:

'আমার অতি প্রিয় বন্ধু,

আপনার সান্নিধ্য ত্যাগ করামাত্রই আমার মনে হচ্ছে বুঝি আমি আশ্রয়হীন, কিছুই আমার আপনার নয়। সেই মুখগুলিকে দেখা যারা শুধু সরে সরে যায়, যাদের চেনা যায় না, মনের পক্ষে বড় ক্লান্তিকর। পাখির মতো শুধু ডাল থেকে ডালে উড়ে বেড়ানো, একটিকেও না আবিষ্কার করে, যা শরীরের ওপর ওজনের মতো চেপে বসে।... ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে মনের মধ্যে একটি লক্ষ্য স্থির করে বেরিয়েছিলুম যে আপনার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের দেখা হল, যদিও তা বেশি দিনের জন্য নয়, সেই দিনগুলো ছিল উৎসবের আনন্দে পূর্ণ। উৎসব মানে নিজের ঘরে থাকার অনুভূতি, এবং আরও বেশি কিছু। যখন আবার বেরিয়ে পড়লাম আপনার ওখান থেকে, পথের সব লক্ষ্য হারিয়ে গেল আমার।...

ভালবাসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেমাঁ হ্রদের রেলিং ধরে আমি দেখছি, রাজহংসীর ঠোঁট থেকে সেই চিঠি এখন কোন উজানে ভেসে চলেছে। রাজহংসী, তুমি কি জানো রবীন্দ্রনাথের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইংরেজিতে লেখা চিঠি দু'টি এই প্রথম পড়বে বাঙালি? এই বন্ধুতার গভীরতা কোনও দিন বোঝেনি তারা! কোনও দিন জানতে চায়নি। দুধসাদা সেই জলপাখি বিষণ্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

কাছেই ভিলা অল্‌গা-য় জানলার পাশে বসে রলাঁ লিখছেন: 'আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন। যতই প্রতিটি বিদায় আপনাকে দূরে ঠেলে দেয়, আমরা মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখি আপনার সান্নিধ্যের উষ্ণতা, আপনার দৃষ্টির ভালবাসাময় আলো, আপনার প্রিয় কথাগুলো। ওই দিনগুলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে অমূল্য ঐশ্বর্য হয়ে আছে।' (৮ জুলাই ১৯২৬)

জলের শব্দে চমকে উঠে দেখি, একটি নয়, একশো রাজহংসীতে ভরে উঠেছে আল্পস্ পর্বতের পায়ের কাছে সুদূর পাশ্চাত্যের এই হ্রদ।

৫ জুলাই ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫২

কারা নিঃশব্দে চিৎকার করছে, কে কেঁদে উঠল। গভীর রাতে আমি ঘুম ভেঙে দেখছি, এক ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আছে এক ক্ষণিকের অতিথি, মাঝে-মাঝে তার টর্চের আলো জ্বলছে, নিভছে। তার সংলাপ যেন দার্শনিকের মতো শোনায়: 'The time of the prologue is eternity'। আমি ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করি: মৃণাল সেনের ছবি, 'খণ্ডহর'।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভিতর যখন দূর থেকে একটা আলোর বিন্দু ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসে পরদার সামনে, তখন বোঝা যায় যে ওটা লণ্ঠন, গোরুর গাড়ির নীচে বাঁধা। গোরুর গাড়ি চেপে সুভাষরা ধ্বংসস্তূপের দিকে আসছে। দীপু টর্চ বের করে সুভাষকে অন্ধকারের রং চেনায়। শিলাদিত্য লিখেছে, 'পাতা ফুল শাখা শিকড়ের সর্পিল বিন্যাসে যেন বনান্ধকারের অন্তস্তল পর্যন্ত পড়ে নেওয়া যায়।' গন্তব্যে পৌঁছে টর্চের আলোটা ঘুরতে-ঘুরতে একটি জানলায় যামিনীর মুখে গিয়ে পড়ে। 'অন্ধকারের আরেক নাম তো যামিনীই।' শিলাদিত্য মনে করিয়ে দিচ্ছে। সে বুঝিয়ে দেয়, আমরা যামিনীকে দেখতে পাই একটি লণ্ঠনের আলোর বিপরীতে। গভীর অন্ধকারে দেয়াল-সিঁড়ি আর দীর্ঘ বারান্দা পেরিয়ে, দরজা বন্ধ করে, দুলতে-দুলতে ফিরে যায় সেই লণ্ঠন। সেটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় এক নিশীথিনী, যাকে আধো-অন্ধকারে চিনতে পারি আমরা—যামিনী। অন্ধকার, যামিনী আর ধ্বংসস্তূপ কি মিলে গিয়েছে এক রাগিণীরেখায়, মৃণাল সেনের শ্বাস-বন্ধ করানো জীবনচিত্র 'খণ্ডহর'-এ? যেখানে 'কঙ্কালের মতো বাড়ি', বাঁকানো খিলান, আগাছা।

শিলাদিত্যর আশ্চর্য বইটি মাস্তুল-ভাঙা জাহাজের মতো দোলে। ইস্পাত রঙের এত অপরূপ একটি বই সে উৎসর্গ করেছে মৃণাল সেনকে তাঁর ৯২ বছরে? যেন এক ধূসরিমাময় উপকূল দিয়ে মৃণাল সেনের জগতে সে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে আমাদের। ছোট ছোট জীবনের ভেলা, লগি হাতে ওরা কারা, মানুষ না প্রেত, না ঈশ্বর? 'There is magic in their living... living, loving, desiring...'। মাথার ওপর আগুন জ্বলছে অন্ধকার আকাশের বনে।

একটি অধ্যায়ের নাম 'মৃত্যুদৃশ্য থেকে মৃত্যুদৃশ্য'। 'বাইশে শ্রাবণ' প্রসঙ্গে মৃণাল সেনের এক স্বগতকথন দিয়ে শুরু: 'রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছি তাঁর মৃত্যুর দিনে। আজ এখানে (নিমতলায়) অন্য কোনও মৃতদেহ আর ঢুকতে পারবে না। সবদিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেখলাম এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, তার কোলে দামি একটা সুন্দর তোয়ালে, সেই তোয়ালের মধ্যে তাঁর মৃত সন্তান। রবীন্দ্রনাথের মৃতদেহ যখন নিয়ে আসা হল, একটা প্রকাণ্ড মানবসমুদ্রের ঢেউ... ওই ভিড়ের ধাক্কায় সে ভদ্রলোকের হাত থেকে তোয়ালেটা মাটিতে পড়ে গেল, মাটিতে পড়ে গেল তাঁর মৃত সন্তান, একটা শিশুর মৃতদেহ হারিয়ে গেল জনতার পায়ের নীচে!'

'বাইশে শ্রাবণ'-এ 'ভিতরে ভিতরে মরে থাকা মানুষটার শব ফুটে উঠে প্রিয়নাথের চেহারায়-স্বভাবে, বীভৎস হয়ে ওঠে স্ত্রীর প্রতি তার ব্যবহার।' শিলাদিত্য, জানো, খুব কম বয়সে দেখা মালতীর আত্মহত্যার দৃশ্যের বিষাদ আজও ভুলতে পারিনি।

তিরিশ বছর পরে ১৯৯১-তে তৈরি 'মহাপৃথিবী'-তে মা আত্মহত্যা করেন। শিলাদিত্য লিখেছে, রাত্রির নিঃশব্দ আলো-আঁধারি ভেঙে রাস্তায়-গলিতে পুলিশের ভ্যান আর ভারী বুটের শব্দে মৃত্যু-আতঙ্কের কথা। মা'র মৃতদেহ দাহ, শুরুতে দাহের আগুনের ওপর ক্রেডিট টাইটল, শেষে মা-র ডায়েরি-দাহের সময় ছবির 'ফ্রিজ' হয়ে যাওয়া— মৃত্যুর মুখোমুখি আগুনের এইসব চিত্রমালা। 'পদাতিক'-এ যুবকটিকে তাড়া করে মৃত্যু। 'জেনেসিস'-এ সন্তানের পিতৃপরিচয় দাখিল করতে পারস্পরিক হত্যাপ্রচেষ্টায় মেতে উঠবে দুটি পুরুষ। 'নতুন জন্ম তা হলে জীবনে জীবন যোগ করে না, বীজ বোনে মৃত্যুর।' 'খণ্ডহর'-এর যামিনীও কি কোনওদিন ভাববে, 'আবার বাঁচব, নতুন করে বাঁচব?'

খণ্ড-খণ্ড এক জগতের ভয়ংকর অলিগলিতে ঢুকে পড়ে বেরোতে পারছি না আমি। সামনে হঠাৎ এক সাদা পরদায় লেখা ফুটে ওঠে: 'আমার বয়স কুড়ি/ কুড়ি বছর বয়স নিয়ে/ হেঁটে চলেছি হাজার বছর ধরে/ দারিদ্র/ মালিন্য/ আর মৃত্যুর ভিড় ঠেলে/ আমি পায়ে পায়ে চলেছি/ হাজার বছর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধরে দেখছি/ দারিদ্রের ইতিহাস/ বঞ্চনার ইতিহাস/ শোষণের ইতিহাস।' আমি এক অজানা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আমার শরীর থেকে রক্ত পড়ছে।

আমার সামনে 'আকালের সন্ধানে'-র মেয়েটি, দুর্গা যাঁর নাম। মুখে কাপড়, ভয়! শিলাদিত্য কোথাও 'লুপ্ত পথরেখা' কথাটা ব্যবহার করেছে।

মনে পড়ছে মৃণাল সেনের কথা: 'কী বলব' একটা জরুরি প্রশ্ন। কিন্তু তারই সঙ্গে কেমন করে বলব সেটাও সমান জরুরি।"

লিনিয়ার ফর্ম ভাঙবেন-ভাঙবেন 'নীল আকাশের নীচে' থেকেই মনে হয়েছিল, অবশেষে ভেঙে খান-খান করে দিলেন। 'ফিল্মের ফর্ম নিয়ে নিরীক্ষা মৃণাল সেনের হাতে কখনওই অহেতুকের খেলা হয়ে ওঠে না।' তার আড়ালে থাকে চারপাশের মতিচ্ছন্ন সময়কে কাটাছেঁড়ার তাগিদ। ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে ছবি করলেন না কি তাই? সাবেকি নিয়মগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে এই সময়ের অস্থিরতা ও আত্মিক সংকটকে মেলে ধরার জন্য? সরলরৈখিক কথনকে ভেঙে, কাহিনি থামিয়ে এই নিরন্তর পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠন? 'নিউ ওয়েভ' তাঁকে উদ্দীপ্ত করবে না তো কাকে করবে?

আমার সামনে 'ভুবন সোম'-এর সেই অপূর্ব দৃশ্য: ঝুলায় ঝুলতে গিয়ে ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে গৌরীর বেশে সুহাসিনী মূলে। কী অপরূপ লাবণ্য তার মুখে! পুরাকালের রানির মতো সে যেন শিকারের কাহিনি শুনছে। ব্রেশট, স্যুররেয়ালিজমের ফ্যান্টাসি, গাঁয়ের মেয়েটির সরলতা, মরালীদের অপার বিস্ময়, সব মিলেমিশে গিয়েছে সেখানে।

'খণ্ডহর'-এ ডার্করুমে লাল আলো, জল আর ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। এই তিন মিশে ফুটে ওঠে যামিনীর মুখের অন্তর্লীন রহস্য।

দর্শককে কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকতে দেবেন না তিনি, মৃণাল সেন। 'সর্বনাশের পরিস্থিতি'-র সামনে কোমর বেঁধে মানুষকে পুনরাবিষ্কার করতে নেমেছেন তিনি। তাঁর অসংখ্য ছবির ভগ্নস্তূপ তাই বাঙ্ময় প্রতীক হয়ে ওঠে।

নিজের ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে 'খণ্ডহর'-এর সুভাষ-বেশী নাসিরুদ্দিন শাহ্ লণ্ঠনের আলো বাড়ায়-কমায়, টর্চের আলো জ্বালায়-নেভায়।

বলা ও না-বলা কথা, রাজনীতিক পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ ও গাঢ়তম মানবভাবনা ছবির আঁশে মিশে থাকে।

শামুকের খোলা ভেঙে কখন, কোন সকালে বেরিয়েছিলেন মৃণাল সেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একই মা-র নানা চরিত্রে গীতা সেনের সামনে আমরা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমতুল্য এই আশ্চর্য অভিনেত্রীর অবদান তো কম নয়! 'একদিন প্রতিদিন'-এ পা মুড়ে বসে আছেন মা, ঘরে গিজগিজ করছে ভিড়, যেই ভিড় কমল তিনি পা-দুটি টানটান করলেন, মুখে হাঁফ ছাড়ার শব্দ। তাঁর সামনে একটা ভাঙা হাত-পাখা। যার সামনের দিকটা উনুনের আগুনে পুড়ে গিয়েছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি, এই সেদিন বালি ব্রিজের ওপর তরুণ মৃণাল গীতাকে চুম্বন করতে গিয়ে জলে ফেলে দিচ্ছেন উইলিয়াম গ্যালাচারের 'দ্য কেস ফর কমিউনিজম'! বইটি যখন ছিটকে পড়ল গঙ্গায় তখন কি শব্দ হয়েছিল অলকানন্দা-জলে? মৃদু শিহরন? 'তত্ত্ব' আর 'ভালবাসা'-র সংঘাতে ভালবাসার জয়?

চারের দশক, উত্তাল কলকাতা, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ, আকাল, দাঙ্গা, দেশভাগ। 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।' ক্যারল চ্যাপেকের 'দ্য চিট' গল্পের অনুবাদ আর চ্যাপলিনকে নিয়ে বই।

যাঁরা তাঁর 'আমার চ্যাপলিন' পড়েছেন, তাঁরা চেনেন আকবরকে। টেনিস-কোর্টে বল-কুড়োনো, ভবঘুরে আকবর মৃণাল সেনের চেতনায় চ্যাপলিনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে বিবেকের মতো, ট্রামের চাকায় পিষে যাওয়ার আগে। শিলাদিত্য সেন তাকে মৃণাল সেনের বয়ানে এ-বইতে ফিরিয়ে এনেছে।

এর মধ্যে দিয়ে উঠে আসা ক্ষুরধার অথচ মায়াময় মৃণাল সেন। কাঁটাপথ পেরিয়ে শূন্যতার বিরুদ্ধে জারি থেকেছে যাঁর লড়াই।

অব্যাহত থেকেছে ভাষার অনুসন্ধান। যেন আত্মপ্রশ্নই তাঁর বীজমন্ত্র। নইলে 'পদাতিক' তৈরি হত না। অথবা 'আকালের সন্ধানে'। অথবা 'ওকা-উরি কথা'-র ভয়ংকর সেই শেষ শটে ফিল্ম পুড়ে যাওয়া।

স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ এক জীবনদৃষ্টি। বর্শার ফলা'র মতো। যেখানে লেগেছে ভালবাসার জলছাপ।

ঋণ: 'মৃণাল সেনের ফিল্মযাত্রা'
শিলাদিত্য সেন

২ আগস্ট ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৩

রাত অপস্রিয়মাণ সরীসৃপের মতো এক কানাগলি থেকে অন্য এক কানাগলিতে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। সাপের পিঠের ওপর জলবিন্দুর মতো ঝিকমিক করছে রাস্তার আলো। ঝাপসা, সুদূর এই শহরে এক ক্লিন্নবেশ, উগ্র সুগন্ধি-মাখা নারীর সঙ্গে ও কে সেন নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে?

প্যারিসের শীতের ধোঁয়াশায় লোকটিকে স্পষ্ট দেখা যায় না। চল্লিশ বছর বয়সি, পাকা চুল, চোখ-মুখ বসে যাওয়া মানুষটি এদুয়ার মানে-র আঁকা এক বৃদ্ধ বলে মনে হয়। নদীর সবুজ কালো জলে তাঁর গলার সুর প্রতিধ্বনিত হয়: 'Je crois que ma vie a été damnée dès le commencement, et qu'elle l'est pour toujours.' 'আমার মনে হয়, আমার জীবন শুরু থেকেই অভিশপ্ত, চিরকালের মতো।' আমি চমকে উঠে ধ্রুবতারার দিকে তাকাই। মহাকাল, বলো, তবে কি ইনিই সেই পাপবিদ্ধ শার্ল বোদল্যের— র‍্যাঁবো-র ভাষায়, 'কবিদের রাজা, প্রথম দ্রষ্টা— এক সত্য দেবতা'?

তাঁর হাতের বইটি আগুনের শঙ্খচূড় সাপের মণির মতো জ্বলছে। সেই ভয়ংকর ('atroce') 'বিষণ্ণ, উন্মত্ত' বই! যা থেকে 'ফুঁপিয়ে কান্নার মতো সজোরে রক্ত ঝরছে'! 'দীর্ঘ ফিসফিসানির মতো' তিনি নিজেকে হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজছেন শরীরের ক্ষত! তাঁর ভাবনাপঞ্জি, কারও-কারও মতে তাঁর মনের শ্রেষ্ঠ মুকুর 'আমার নগ্নায়িত হৃদয়' ('Mon coeur mis à nu')-এ তিনি লিখেছেন:

> একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে ক্লোরোফর্ম দেওয়ার মতো নির্মম আর কিছু নেই। কারণ তাতে অপরাধীর মহত্ত্বের ভাবনাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তার স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে ফেলা হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'স্বর্গ'? বোদল্যের 'স্বর্গ' বললেন? আহ্! কুড়ি বছরের বেশি শয়তানের পাশাপাশি বোদল্যের-এর অবসেশন ছিল 'স্বর্গ'। অসুস্থতা, অনটন, উৎকণ্ঠা, ঘৃণা সবই তাঁর স্বর্গের প্রতি আকর্ষণকে তীব্রতর করে দিচ্ছিল? 'কাঁটার তোষকে' শুয়ে স্বর্গের জন্য অপ্রতিরোধ্য টান, সমস্ত রকম স্বর্গের জন্য, ছোটবেলার সবুজ ভালবাসার স্বর্গভূমি থেকে মদ, আফিম আর হাশিশের কৃত্রিম স্বর্গ পর্যন্ত।

লিখছেন 'আদিম পাপ' থেকে মুক্তির কথা। ধর্মের চেয়ে অপ্রতিরোধ্য নাকি আর কিছু নেই। শূন্যতার স্বাদ, যা তাঁর কবিতায়, চিঠি-র আলজিভে লেগে থাকে, তার সঙ্গে কী গভীর বিরোধ তাঁর 'অন্তরঙ্গ জার্নাল'-এ বর্ণিত সুস্থতা-তৃষ্ণার! যেখানে অন্ধকারের জরায়ু ছিঁড়ে আলোর ফুলের মতো জেগে ওঠে বাঁচার ইচ্ছে। নিজেকে অতিক্রম করে, না, নিজের থেকে পালিয়ে স্বর্গে পৌঁছনোর আকাঙ্ক্ষা!

বন্ধু নাদার-কে উৎসর্গ করা 'এক কৌতূহলীর স্বপ্ন' কবিতায় বোদল্যের লিখেছেন, মৃত্যু হল এক 'সুস্বাদু যন্ত্রণা' (la douleur savoureuse), এমন এক আকাঙ্ক্ষা, যা ভয়-ত্রাসের সঙ্গে মিশে থাকে। অপস্রিয়মাণ বালিয়াড়ির ওপর উৎকণ্ঠা আর আশা, এক নির্যাতন যা কর্কশ আর সুস্বাদু, যা চেনা-জানা পৃথিবী থেকে তাঁকে ছিন্ন করে মুক্ত করে দেবে। কী কষ্টকর আর তৃপ্তিদায়ক সেই যন্ত্রণা!

ওই দৃশ্যের সামনে বোদল্যের যেন এক লুব্ধ বালক। তিনি ঘৃণা করছেন সেই যবনিকাকে যা মৃত্যুকে ঢেকে রেখেছে। তারপর সে এল, মৃত্যু, হিমশীতল এক সত্যের মতো, যা খুব ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হল। এ যেন তাঁর বহু-প্রতীক্ষিত 'প্রাণজুড়োনো অন্ধকার' ('rafraîchissantes ténèbres')। চমকহীন এক মৃত্যু। 'এক অসহ্য উজ্জ্বল ঊষা আমায় ঘিরে ফেলেছে। আচ্ছাদন সরে গেছে, আমি অপেক্ষমাণ।'

মৃত্যু কি তবে এক অপেক্ষার নাম? মৃত্যুর নাম-না-জানা কত অজানা রূপ। কিন্তু বোদল্যের-এর কাছে তা অপেক্ষা। মৃত্যু এসেছে, দরজা খুলে দাও, ভোরের আলোর ঝরনার সামনে। এরই নাম কি 'স্বর্গ'?

ঘুমের মধ্যেই আমি বলছি, ক্লোদ পিশোয়া'কে জিগ্যেস করতে হবে, ওই কবিতাটি লিখতে গিয়ে বোদল্যের-এর কি ওগুস্ত দোজঁ-এর 'স্বপ্ন' কবিতাটির কথা মনে পড়েছিল, যা শুরু হয়েছিল 'হ্যামলেট'-এর একটি এপিগ্রাফ দিয়ে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Who would fearless bear
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death?
(Hamlet, iii, i)

কিন্তু মৃত্যু যে-'মুক্তি' দেয়, এক বৈপরীত্যক্লিন্ন জীবন থেকে ভারী আর অন্ধকার রাত সমাহিত করে দেয় উদ্ধত শরীর, চোখ বুজে দেয়। মাকড়সা জাল বোনে, সন্তান উৎপাদন করে সাপ, সারা বছর শোনা যায় নেকড়েদের হিংস্র গোঙানি। যেখানে ঘৃণায় ভরে যায় পিপে। বোদল্যের লিখেছেন, 'আমি ক্ষত এবং ছুরি/ হত ও হত্যাকারী'। 'হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আমি এক রক্তপায়ী বাদুড়'।

ভিয়ঁ ছাড়া কি আর একজন ফরাসি কবিও এভাবে মৃত্যুকে রক্তকণিকায় বহন করেছেন? 'যন্ত্রণা-কুসুম'-এর ('লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর ওই বাংলা করলাম, কিন্তু ফরাসি 'mal' শব্দের অর্থ যেমন 'যন্ত্রণা', তেমনই 'অশুভ' ও 'পাপ') একটি অংশের নামই তো 'মৃত্যু'। মৃত্যু-বিষয়ক ওই কবিতাটি ('ল্য রেভ দ্যঁ ক্যুরিয়ো') সম্পর্কে বোদল্যের পুলে-মালসি'কে লিখেছিলেন (১৩ মার্চ ১৮৬০): 'কাল নাদার-কে সনেটটি দিয়েছি। সে বলল, সে কিছুই বোঝেনি। সেটা হয়তো আমার হাতের লেখার জন্য, ছাপা হলে সব স্পষ্ট হয়ে যাবে।' ক্রমশ ভয়ংকর নিউর‍্যালজিয়ার ব্যথা, যা ভুলতে আফিম, বেলেডোনা, কুইনিন।

১৮৬৬। মাথা ঘোরে, শূলবেদনা, বমি। সমসাময়িকরা তাঁকে স্বীকৃতি না-দিলেও ব্রাসেল্‌সে খবর এল যে, তেইশ আর একুশ বছর বয়সি দুই তরুণ, মালার্মে আর ভের্লেন, যাদের তখনও একটি কবিতার বইও প্রকাশিত হয়নি, তাঁকে 'গুরু' বলে মানে। অসুস্থ ও ক্লান্ত বোদল্যের একটি চিঠিতে লিখলেন, 'এই তরুণদের কথা শুনলে আমার হাড় হিম হয়ে যায়! আমি একটু একা থাকতে চাই।'

মার্চ মাসে নাম্যুরে স্যাঁ-লু গির্জায় হঠাৎ মাথা ঘুরে পাথরের ওপর পড়ে গেলেন বোদল্যের। মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে। ডান দিক অবশ, কথা বলতে কষ্ট।

তাঁকে ব্রাসেল্‌সে আনা হল। আরও অন্ধকারে সেঁধিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ৩১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্চ 'নতুন যন্ত্রণা-কুসুম' নাম দিয়ে ষোলোটি কবিতা প্রকাশিত হয় 'ল্য পারনাস কঁতাঁপোর‍্যাঁ' পত্রিকায়। মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে, শুধু একটি শব্দ উগরে দিচ্ছেন 'Crénom!' তাঁকে যে-রাস্তার হাসপাতালে ভর্তি করা হল, সেই রাস্তার নাম 'ভস্মপথ', la rue des cendres! সেখানে তাঁর কাছে উন্মাদিনীর মতো ছুটে আসছেন তাঁর ৭২ বছর বয়সি মা, মাদাম ওপিক। যিনি কখনও বোঝেননি বোদল্যের-এর ছ'-সাত বছর বয়সে তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহের ভয়ানক অভিঘাত। ক্লোদ পিশোয়া লিখেছেন, সে-আমলে স্বামীর মৃত্যুর পর অন্তত দু'বছর অপেক্ষা করাই ছিল রীতি। মাদাম ওপিক তার আগেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলে। একমাস পর, ২ ডিসেম্বর ১৮২৮, একটি মৃত মেয়ের জন্ম হয়েছিল!

১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষ থেকে জুন অবধি অবশ শরীর নিয়ে শুয়ে আছেন বোদল্যের এক হোটেলে, যার নাম 'বিরাট আয়না' (le Grand Miroir)। কোন্ ভস্মপথ দিয়ে হেঁটে এসে এক অলৌকিক, অপার্থিব দৈত্যাকার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছেন তিনি?

বোবা, অর্ধ-শরীর নিষ্ক্রিয় বোদল্যের'কে নিয়ে গাড়ি করে ব্রাসেল্‌সের চারধারে ঘুরছেন অসহায় মা। এপ্রিল মাসে বন্ধু পুলে-মালাসি 'লে জেপাভ' ('ভগ্নদূতেরা') নামে একটি চটি বই বের করলেন তেইশটি কবিতা নিয়ে, যা বোদল্যের-এর মৃত্যুর মাত্র ন'মাস পর ধ্বংস করার নির্দেশ দেবে ফ্রান্সের বিচারালয়! সেই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ছ'টি নিষিদ্ধ কবিতা। বই দেখে মৃত্যুপথযাত্রী বোদল্যের শিশুর মতো খুশি। ২ জুলাই ব্রাসেল্‌স থেকে রওনা করানো হল তাঁকে প্যারিসের উদ্দেশে। রু্য দ্যু দোম-এর এক সেবাশ্রমে চিত্রশিল্পী মানে-র স্ত্রী এবং বন্ধু পল মরিস-এর স্ত্রী সেখানকার পিয়ানোতে ভাগ্‌নারের 'তানহাউসার' বাজিয়ে শোনালেন বোদল্যের-এর মন ভাল করার জন্য। ১৮৬৭ সালের ৩১ অগাস্ট সকাল এগারোটায় তাঁর মৃত্যু। বয়স ৪৬ বছর ৪ মাস ২২ দিন।

২ সেপ্টেম্বর মঁপারনাস সমাধিক্ষেত্রে মাটিতে শোয়ানো হল তাঁর দেহ ঘৃণিত সৎ-পিতা জেনারাল ওপিকের পাশে। বিশেষ কেউ শেষকৃত্যে আসেনি, ওই সময় ফ্রান্সে আবহাওয়া ভাল নয়। কবি তেওদোর দ্য বাঁভিল আর বন্ধু শার্ল আসলিনো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। ভস্মের মিনার থেকে বোদল্যের কি দেখেছিলেন সেই অলীক দৃশ্য? কবিরা প্রায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেউ আসেননি তাঁকে দেখতে, যাঁকে চার বছর পরে 'কবিদের রাজা, প্রথম দ্রষ্টা— এক সত্য দেবতা' বলে অভিহিত করবেন র‍্যাঁবো? যিনি হয়ে উঠবেন বিশ শতকের আধুনিকতার মূল পুরোহিত? বৃষ্টিতে ভিজে প্রায় ভিখারিনির মতো মলিনবেশ এক ছায়া-নারী জান দ্যুভাল কি সমাধিক্ষেত্রে কোথাও দাঁড়িয়েছিলেন একা? বোদল্যের সেই নিঃস্ব অর্ধ-কৃষ্ণাঙ্গিনীকে ভালবেসেছিলেন যতটা, ঘৃণা করেছেন ততটাই! যাঁর জন্য সমস্ত সম্পত্তি (!) লিখে দিয়ে যাত্রারম্ভেই ১৮৪৫ সালে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন বোদল্যের! পাঁচ শতাব্দী পেরিয়ে দান্তে আর বোদল্যের কি পাশাপাশি দাঁড়ালেন এই প্রথম নরকোত্তীর্ণ এক চোখ-ধাঁধানো আলোর প্রস্রবণের সামনে? 'দিভিনা কম্মেদিয়া' আর 'যন্ত্রণা-কুসুম'-এর মধ্যে তৈরি হল রূপকথার এক সেতু?

শয়তান আর ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে ক্ষতবিক্ষত এক কবির ভারী ডানা দুটি দান্তের স্বর্গের দিকে উত্থিত হল কোন্ তিমিরবিনাশী অমানিশায়?

২৩ আগস্ট ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৪

ঘুমের কল্লোল পার হয়ে আমি কতবার এসে দাঁড়িয়েছি মঁপারনাস সমাধিক্ষেত্রে, বোদল্যের-এর স্মৃতিসৌধের সামনে। ১৮৬৭ সালের ৩১ আগস্ট তাঁর মৃত্যুর দেড়দিন পর কেন এসেছি আবার মৃত্যুবৃষ্টি উপেক্ষা করে ভেজা পাতার ফিসফিসানির ভিতর? ২ সেপ্টেম্বর তাঁর শেষকৃত্য দেখতে? দেড়দিন না দেড় শতাব্দী মনে পড়ছে না আর।

কেউ কোথাও নেই। এত রাতে জলের শব্দ? অশ্রুর মতো নিঃশব্দ সেই শব্দ মাঝরাতে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। ছায়াবৃতা, কে তুমি বোদল্যের-এর স্মৃতিসৌধের দিকে তাকিয়ে?

মৃত্যুপাথরের ফাঁক দিয়ে সে দ্রুত চলে যায়। দু'হাতে ক্রাচ।

ক্রাচ? ওহ্! জান দ্যুভাল! বোদল্যের-এর প্রেয়সী। তাঁর 'কালো ভেনাস'! আমি পাগলের মতো ছুটি তাঁর পিছনে।

সারা পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুঘুম। আর আমি প্যারিসের এই সমাধিক্ষেত্রে শত-শত মৃত সূর্যকে অতিক্রম করে এক ধূসরিমাময়, চির-পার্শ্বরেখায়িত নারীকে খুঁজে চলেছি, যাঁর দুই হাতে কালের মন্দিরা,ক্রাচ! বোদল্যের-এর বন্ধু নাদার শেষ তাঁকে দেখেছিলেন ১৮৭০ সালে বোদল্যের-এর মৃত্যুর তিন বছর পর, ক্রাচ হাতে হেঁটে চলেছেন একা।

অর্ধকৃষ্ণাঙ্গিনী জান দ্যুভাল। যাঁর জন্ম হাইতিতে। ফ্রান্স ও কালো আফ্রিকার সন্তান।

কেউ তাঁর জীবনী লেখেনি। তাঁর নাম কি আসলে জান ল্যমের? কেউ জানে না। পাওনাদারদের এড়াতে তিনি অনেকবার নাম পালটে থাকবেন। ১৮৬৪ সালে তাঁর নাম ছিল মাদমোয়াজেল প্রসপার। তাঁর পরিচয় নিয়ে সংশয়, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে নয়। বোদল্যের-এর কলমে চিনে কালিতে আঁকা নানা ছবিতে তিনি ধরা আছেন তাঁর মোহাবিষ্টতা নিয়ে। আছেন বোদল্যের-এর বন্ধুদের স্মৃতিতে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮৪২ সালে তাঁর সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে প্যারিসের অপরূপ স্যাঁ-লুই দ্বীপে ১০, (এখন ২২) বেথুন সরণিতে উঠেছিলেন বোদল্যের। সেখান থেকে থিয়েটার দেখতে গিয়ে কি ওই মুলাটো পার্শ্ব-অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা?

তরুণ বোদল্যের-এর অশান্ত জীবনধারা ভাল লাগছিল না তাঁর পরিবারের।

গ্রন্থাগার, প্রদর্শশালা, সাহিত্য-বন্ধুত্ব ছাড়াও পথনারীদের প্রতি তাঁর দুর্বার আকর্ষণে ভয় পেয়ে সৎ-পিতা জেনারাল ওপিক তাঁকে প্যারিস থেকে দূরে কোথাও পাঠাতে চেয়েছিলেন। ১৮৪১ সালের জুন মাসে বর্দো থেকে চড়া কলকাতাগামী জাহাজটি বিকল হয়ে ভারত মহাসাগরে মরিশাস ও বুরবঁ (বর্তমান রেয়্যুনিয়ঁ) দ্বীপে নামিয়ে দেয় তাঁকে।

সেই দ্বীপ দু'টি তাঁকে এক অনাস্বাদিত স্বপ্নের স্বাদ দিয়েছিল, যা তাঁর কবিতার স্নায়ুকেন্দ্রে প্রোথিত হয়ে থাকবে। 'অনেক লবণ ঘেঁটে' সেখানেই তিনি লিখেছিলেন 'La Vie antérieure' (অতীতজন্ম), 'Parfum exotique' (সুদূর সুঘ্রাণ), 'A une dame créole' (এক ক্রেয়োল নারীকে), 'Bien loin d'ici'(এখান থেকে অনেক দূরে), 'A une Malabaraise' (এক মালাবার রমণীকে)।

কবিবন্ধু তেওদোর বাঁভিল-এর বিবরণ থেকে জানা যায়— 'আফ্রিকার এক দেশে' যে-পরিবারে বসবাসের কথা ছিল তাঁর, সেখানে টিকতে না পেরে পাহাড়ের ওপর চলে গিয়েছিলেন বোদল্যের, 'এক দীর্ঘকায় রঙিন তরুণীর সঙ্গে, যে ফরাসি জানত না।' হয়তো রং চড়িয়ে ছিলেন বাঁভিল এই বর্ণনায়, কিন্তু বোদল্যের মরিশাসে ওতার দ্য ব্রাগারের বাড়িতে যে মালাবার তরুণীর সাক্ষাৎ পান, সে আসলে বেনারসের মেয়ে, ব্রাগারের শ্যালিকা। 'এক ক্রেয়োল নারীকে'-র নায়িকা ব্রাগারের স্ত্রী। 'এক মালাবার রমণীকে'-র ভারতীয় নায়িকাই কি কালো রঙের মায়াময় দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল বোদল্যের-এর মনে, যা জান দ্যুভাল-এর দিকে আজীবন আকৃষ্ট করবে তাঁকে?

Tes pieds sont aussi fins que tes mains, et la hanche
Est large à faire envie à la plus belle blanche...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমারই হাতের মতো সুকুমার তোমার পা দুটি,
জঘনে জাগাও ঈর্ষা ব্যক্ত করে শ্বেতাঙ্গীর ত্রুটি,
ভাবুক শিল্পীর চোখে কম্প্র কান্ত তোমার শরীরে
আরও গাঢ় কালো জ্বলে মখমল—চোখের গভীরে।

(অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

আরও একটি কবিতা, 'এখান থেকে অনেক দূরে' এবং গদ্যকবিতা 'সুন্দরী দোরতে' মিলিয়ে কি একটি নারী-রূপকল্প তৈরি হয়, যা জানের দিকে প্রবাহিত করবে শার্ল বোদল্যেরকে? দোরতে বা ডরোথির শীর্ণ, কোমল শরীরের নীচে ভারী নিতম্ব, এবং সুউচ্চ তীক্ষ্ণ বক্ষ কি তাঁর অবসেশনকে উন্মোচিত করে? কবিবন্ধু বাঁভিল জান দ্যুভাল-এর বিজয়দৃপ্ত চলনের (démarche triomphale) কথা উল্লেখ করেছেন। জান যেন একইসঙ্গে স্বর্গীয় ও জান্তব, তাঁর ঘন কালো চুল প্রায় অন্ধকারের মতো নীল, তাতে মৃদু সমুদ্র-লহরী। বড়-বড় দীর্ঘ বাদামি চোখ, তীব্র মাদকতাময় ঠোঁট এঁকে দেয় বোদল্যের-এর মুগ্ধতার রূপরেখা। জান-এর শরীরঘ্রাণ তাঁকে মাতাল করে। তিনি যেন আবহমান প্রকৃতি।

কিন্তু এখানেই কি শেষ হতে পারে বোদল্যের-প্রেয়সীর জটিল আধুনিক প্রতিমা? জান দ্যুভাল চতুর, মিথ্যুক ও ব্যভিচারী, খরুচে ও মদ্যপ, সেইসঙ্গে অশিক্ষিত ও নির্বোধ। শিল্পী-সাহচর্যের চেয়ে শরীরজীবিকার জগৎ হয়তো তাঁর পক্ষে প্রিয়তর ও অনিবার্য ছিল। সিফিলিস-আক্রান্ত এই বিষম ব্যতিক্রমী প্রেমিকযুগল কি এক নতুন মৃত্যুর দিশারী?

বোদল্যের-এর 'অন্তরঙ্গ জার্নাল'-এ যে পুঞ্জীভূত হিংস্র নারীবিদ্বেষ, তা কি জান দ্যুভাল-এর প্রতি নিরবচ্ছিন্ন প্রেম ও ঘৃণার ধারাবাহিক পরিণাম? বোদল্যের নিজেও প্রেমে পড়েছেন আপোলোনি সাবাতিয়ে-র মতো অপরূপ জীবন্ত ভাস্কর্যের, কিন্তু তারপর অনিবার্যভাবে ফিরে এসেছেন তাঁর নির্বোধ, শরীরসর্বস্ব, মলিনবেশ প্রেমিকার কাছে। বোদল্যের কি তাঁকে ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়ের বিহ্বলতা অতিক্রম করে এক নীতশোক, উজ্জ্বল সময়স্রোতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন?

জান দ্যুভাল তো এক ছিন্ন সময়ের মুখোমুখী। কবির 'maîtresse'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(mistress)-রা অশিষ্ট, অমার্জিত ও ইতর— এমন অভিযোগ করেছেন ১৮৫১ সালে নাটক ও উপন্যাস-বিষয়ক এক নিবন্ধে। 'আমার নগ্নায়িত হৃদয়' ভাবনাপঞ্জিতে তাঁর নারীবিদ্বেষী উক্তির তালিকা দিতে ভয় হয়, পাছে পাঠক ভেবে বসেন তা সত্যি।

আফ্রিকার দু'টি দ্বীপ থেকে ফেরামাত্রই ১৮৪২ সালে বোদল্যেরকে যে নারী পাশবিক ও স্বর্গীয় আকর্ষণে বেঁধে ফেলেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বোদল্যের এক বিচিত্র উক্তি করেন ১৮৪৬ সালের মার্চে 'ভালবাসা সম্পর্কে সান্ত্বনামূলক কতগুলি কথা' নামক রচনায়:

> অনেকে একটি নারীকে ভালবেসে লজ্জায় লাল হয়, যখন বুঝতে পারে যে সে কত নির্বোধ। (এই দাম্ভিকেরা বোঝে না) নির্বুদ্ধিতা সৌন্দর্যের ভূষণ! তা নারীর চোখে আনে এমন এক বিষণ্ণ স্বচ্ছতা যা কালোছায়া এক দিঘির মতো, তা যেন বিষুব সমুদ্রের তৈলাক্ত শান্ত রূপ।

জর্জ সাঁদ-এর মতো প্রবল ক্ষুরধার লেখিকাকে সহ্য করতে পারেননি বোদল্যের। শিক্ষিতা, অভিজাত নারীদের ('bas bleu') প্রতি এত ক্রোধ কেন তাঁর? তাঁরা কি কেউ জান দ্যুভাল-এর সঙ্গে শোভন আচরণ করেননি? এই বিদ্বেষ আর ঘৃণার আড়ালে কি আসলে এক আশ্চর্য অক্ষয় অনির্বাণ প্রেম?

১৮৪৫ সালের ৩০ জুন, যাঁকে সব সম্পত্তি (হায়!) লিখে দিয়ে ছুরির আঘাতে নিজের জীবন নিতে চেয়েছিলেন বোদল্যের, সেই নারী কি কোনওদিন বুঝেছেন তাঁর কবিতা ও শিল্পভাবনার মাহাত্ম্য? জান দ্যুভাল-এর অসহায়, অতৃপ্ত আত্মা কি কোনওদিন বুঝেছিল বোদল্যের-এর অন্তরে কোন আকাশপ্রদীপ জ্বলছে?

আমি মঁপারনাস সমাধিক্ষেত্র থেকে বুলভার রাসপাই-তে বেরিয়ে পাথর হয়ে যাই। ক্রাচ হাতে প্রায়-অন্ধ এক ছায়ানারী মোমের আলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কোন এক অলৌকিক সপ্তর্ষি নক্ষত্রের দিকে। হাওয়ায় তাঁর ছিন্ন বসন উড়ছে।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৫

ভোররাতে একটি ফুলের পাপড়ি খুলে যাচ্ছে। তার ত্বকে মুক্তোর মতো ভালবাসার স্বেদবিন্দু। যার মধ্যে কাঁপছে গোটা পৃথিবী।

এ ভাষা প্রেমের, স্বচ্ছতার, শুদ্ধতার। এত নিবিষ্ট, এত আত্মমগ্ন এই ধ্যান।

পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো নীল
ভুল কোরো না, শব্দেরা মিথ্যে কথা বলে না
চুম্বনের সময় ওরা আর তোমায় গান গাইতে বলে না
পাগল ও প্রেমিকেরা
মেয়েটির প্রেমিল মুখ
সমস্ত গোপনীয়তা সমস্ত হাসি
আর উদারতায়
যেন সে পুরোপুরি মগ্ন হয়ে আছে।

ফুলগুলি সবুজ ফুল
ভোর তার গলায় পরেছে
একটি জানলার হার
ডানাগুলি ঢেকে ফেলে পাতা
তোমার মুখে সূর্যস্নাত আনন্দ

পৃথিবীর সমস্ত রোদ্দুর
তোমার সৌন্দর্যের রাস্তা জুড়ে।

('নীল রঙের পৃথিবী')

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একই সঙ্গে অভ্রান্তভাবে সমকালীন ও ক্লাসিক, কে তুমি?

রুপোলি শিশিরে মোড়া মাঠ পেরিয়ে আমি হাঁটছি। আমার হাত ধরে আছেন যিনি, তাঁর আঙুলের ঘনিষ্ঠ তাপ ছুঁয়েই আমি বুঝেছি, তিনি অরুণ মিত্র। আমরা চলেছি সেই প্রবাল-সবুজ জলস্রোতের দিকে, যাঁর নাম পল এল্যুয়ার। তটে বসে আছেন তাঁর বন্ধুরা— পিকাসো, ব্র্যতঁ, ফিলিপ সুপো, রনে শার। মাক্স এর্নস্ত কি? সবাইকে তো চিনি না।

এল্যুয়ার কবিতা পড়ছেন ফরাসিতে। জলের শব্দে মিলিয়ে যাচ্ছে তাঁর কণ্ঠস্বর। আর আমি শুনছি অরুণ মিত্রের গলায় এল্যুয়ারের আশ্চর্য অনুবাদ:

আমি ছিলাম মানুষ আমি ছিলাম পাথর
আমি ছিলাম মানুষের ভিতরের পাথর পাথরের ভিতরের মানুষ
আমি ছিলাম আকাশে পাখি পাখিতে শূন্য
আমি ছিলাম শীতে ফুল সূর্যে নদী
শিশিরের ভিতরে চুনি
ভ্রাতৃত্বে একক ভ্রাতৃত্বে মুক্ত

('আমার সময়', অনুবাদ: অরুণ মিত্র)

অরুণ মিত্র বলছেন, 'দেখেছ? অনুবাদটা তোমার, তোমাকেই উৎসর্গ করেছি!' এল্যুয়ারের কবিতার নদীতে কয়েকটা নুড়ির ওপর শুয়ে আছি আমি। বলছি, 'তাই তো!'

য়্যুজেন-এমিল-পল গ্র্যাদেল (১৮৯৫-১৯৫২) তাঁর আসল নাম। জন্ম ফ্রান্সের স্যাঁ-দনি'তে। বাবা ছিলেন হিসেবরক্ষক, মা করতেন সেলাই। আট বছর বয়সে প্যারিসে চলে আসেন তাঁরা। ষোলো বছর বয়সে পড়াশোনায় দাঁড়ি টানেন ফুসফুসে যক্ষ্মার জন্য। আমি দেখছি সুইজারল্যান্ডে, দাভোর স্যানাটরিয়ামে বসে কবিতা পড়ছেন এক কিশোর। হুইটম্যান, বোদল্যের, নেরভাল, র‍্যাঁবো, লোত্রেয়ামঁ, জার্মান রোমান্টিকরা, আপোলিনের-এর। ১৯১৩ সালে, আঠেরো বছর বয়সে প্রথম কবিতার বই 'প্রথম প্রেম'। এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বছর পর 'নিরর্থকদের সংলাপ'। দিদিমা'র নামে নিজের নাম রাখবেন এল্যুয়ার। পল এল্যুয়ার।

এক রুশ তরুণীর শিষ্য বলছেন নিজেকে, ভালবাসছেন তাঁকে। তাঁর নাম হেলেনা দিয়াকোনোভা, যাঁর নাম নতুন করে রাখলেন এল্যুয়ার—'গালা'। তাঁকে বিয়ে করবেন ১৯১৬ সালে, তাঁরা একসঙ্গে সংসার পাতবেন ১৯৩০ পর্যন্ত, যখন হঠাৎ একদিন গালা হারিয়ে যাবেন চিত্রশিল্পী সালভাদর দালি'র সঙ্গে। রহস্যময়ী গালা ছাড়া এল্যুয়ার-এর কবিতা কী করে সমার্থক হয়ে যেত প্রেমের সঙ্গে?

> সমস্ত কিছুই আমি বলেছি, গালা, তোমাকে শোনানোর জন্য।
> আমার ঠোঁট তোমার চোখে আধারিত ছিল।

১৯২৯ সালে 'ভালবাসা, কবিতা' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে এল্যুয়ার লিখেছিলেন: 'গালাকে, এই অনন্ত বই'।

যক্ষ্মারোগ থেকে মুক্তি পেয়েই যুদ্ধে যেতে হয়েছিল তাঁকে। দেখেছিলেন ভয়ংকরকে। এল্যুয়ার নামে লিখেছিলেন তিনটি ছোট-ছোট বই, যাতে মিশে গিয়েছিল অনুকম্পা ও কোমলতা। একটি বইয়ের নাম 'শান্তির জন্য কবিতা।' নৈরাজ্যবাদীদের বন্ধু (গোনোঁ, দারতেজ) তিনি, জাঁ পলাঁ'র মাধ্যমে লুই আরাগঁ, ফিলিপ সুপো আর আঁদ্রে ব্র্যতঁ-র সঙ্গে পরিচয়। 'দাদাবাদী'দের আন্দোলনে প্রবলভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি ('জন্তুরা এবং তাদের পুরুষেরা'), প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শব্দকে ভিতর থেকে বদলে দেওয়ার শপথ-নেওয়া পত্রিকা 'প্রবাদ'। যা বদলে দেবে শব্দের চরিত্র, তাকে করে তুলবে মায়াময় এক সত্য। গালা আর বন্ধু মাক্স এর্নস্ত-এর সঙ্গে তাঁর ত্রিভুজ সম্পর্ক কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে। তাই কবিতাকে বিদায় জানানোর জন্য লিখলেন তাঁর 'শেষ বই': 'মরব কি মরব না'। তারপর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসে ('voyage idiot'), যা নিয়ে একটি কথাও তিনি বলেননি, যোগ দিলেন স্যুররেয়ালিস্‌ম্ আন্দোলনের সঙ্গে, যাতে তিনি সামিল থাকবেন ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত।

স্যুররেয়ালিস্‌মের সঙ্গে যুক্ত হল কমিউনিজ্‌ম্। যেমন হয়েছিল লুই আরাগঁ-র ক্ষেত্রেও। মানুষী প্রেম মিশে গেল মানবপ্রেমের সঙ্গে। কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষার সব যান্ত্রিকতার মুখে ছাই দিয়ে এল্যুয়ার এক পাগলামিতে ভরা পৃথিবী আর তার ঘরসংসারকে তর্জনীতে ছুঁয়ে থাকেন। প্রেমকে স্নায়ুশিরায় ধারণ করে আধুনিক ফরাসি কবিতার দুর্গম যাত্রাপথে এ এক মগ্ন স্রোত। মানবতাবাদী এই স্যুররেয়ালিস্ত কি গত শতাব্দীর ফরাসি কাব্যের শ্রেষ্ঠ মিস্টিক?

এল্যুয়ার-এর দ্বিতীয় স্ত্রী মিউজ়িক হলের শিল্পী ন্যুশ-এর অকালমৃত্যু (১৯৪৬) তাঁকে আবার চুরমার করে দেয়। মৃত্যুর আগের বছর বিয়ে করেন দমিনিক-কে।

১৯৫২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর অরুণ মিত্র লিখেছিলেন:

> এল্যুয়ারের কাব্যে চড়া সুর প্রায় নেই। কবিতায় তিনি কথা বলেন ধীরে ধীরে গাঢ় স্বরে, যা স্বগতোক্তির মতো শোনায়। তাঁর কাব্যের মেজাজের সঙ্গে এই স্বরের সম্পূর্ণ স্বভাবগত মিল।... কান পেতে শুনলে তার সম্মোহন আছে, বিশেষত ওই একটানা অনর্গল ধ্বনির। তাঁর একটি গ্রন্থের নাম Poésie ininterrompue, নিরবচ্ছিন্ন কাব্য। এ নাম তাঁর কবিকণ্ঠেরই এক প্রধান লক্ষণ।
>
> ('ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে', অরুণ মিত্র)

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এক কবি, মানবযন্ত্রণা যাঁকে এক একাকী নির্জন গৃহকোণ থেকে নিঃশব্দে টেনে আনে বহু মানুষের স্পেসে, 'de l'horizon d'un seul à l'horizon de tous,' একজনের দিগন্ত থেকে সকলের দিগন্তে।

স্পেনীয় যুদ্ধের পর তিনি অনিবার্যভাবে স্যুররেয়ালিস্‌ম্‌ থেকে সরে যাচ্ছিলেন কমিউনিজ্‌মের দিকে। ১৯৪২ সালে যোগ দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। সংগ্রাম চলল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, কবিতা হয়ে উঠল বর্বরতার বিরুদ্ধে অস্ত্র। 'গের্নিকা', 'স্বাধীনতা'-র মতো কবিতা—যেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রানসে নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় সহযোদ্ধারা বিমান থেকে ফেলেছিলেন, তাঁকে করে তোলে 'প্রতিরোধের কবিতার রাজকুমার'। তাঁকে বলা হয় ফরাসি সাহিত্যিকদের জাতীয় কমিটির ('কমিতে নাসিওনাল দে জ়েক্রিভ্যাঁ') হাল ধরতে।

সবচেয়ে স্তালিনীয় মুহূর্তেও ('রাজনৈতিক কবিতা' ১৯৪৮; 'নীতিশিক্ষা',

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৪৯) এল্যুয়ার-এর কাব্য ভালবাসার মুক্তোমালা হয়ে থাকে। যা থেকে চুঁইয়ে পড়ে রক্তরেখা। 'নির্ভার আমার প্রেম ভারী হয়ে ওঠে অত্যাচারের ভারে'।

আমি মিথ্যার অবোধ্য ভূমিকে উল্টে দিয়েছি
আমি নিরালোক ভঙ্গিগুলোকে আর অথর্ব দিনগুলোকে উল্টে দিয়েছি
আমি পড়া কথা আর শোনা কথা পৃথিবীর উপর ছুঁড়ে ফেলেছি
আমি চিৎকার করছি।
প্রত্যেকে কথা বলছিল বড় আস্তে কথা বলছিল লিখছিল বড় আস্তে
আমি চিৎকারের গণ্ডি সরিয়ে দিয়েছি

কাজ সহজ হয়ে গেল
কারণ জীবনের উপর যে-দৃষ্টি হেনে মৃত্যু
আমার সামনে এসেছিল তাকে আমি হটিয়ে দিয়েছি
একটি চিৎকারে
এত জিনিস অদৃশ্য হয়েছে যে বাঁচার যা যোগ্য
তার কণামাত্র আর অদৃশ্য হবে না কখনও

আমি এখন নিশ্চিত যে বসন্ত
গান গাইছে হিম দরজার নিচে
('চিৎকার', অনুবাদ অরুণ মিত্র)

চুরমার হতে থাকা, প্রবহমানতা নষ্ট হওয়া, অবিশ্বাসী এক সময়ে এল্যুয়ার-এর কবিতা যেন বেঁচে থাকার জীয়নকাঠি। যার জাদু পৃথিবীকে পুনর্নির্মাণ করে দেয়, কবিতা হয়ে ওঠে ভালবাসার সোনালি ক্রিয়াপদ, যেখানে নারী হয়ে ওঠে ব্যক্তিমানুষ আর বিশ্বের মাঝে অপরিহার্য স্বপ্নসেতু। এ-কবিতা এত অন্তরঙ্গ যে 'সব কথা বলা যায়', কথা আর প্রেম সমার্থক হয়ে ওঠে। এক হিংস্র সময়ে লিরিকের এ এক নবজন্ম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুমি আমায় যতটা চেনো
তার বেশি আমায় চেনা যায় না

তোমার চোখের মধ্যে যেখানে আমরা ঘুমোই
দুটি চোখেই
আমার পুরুষ-বীণা দিয়ে তৈরি হয়েছে
এক ভবিতব্য যা রাতের চেয়ে সেরা

('তুমি আমায়')

তুমি উঠে দাঁড়ালে জলের ভাঁজ খুলে যায়
তুমি শুয়ে পড়লে জল পুষ্পিত হয়

তুমি জল যা খাদের কিনার থেকে ফিরে আসে
তুমি মাটি যা শেকড়কে প্রসারিত করে
যার ওপর সব কিছু দাঁড়িয়ে

শব্দের মরুভূমিতে তুমি ছড়িয়ে দাও নৈঃশব্দ্যের বুদ্বুদ
তুমি গাও রাত্রি-স্তব
রামধনু রেখা নিয়ে
সমস্ত রাস্তা মুছে দিয়ে সব জায়গায় তুমি
তুমি সময়কে ছুড়ে ফেলেছ
আগুনের শিখার অনন্ত যৌবনের মধ্যে
যা প্রকৃতিকে ঢেকে দেয় তাকে নতুন করে ফিরিয়ে আনবে বলে

নারী
তুমি পৃথিবীকে দিয়েছ এক শরীর যা কখনও বদলায় না
তোমার

তুমি মিল

('সহজ')

একটি বেড়াল রাতের ভেতর দাঁড়ায়, চিৎকার করবে বলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খোলা হাওয়ায় রাতের ভেতর বেড়ালটি ডাকে।
আর মানুষের দুঃখী উচ্চতা থেকে, মানুষ সেই ডাক শোনে।
('থাবা')

আলোর মতো একটি পশু একটি দেশলাইয়ের চেয়েও বেশি।
('পশু')

এল্যুয়ার-এর কবিতার প্রতিরোধ কখনওই তাৎক্ষণিকে থমকে থাকেনি। তাঁর ধমনীতে এক আলো জ্বলে, যা অতীত ও ভবিষ্যতে দীপ্ত হয়, প্রসারিত হয়। এ এক ঝরনা, যা ছায়া-আলোর মিশ্রণ। গায়েতাঁ পিকঁ-র ভাষায়, এল্যুয়ার-এর কবিতায় 'প্রেমের রাত্রি ছুঁয়ে থাকে দিনকে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এক গহন সম্মোহন, এক আশ্চর্য দীপ্তি, যা সমসাময়িক আঁরি মিশো বা ফ্রাঁসিস পঁজ-এর চেয়ে তাঁকে লামার্তিন বা বোদল্যের-এর (যাঁর নির্বাচিত কবিতার ভূমিকা লিখেছিলেন এল্যুয়ার) কাছে টেনে আনে। নিচু গলার এই প্রগাঢ়তা আমি খুঁজছি কত লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে।

ঘুমোনোর সময় আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি।
এই প্রেম হ্রদের পাকা ফলের চেয়েও ভারী
হাসিকান্নাহীন প্রবহমান
একটি দিনের পর একটি দিন একটি রাতের পর আমরা।

সৃজনের এই জাদু এক নক্ষত্রনীলিমার নির্ঝর থেকে উঠে এসেছে। ১৯৫২ সালের ২২ নভেম্বর এল্যুয়ার-এর হৃদরোগে মৃত্যুর চারদিন পর প্যারিসের 'পের লাশেজ' সমাধিক্ষেত্রে তাঁর শেষকৃত্যে বন্ধুরা ভিড় করেছে। পিকাসো, সার্ত্র, কাম্যুর পাশে ওটা কে? নেরুদা? কে যেন— আরাগঁ কি?—পড়ছেন এল্যুয়ার-এর একটি পংক্তি:

যখন তার মৃত্যু হল সে ভাবল তার জন্ম হচ্ছে।
কারণ সূর্য উঠছিল।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৬

এই উদ্ধত আর অবাধ্য শিশুটিকে নিয়ে আর পারা যায় না। যখন-তখন কোন এক অজানা নক্ষত্র থেকে নেমে এসে সে ঢুকে পড়ে আমার ঘরে, আর খুলে দেয় সব দরজা-জানলা। তারপর চিৎকার করে সুরেলা গলায় রুশ ভাষায় পড়তে শুরু করে তার কবিতা, যেমন সে কারখানার শ্রমিকদের সামনে পড়ত।

পরনে, তার ছোটবেলার বান্ধবী এলসা যেমন লিখেছেন— মা'র কেনা পাতিলেবু রঙের জামা, যেটা কোমর ছাড়িয়ে অনেকটা নেমে গিয়েছে, গলায় মস্ত কালো রঙের টাই আর মাথায় টুপি। হাতে ছড়িটিও আছে। আর কোটের পকেটে উপন্যাসের মতো বিরাট একটা কার্ড, যাতে লেখা: 'ফিউচারিস্ট ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি'। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মান রে যে শুধু ফরাসি বিদ্রোহের কাব্যের রাজকুমার পল এল্যুয়ার-এর কবিতার পার্শ্বচিত্র আঁকেননি, তাঁরও জম্পেশ একটি ছবি তুলেছেন, সেকথা আমায় মনে করিয়ে দেয় সে।

কখনও জানলার বাইরে থেকে তার কণ্ঠস্বর শুনি:

উত্তরপুরুষ।
অভিধানের ছিপি আঁটা আছে কিনা দেখ
বিস্মরণের পাতাল থেকে
উঠে আসতে চাইবে
এইসব শব্দের অবশেষ

কিংবা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন শতাব্দীদের দাড়ি সাদা হবে
তখন সঙ্গীনের মুখের মতো সাংঘাতিক
এই দিনগুলোর বোধহয়
কিছুই থাকবে না
এক তুমি ছাড়া
আর এই আমি ছাড়া

আমি চিৎকার করে ডাকি, মায়াকভস্কি। মায়াকভস্কি। এখানে এই মৃত্যুনিশীথে আপনাকে যে বড় দরকার। কিন্তু সে যেন শুনতেই পায় না। সে হাত দুলিয়ে-দুলিয়ে বিড়বিড় করে হাঁটে, যেমন এলসা লিখেছেন, কখনও ছোট ছোট পায়ে, যাতে বিড়বিড়ানি না বাধা পায়। কখনও দ্রুত, পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে। যখন সে জুতসই শব্দ খুঁজে পায়, তখন তার চোখ দিয়ে জল বেরোয়, যন্ত্রণায় এবং স্বস্তিতে।

সে যেন সকলের চেয়ে আলাদা। কবিতা পড়ে লোককে মুগ্ধ করে অথবা খেপিয়ে দিয়ে সে ফিরে আসছে লুবিয়ানস্কায়া স্কোয়্যারের কাছে মস্কোর গরিব মহল্লার মোটা কুৎসিত দেওয়ালওলা এক ধোঁয়াশা ঢাকা বাড়ির চারতলায়, তার ঘরে। সেখানে আলো ঢোকে না তো বয়েই গেল! জানলার ধারে খাড়া টেবিলের পাশে একটা সরু কালো অয়েলক্লথে ঢাকা বিছানায় শুয়ে সে অক্লেশে ঘুমোত।

মস্কোর শীতে অয়েলক্লথের ঠান্ডায় তার কষ্ট হত কিনা কে জানত! সে উন্মাদের মতো পয়সা ওড়াত, জুয়ায় হারত, কিন্তু আরাম বা বিলাসিতা সম্পর্কে তার থোড়াই পরোয়া। রবারের ভ্রাম্যমান স্নানের টবটি ছাড়া শৌখিনতা বলতে মস্কোর সেরা দরজির দোকানে গিয়ে পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চটকদার পোশাক বানানো। আর সে ভালবাসত ভাল ফাউন্টেন পেন, টাইপরাইটার আর নানা রঙের গরম সোয়েটার। মায়াকভস্কির শ্রোতা-পাঠকেরা আর প্রেমিকারা জানত যে, সে ওডিকোলন মাখতে ভালবাসে। ভালবাসে ঘনঘন সুগন্ধি সাবান দিয়ে হাত ধুতে। হঠাৎ কোনও কবিতা-পাঠের আসরে কোনও গুরুগম্ভীর ভদ্রলোককে সিগারেট কিনতে পাঠায়। যেন কেলেঙ্কারি ঘটানোই তার কাজ!

বলশেভিক পার্টিকে আর বিপ্লবকে সে সর্বান্তকরণে ভালবেসে ফেলেছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ফিউচারিস্ট সাহিত্য-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ পুরোধাদের একজন সে, কবিতার বিপ্লব আর সমাজ-বিপ্লবকে সে এক করে ভেবেছিল। তার শিল্পজ্ঞান আর মানুষের প্রতি ভালবাসা তাকে করে তুলেছিল এককভাবে স্বতন্ত্র।

মায়াকভস্কির জন্ম হয়েছিল ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ জর্জিয়ার বাগদাতিতে। সে ছিল এক সরকারি বনরক্ষকের সন্তান। কুতাইসে স্কুলে পড়েছে সে। ১৯০৬ সালে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যুর পর জর্জিয়া ছেড়ে দুই বোন আর মায়ের সঙ্গে সে মস্কোর কঠিন জীবন বরণ করে নেয়। ১৯০৯ সালে সে লাইসেন্স ছাড়াই একটি পিস্তল নিয়ে ঘুরত। সে নাকি গোপনে নারী-রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য প্রয়াস করত। ১৯১২ সালে সে বুরলিউক, উরুৎচেনিচ আর খেল্‌বনিকভের সঙ্গে ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টোটি লেখে, যার নাম ছিল 'জনরুচির গালে একটি থাপ্পড়'। ইউরোপীয় 'মডার্নিজম্'-ও হয়তো নতুন এক সাহিত্যভাষা নির্মাণের মুহূর্তে একই ভাবে ভাবছিল। ১৯১৫ সালে যখন ইংরেজিতে প্রকাশিত হচ্ছে টি এস এলিয়টের 'দ্য লাভ সং অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক', মস্কোতে ছাপা হল মায়াকভস্কির 'পাৎলুন-পরা মেঘ' আর 'মেরুদণ্ডের বাঁশি'। ১৯১৭ সালে তার আত্মা দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল বিপ্লবের জন্য। লেনিনের মৃত্যুতে সে মর্মাহত হয়েছিল, তাঁকে নিয়ে লিখেছিল এক দীর্ঘ কবিতা। হাসিঠাট্টা ও বিদ্রূপও সে ভালই পারত। সোভিয়েত সমাজের নানা গলদকেও সে ছেড়ে কথা বলেনি। 'ছারপোকা' (১৯২৯) নাটকটি এর উদাহরণ। বিপ্লবের শ্লথ বিবর্তন তার পছন্দ হচ্ছিল না। হওয়ার কথাও না। সে সরলভাবে ধরে নিয়েছিল— বিপ্লব মানে মুক্তি, বিপ্লব মানে ব্যক্তির উন্মীলন।

কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শকে সে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল। কিন্তু কোনো কোনও কবিতা ও নাটকের জন্য তাকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কুনজরে পড়তে হয়েছিল। লেনিন তার গুণগ্রাহী ছিলেন, ১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর স্তালিন তাকে সোভিয়েত দেশের 'শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রতিভাবান শিল্পী' বলে ঘোষণা করেন। তবে কেন রাষ্ট্র তার গতিবিধির ওপর নজর রাখত? কেন সেন্সরের সঙ্গে অব্যাহত ছিল তার লড়াই?

সে প্রতিবাদের পায়রা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কবিতার এই দীর্ঘকায় যোদ্ধার মতে, কয়েকজনের জন্য শিল্প, কয়েকজনের জন্য বই মূল্যহীন। এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিমত সম্পূর্ণ সত্যি নয়। তার মতে, এগুলো হল জনগণের জন্য শিল্পের বীজ ও কাঠামো। ১৯২০ সাল নাগাদ মায়াকভস্কি বলতে শুরু করে সে ফিউচারিস্ট নয়।

পুশকিন বা তলস্তয় যে শেষ কথা নয়, সে জানত। সে লিভাদিয়া প্রাসাদে চাষিদের সামনে কবিতা পড়েছিল, কবিতা পড়েছিল বাকুর জাহাজঘাটায়, স্মিট কারখানায়, শাউমিয়ান ক্লাবে, তিফলিসের শ্রমিকদের মধ্যে। সে কবিতা পড়েছে ধাতুর কারখানায় গম্বুজের ওপর দাঁড়িয়ে, যন্ত্রের আওয়াজের মধ্যে। কবিতা পড়ার দুর্বোধ্যতার অভিযোগে বিরক্ত মায়াকভস্কি শ্রমিকদের অনুরোধ করে তাঁরা কতখানি বুঝলেন জানাতে। এমন দুঃসাহসিক প্রশ্ন আর কে করতে পারত সে ছাড়া? শ্রমিকেরা জানান যে, কবিতা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি। শুধু একজন ছাড়া। তিনি জানান, একা পড়ে যা বুঝেছিলেন, শুনে তার চেয়ে কিছুটা বেশি বুঝেছেন। তিনি ছিলেন এক হিসেব-রক্ষক।

তার প্রেমিকা ও স্ত্রী লিলিয়ার ছোট বোন এলসাকেও (আরও অসংখ্য সুন্দরীর মতো) কি ভালবেসেছিল মায়াকভস্কি? এলসা পরে বিশিষ্ট ফরাসি কবি লুই আরাগঁকে বিয়ে করেন। এলসার জন্য লেখা আরাগঁর প্রেমের কবিতাগুলো ফরাসি কবিতার আকাশে গ্রহ-তারার মতো জ্বলছে। কিন্তু এলসা নিজে মায়াকভস্কির যে লাবণ্যময় ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন স্নিগ্ধ তুলি-টানে, তা একেবারেই দুর্লভ।

এলসার বইয়ে দেখতে পাচ্ছি, মায়াকভস্কি মেঝের ওপর বসে খাটের ওপর কাগজের প্যাড রেখে চিঠি লিখছে। শিশুরা পড়ার বা লেখার জন্য সবসময় যেমন সবচেয়ে অসুবিধেজনক অবস্থানটা বেছে নেয়। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য সেভাবে থাকবে— এমন ভাব দেখালেও শিশুদের মতো মায়াকভস্কিও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেভাবে বসে থাকত।

তার শত্রু তো কম ছিল না। এলসা জানিয়েছেন, তাকে বিদ্রুপ করত 'ফিউচারিজম্' ও বামবিরোধী নানা গোষ্ঠী। কেউ কেউ মনে করত পুশকিন ও তলস্তয়ের মতো ছাড়া অন্য কোনওভাবে লেখা চলবে না। তারাও ছিল, যারা প্রোলেতারিয়েত ছাড়া অন্য কারওর লেখা স্বীকার করতে নারাজ। তারা দাবি করত, মায়াকভস্কি যা লেখে, তা সে বিশ্বাস করে না। তারা ছিল, যারা পার্টির নিষ্ঠাবান সদস্য না-হওয়ার জন্য তার নিন্দে করত, তারাও ছিল, যারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিন্দে করত সে পার্টির লোক বলে। সবচেয়ে অসুবিধে করত শাসকের জুতো মুখে করে ঘোরা ক্ষমতালোভীরা।

কিন্তু মায়াকভস্কি তো 'পাৎলুন-পরা মেঘ'। সে এদের মোকাবিলা করত চরম ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞার সঙ্গে কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সে কি বুঝেছিল, তার সমাজপ্রেম আর ব্যক্তিপ্রেম এক কালচে লাল রক্তবিন্দুতে শেষ হয়ে যাবে?

কপালের রক্তচিহ্নটা সে ঠিক-ঠিক দেখেছিল।

অতঃপর একটি পিস্তলের গুলিতে পূর্ণচ্ছেদ।

১৯৩০ সালের ১৪ এপ্রিল। তার মাথায় একটা ঢেঁড়া-চিহ্ন। এ কি জাঁ কক্‌তো'র 'কবির রক্ত'?

মাটিতে শিশুর মতো পড়ে আছে মায়াকভস্কি। সে 'কমরেড গভর্নমেন্ট'-কে অনুরোধ করেছে তার পরিবারকে দেখতে। আর স্ত্রী আর প্রেমিকা লিলিয়াকে লিখেছে: 'আমায় ভালবেসো।'

পাৎলুন-পরা মেঘ!

কৃতজ্ঞতা: 'মায়াকভস্কি'। এলসা ত্রিয়োলে।
ফরাসি থেকে অনুবাদ: অরুণ মিত্র।

৪ অক্টোবর ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৭

ইতিহাসে মাঝে-মাঝে ঝড় ওঠে, আর উড়ে যায় স্বেদকৃষ্ণ নক্ষত্রকণিকা। আমি এক অলৌকিক সমুদ্রসৈকতে শুয়ে আছি। আমার সামনে খুলে যাচ্ছে আকাশের হাজার জানলা। খুব জোরে দৌড়চ্ছে কেউ, কাচ ভাঙার শব্দ। অবশেষে একটি সাদা পাতা।

চুপ।

সাদা।

সাদা রঙের আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

আমি সেই সাদা পৃষ্ঠার শান্তি ছুঁয়ে থাকি।

তারপর মহাপ্রলয় এসে যখন তাকে সরোষে ছিনিয়ে নিতে চায়, আমি বুঝতে পারি এটা একটা ইংরেজি বইয়ের অধ্যায়, যে-অধ্যায়টি সাদা রং দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে।

অন্ধকারের ভিতর ন'খণ্ডের সেই বইটির নাম জ্বলজ্বল করে: 'দ্য লাইফ অ্যান্ড ওপিনিয়ন্‌স্ অফ ট্রিস্ট্রাম শান্ডি, জেন্টল্‌ম্যান' (১৭৫৯-১৭৬৭)। মুছে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলো ষষ্ঠ খণ্ডের ৩৮তম অধ্যায়। আমি আঠেরো শতকের এই আশ্চর্য উপন্যাস ওলটাতে ওলটাতে দেখি কখনও শব্দ, কখনও কয়েকটি বাক্য মহাশূন্যে মুছে গিয়েছে। কখনও তা লাতিনে বা ফরাসিতে লেখা। কখনও একটিমাত্র বাক্যে শেষ হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়! (৪র্থ খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়) কখনও প্যারিসের প্রতিটি এলাকার রাস্তার সংখ্যার এক দীর্ঘ ও আজগুবি তালিকা দেওয়া হয়। কখনও কথক হঠাৎ গান জুড়ে দেন। কখনও বলা হয়েছে:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কখনও একটি নয়, সম্পূর্ণ দু'টি পৃষ্ঠা কালো রঙে ঢাকা (প্রথম খণ্ড, ৩৬তম অধ্যায়)। মাঝে মাঝে বাক্যের অধিকাংশ শব্দ মুছে গিয়েছে। কোথাও হঠাৎ একটি অকিঞ্চিৎকর ছবি আঁকা আছে!

উপন্যাস না ফ্যান্টাসি? না শুধুই এক রসিকতা? ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ঠাট্টা? না তিনিই ইওরোপের প্রথম প্রকৃত পোস্টমর্ডানিস্ট?

ইংরেজ-আইরিশ ধর্মযাজক ও ঔপন্যাসিক লরেন্স স্টার্ন (১৭১৩-১৭৬৮) যখন লিখছিলেন এই চির-ব্যতিক্রমী বইটি, তখন তাঁর মা মারা যান, স্ত্রীর স্নায়বিক বিপর্যয় চলছে এবং তিনি আত্মহননের চেষ্টা করছেন, মেয়ে অসুস্থ। এই উৎকণ্ঠার মধ্যে ১৭৫৯ সালের প্রথম তিন মাসে আঠেরোটি অধ্যায় লিখেছিলেন তিনি। মা ও মামার মৃত্যু। গভীর যন্ত্রণার মুহূর্তে এমন এক আলোকময় গ্রন্থ লেখা হল।

গ্রন্থ যেন হয়ে উঠল এক দর্শন। যা বইয়ের ধারণাটিকেই প্রশ্ন করে! উপন্যাসের প্রথম পর্বেই কী করে স্টার্ন পৌঁছলেন সেই প্রশ্নময়তায়, যা উত্তরাধুনিকরা তুলবেন বিশ শতকে? অথবা অত আগেই কী করে উপন্যাসের প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনায়াসে মিলে যাবে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সঙ্গে?

> The mind receives a myriad impressions—trivial, fantastic, evanescent, or engraved with the sharpness of steel. From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms... so that, if the writer were a free man and not a slave, it he could write what he chose, not what he must, if he could base his work upon his own feeling and not upon convention, there would be no plot, no comedy, no tragedy.

মডার্নিজ়ম-এর প্রথম পর্বে যা ভাবছিলেন চৈতন্যপ্রবাহী উপন্যাসের নায়িকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, তা যেন স্টার্নের নির্দেশিত পথেই জীবনকে সাদা পৃষ্ঠার শরীরে সঞ্চারিত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। ইংরেজি উপন্যাসের জন্মলগ্নেই যেন বানানো কাঠানোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল স্টার্নের এই প্রতি-উপন্যাস 'দ্য লাইফ অ্যান্ড ওপিনিয়নস অফ ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডি'।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফরাসি ঔপন্যাসিক মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ-এর 'ক্লেভ-এর রাজকন্যা' বা ফিল্ডিং-এর 'টম জোন্‌স্‌'-এর মতো, উপন্যাস শুরু হওয়ার আগেই ঘটনা শেষ হয়ে যায়নি। যেন প্রথম পুরুষে লেখা এই উপন্যাসে জোরে-জোরে কথা বলে যাচ্ছেন স্টার্ন: 'Writing, when properly managed, is but a different name for conversation!' নিজের 'জীবন ও মতামতের' কথা বলতে গিয়ে ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডি স্বগতোক্তির সুরে জানাচ্ছে কোনও কোনও ঘটনা তার মনে পড়ে যাচ্ছে যার কোনও আপাত 'যুক্তি' নেই। একটি কথার ভিতর অন্য একটি কথা ঢুকে যাচ্ছে, চলে আসছে একটি স্মৃতি, যাকে চেপে রাখা সম্ভব নয়। সেই স্মৃতি হয়তো একটি কাহিনি, যার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।

তাঁদের দেড়শো বছর আগেই কি আমরা মার্সেল প্রুস্ত, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বা জেমস জয়েস-এর ন্যারেটিভ পড়ছি? স্টার্নের এই আশ্চর্য বইটি কি তবে ভবিষ্যতের চৈতন্যপ্রবাহী গদ্যের রূপরেখা? এ যেন 'ইউলিসিস'-এ লেওপল্ড ব্লুম আর শ্রীমতী ব্লুমের স্বগতকথন!

কিন্তু জয়েস-এ যা নেই, সেটা হল, স্টার্নের আঠেরো শতকের উপন্যাসে ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডি নিজেই লেখক, সে চরিত্র-নামের মুখোশ পরে আছে। সে বারবার বিস্মিত হচ্ছে তার স্মৃতিশক্তির উদ্ভট ব্যবহার দেখে। আর সেই উদ্ভটতাকে ব্যবহার করছে নানাভাবে। একদিকে রসিকতা, অন্যদিকে চমক দেওয়া, বিশ শতকের স্যুররেয়ালিস্তদের মতো। অর্থাৎ তোমরা যুক্তিসম্মতভাবে ভাবছ ভাবো, চিন্তার ক্রম অনুযায়ী চিন্তা করো, ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করো, কিন্তু আসলে এসবের কোনও মানে নেই।

যখন কিছু চিন্তা করছি, স্মরণ করছি, তখনই তা ঘটছে। জীবনের গল্প বলতে শুরু করে বইয়ের মধ্যভাগে, চতুর্থ খণ্ডের আগে ট্রিস্ট্রাম-এর জন্মই হয় না! 'অক্সফোর্ড' কমপেনিয়ন টু ইংলিশ লিটারেচার' মনে করিয়ে দেয়: এই বইতে ট্রিস্ট্রামের 'লাইফ'-ও নেই, 'ওপিনিয়ন'-ও নেই!' 'স্টার্ন যেন জন লক-এর 'অ্যান এসে কনসারনিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং'-এর প্রধান প্রতিপাদ্যগুলি প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। ভাবনা-সাজানোর যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে এ এক আক্রমণ।

অন্যের কাছ থেকে সরাসরি অকাতরে আহরণ করতে দ্বিধা করেননি 'ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডি'-র লেখক। তাঁর কণ্ঠস্বর যে অনেকের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, সেটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন ফেরার-এর মাধ্যমে প্রথম জানতে পেরে ইংরেজ পাঠক রুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আজ আমরা জানি রাব্‌লের 'গারগাঁত্যুয়া' (১৫৩৪) আর 'পাঁতাগ্রুয়েল' (১৫৩২-'৩৩)-এর সর্বগ্রাসী শ্লেষাক্ত হাস্যরস নতুনভাবে প্রয়োগ করতে চাইছিলেন স্টার্ন। এই মিল এতটাই যে কোনও ফরাসি সমালোচক বলতে পারেন স্টার্ন রাব্‌লে'কে সরাসরি নকল করেছেন। সেইসঙ্গে ব্যবহার করতে চাইছিলেন সেরভানতেস-এর 'দন কিহোতে', রবার্ট বার্টন-এর 'দ্য অ্যানটমি অফ মেল্যাংকোলি', মঁতেন-এর প্রবন্ধাবলি, এমনকী জনাথন সুইফ্‌ট-এর 'ব্যাট্‌ল অফ দ্য বুক্‌স'। রগড় করতে বসে সাহিত্যকে তিনি কোন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেটা ওই মহাসময়ের সমুদ্রসৈকত জানে।

১৭৭৬ সালে, অর্থাৎ স্টার্নের মৃত্যুর ন'বছর পর তাঁর 'ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডি'-কে ব্যঙ্গ করে ড. জনসন লিখেছিলেন, 'Nothing odd will do long: Tristram Shandy did not last.' আর ১৯৪৮ সালে লিভিস-এর মনে হয়েছিল, বইটি '...irresponsible and (nasty) trifling.' অন্যদিকে স্টার্ন-এর সমাদর করেছেন গ্যোয়েটে আর শোপেনহাওয়ার। স্টার্ন যেন হেনরি জেম্‌স্ কথিত 'an immense sensibility, a kind of huge spider-web of the finest silken-threads'।

তাঁর হিউমার হয়ে ওঠে এক মধুর পাগলামি। যেমন আঙ্কল টোবি যেন আমাদের বহুদিনের চেনা, মিথ হয়ে ওঠা মানুষ। হাস্যরসের সঙ্গে যুক্ত হয় এক তুলনারহিত করুণরস। সত্যকে নিচু স্বরে গভীর মমতায় প্রকাশ করেন তিনি, যেমন তাঁর বাবা-মা'র সম্পর্ক। বাবা মা'র ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তাঁর কোনও বিজ্ঞানবোধ ছিল না, তিনি কোনো প্রশ্ন করতে জানতেন না! পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, ট্রিস্ট্রামের বাবা তাঁর মা'কে বহুবার সেকথা শেখালেও তিনি তা খালি ভুলে যেতেন।

নামের প্রভাব, যৌনতার ব্যাখ্যা, এমনকী নাকের বর্ণনা, সবই এখানে আছে। নাকের দৈর্ঘ্য ও ভালত্ব নিয়ে স্টার্নের কথা পড়তে গিয়ে বোঝা যায় তিনি ফরাসি চিকিৎসক ধর্মযাজক রাব্‌লে'র লেখা মন দিয়ে পড়েছিলেন। ট্রিস্ট্রাম কথকও বটে, ভাষ্যকারও। তার জীবনের ঘটনাবহুল বৃত্তান্ত যে আছে তাও নয়, বরঞ্চ আছে ফ্রান্স ভ্রমণকালে চারটি হাস্যকর কেলেঙ্কারি! প্রজননের মুহূর্তে তার মা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গিয়েছেন কিনা!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> '—Good G—!' Cried my father, making an exclamation, but taking care to moderate his voice at the same time,—'Did ever woman, since the creation of the world, interrupt a man with such a silly question?'

ডাক্তারের ফরসেপ্‌স্‌-এর আঘাতে জন্মের সময় ট্রিস্ট্রামের নাকটি ভেঙে যায়। বিরাট খাড়া আকর্ষণীয় নাকই জীবনে জয়লাভ করার একমাত্র উপায় বলে মনে করতেন তার পিতা। 'ট্রিস্ট্রাম' নামের পিছনে যেন ফরাসি 'ত্রিস্ত' (বিষণ্ণ) শব্দটি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। বইয়ের চতুর্থ খণ্ডে জন্মালেও শিশু-ট্রিস্ট্রামের হয়রানির শেষ নেই, জানলা দিয়ে প্রস্রাব করতে গিয়ে দুর্ঘটনা-বশত জানলার কাচ পড়ে যাওয়ায় সে তার পুরুষত্ব হারায়!

জীবনের এক চরম সংকটের সময় লেখা এই ব্যতিক্রমী উলট-পুরাণ এমন এক ভালবাসার রাগিনী ফুটিয়ে তোলে, যা এক নতুন বিনির্মাণের শক্তি দেয় পাঠককে।

> L—d! said my mother, what is all this story about? A COCK and a BULL, said Yorick—And one of the best of its kind, I ever heard.

কিমাশ্চর্যম্‌! স্টার্নের মৃত্যুর পর চ্যাপলিনের মতো তাঁরও মৃতদেহ চুরি হয়ে যায়। যেন মৃত্যু নিয়েও এই রসিকতা তিনিই করছেন!

চারপাশে অসংখ্য ধূসর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এক অচিন বালুকাবেলায় আমি ওই জাদু-লণ্ঠনটি আঁকড়ে ধরে বসে থাকি।

২৫ অক্টোবর ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৮

আমি এখনও সেই সমুদ্রসৈকতে শুয়ে।

কয়েকটি কাঁকড়া হাঁটছে অনন্তের দিকে। দূরে বিন্দু-বিন্দু আলো।

'Consciousness does not appear to itself chopped up in bits... It is nothing jointed; it flows...'। উইলিয়াম জেম্‌স-এর লেখা পড়ছে একটি ছোট মেয়ে তার বাবার গ্রীষ্মাবাস ট্যালান্ড হাউসের জানলার ধারে বসে। কর্নওয়ালের সেন্ট ইভের সেই স্মৃতি তাঁকে কৃকলাসের মতো মথিত করবে সারা জীবন। হলুদ পর্দার আড়ালে ঢেউ ভাঙছে; এক দুই... এক দুই।

মাছের মতো সমুদ্রের ভিতর, আরও ভিতর, অন্ধকারের কন্দরে বিরাট-বিরাট উদ্ভিদের সঙ্গে সূর্যঝলকানো জলরাশির সুরসংগতি খুঁজতে খুঁজতে বিষাদ, শীত, দুর্বোধ্যতা পার হয়ে এক অন্বেষণ। বড় হয়ে সে লিখবে জীবনের যদি কোনও ভিত থেকে থাকে, তা হল স্মৃতি।

উষ্ণ বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় সেই মেয়ে শুনছে ছন্দিত এক গতি। 'The purest ecstasy I can conceive.'

ঘুমের পৃথিবীটা একটা চলচ্চিত্রের মতো। একটি তেরো বছরের মেয়ে জানলার পাশে বসে আছে। মুখে কী অসহ্য কষ্ট! ১৮৯৫ সালে মা হঠাৎ চলে গেলেন, দু'-বছর পরে সৎ-বোন স্টেলা। তারপর সে এল, বিষাদ। তার প্রথম স্নায়ুবিপর্যয়। তবু সে পারল তার থেকে বেরিয়ে এসে লন্ডনের কিংস কলেজে প্রাচীন গ্রিক, লাতিন ও ইতিহাস পড়তে। কিন্তু ১৯০৪ সালে তার বাবা সম্পাদক, সমালোচক এবং জীবনীকার স্যর লেসলি স্টিফেন যখন চলে গেলেন হঠাৎ, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। সৎ-ভাইয়েরা জর্জ আর জেরাল্ড তার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল একাধিকবার। মানসিক হাসপাতালে যেতে হল তাকে।

সে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ (১৮৮২-১৯৪১)। যে একদিন লিখবে কাহিনি-কথনের প্রতি-ইতিহাস, 'counter-history'।

দু' দশক জুড়ে অন্ধকার (১৮৯৫-১৯১৫)। যা কখনো সীমাহীন নিশ্ছিদ্র। পিতার ছবিকে অতিক্রম করে যাওয়ার পথ খুঁজছেন হাতড়ে-হাতড়ে। তাঁকে মন্দ্রিত করছে নানারকমের উন্মাদ কণ্ঠস্বর।

ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, প্রকাশক ও সমালোচক, বিশ শতকে ইংরেজি হাই মর্ডানিজম-এর এই পুরোধা বারবার বলেছেন, তিনি নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন। বোন ভ্যানেসা স্টিফেন জানিয়েছেন, কথাটা ভুল নয়। মা'র মৃত্যুর পর দু'বছর তাঁর চারতলার ঘরে তাঁকে পড়াতেন তাঁর বাবা। হলুদ কাঠের উঁচু ছাদ, লাল চামড়ায় বাঁধানো ইংরেজি আর ফরাসি ক্লাসিক্‌স... ওয়েভারলি, জেন অস্টেন, হথর্ন... আরও কত... চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট খণ্ড। একটি রকিং চেয়ার, যার ওপর এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে বাবা পড়ছেন। তিনটি বিরাট জানলা। বাবার গ্রন্থোষ্ণ ঘরটিতে নিঃশব্দ ভার্জিনিয়া যে চিন্তার স্রোতে ডুবে যেতেন আর লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতেন, একটি ছাড়া বাবাকে তার কিছুই দেখাননি তিনি। দেখাননি 'মেয়েদের ইতিহাস', কিন্তু মাথায় ভিড় করে আসত 'সমস্ত প্রশ্ন, হিংস্র, ক্ষিপ্র, অসমঞ্জস'। বাবার পাইপের ধোঁয়ার আড়ালে অভ্যাগতদের সঙ্গে (হেনরি জেম্‌স বা জেম্‌স রাসেল লোয়েল) কথোপকথন মনে জমিয়ে রাখতেন তিনি। কান তৈরি হচ্ছে ভার্জিনিয়া স্টিফেন-এর, বুঝতে পারছেন লিখনের মূল কথা হল 'getting the rhythm', ছন্দটিকে ধরা। 'Could I get my to-morrow morning's rhythm right—take the skip of my sentence at the right moment—I should reel it off... it's not style exactly—the right words—it's a way of levitating the thought out of one—'।

ভার্জিনিয়া বুঝেছিলেন, সবই তো স্নায়ু থেকে উঠে আসা অণুর বিন্যাস। ছায়ার মিছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিকতার এই পুরোধা ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেয়েছেন এক নতুন উপায়ে। এ এক নতুন 'স্পেস', যার কেন্দ্রে যুদ্ধ নেই, আছে এক শূন্য সময়—যেখানে সবাই রয়েছে—শিল্পী, গৃহবধূ থেকে ছায়া-আলোর রূপরেখা ও মৃতরা। আছে হেমন্তের গাছ, 'ছেঁড়া পতাকার মতো' আছে দিগন্তে সমুদ্র-লাল রঙের বিস্ফোরণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাসক-জাতের ভাষাজাল ছিঁড়ে ফেলছেন ভার্জিনিয়া। 'শাসক-জাত' যে পুরুষ সেকথা তিনি নানাভাবে বলেছেন তাঁর 'নিজস্ব এক ঘর' অথবা 'তিন গিনি'-তে। 'দ্য ওয়েভ্‌স্‌' উপন্যাসের একটি নোটে লিখেছেন: 'দৃষ্টি পালটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটিও পালটে যায়।'

১৯১২ সালে লেনার্ড উল্‌ফ্‌-কে বিয়ে করার তিন বছর পর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'দ্য ভয়েজ আউট' থেকেই পালটানোর শুরু। কিন্তু বিশেষ করে তাঁর চারটি আশ্চর্য রচনা 'মিসেস ড্যালওয়ে' (১৯২৫), 'টু দ্য লাইটহাউস' (১৯২৭), 'অরল্যান্ডো' (১৯২৮) এবং 'দ্য ওয়েভ্‌স্‌' (১৯৩১)-এর চরিত্রেরা প্রতিটি চলমান মুহূর্ত সম্পর্কে অস্বাভাবিকভাবে সচেতন। যে-সচেতনতা তাদের জটিলতা দেয়, শুধু চরিত্রটির অনুভূতিমালার জন্য নয়, বাস্তব পৃথিবী সম্পর্কে এক অর্ধজাগ্রত সূক্ষ্ম শারীরিক উপলব্ধি দিয়ে। প্রিয় ফরাসি কথাশিল্পী মার্সেল প্রুস্ত যা করেছেন 'হারিয়ে যাওয়া সময়ের সন্ধানে'-র খণ্ডের পর খণ্ডে, ভার্জিনিয়া অপরূপ সূক্ষ্মতায় তা করতে চেয়েছেন ছোট চালচিত্রে এক মিনিয়েচারের মতো করে।

ভার্জিনিয়া যেন এক অসম্ভব 'emerald sleeping passions'-কে ছুঁতে চাইছেন অসম্ভব, এ অসম্ভব। ভিটা নাম্নী নারীর সঙ্গে তাঁর নৈকট্য শারীরিকভাবে করে তোলে ভিটার ভাষায়, 'a very different thing, a mental thing, a spiritual thing, if you like, an intellectual thing.'

যে কোনও সময়ই তুমি জেগে ওঠো, ভার্জিনিয়া তাঁর একটি ছোটগল্পে লিখেছেন, তুমি শুনতে পাবে কোথাও-না-কোথাও একটি দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ!

'টু দ্য লাইটহাউস'-কে ১৯৯৮ সালে চিহ্নিত করা হয়েছে গত শতাব্দীর একশোটি শ্রেষ্ঠ ইংরেজি উপন্যাসের একটি হিসেবে। একশোটি? দশটি নয়, বা পাঁচ? তিনটি পর্ব এই উপন্যাসের: ১. জানলা, ২. সময় বয়ে যায়, ৩. লাইটহাউস। র‍্যামসেদের আইল অফ স্কাইপের গ্রীষ্মাবাসে শ্রীমতী র‍্যামসে লাইটহাউসটি দেখতে যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু আবহাওয়া যে ভাল নয়! চরিত্রের এক জটিল সমাহার: র‍্যামসে'দের আট ছেলেমেয়ে, অতিথি ও বন্ধুরা। লিলি ব্রিসকো নামে এক তরুণী শিল্পী, যে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগে। শেষে একটি ডিনার পার্টি। একজন সমুদ্রের হারিয়ে ফেলেছে তার দিদিমার গয়না। দ্বিতীয় পর্বে সময় বয়ে যায়। মিসেস র‍্যামসে'র মৃত্যু। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে তাঁদের মায়ের মিল দেখে শিহরিত হয়েছেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বোন ভ্যানেসা। শেষ পর্বে র‍্যামসে পরিবারের যাঁরা বেঁচে আছেন, এবং অন্যান্যরা দশ বছর পর ফিরে আসেন। এবার যে তাঁদের পৌঁছতেই হবে লাইটহাউসে। ইতিমধ্যে লিলি বলে আত্মবিশ্বাসহীন মেয়েটি তার ছবিটি শেষ করে!

আজ মানবীবিদ্যা-চর্চার যুগে ভার্জিনিয়ার যে-বইটি বিশ্বজুড়ে আলোচিত, সেটি 'অরল্যান্ডো', যেখানে একটি পুরুষের লিঙ্গ বদলে যায়, সে পুরুষ থেকে নারী হয়, অতিক্রম করে কয়েক শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস! কবিতা আর গদ্যের পার্থক্য ঘুচে গিয়েছে বারবার ব্লুমস্‌বেরি গ্রুপের অন্যতম মধ্যমণি ভার্জিনিয়ার লেখায়, বিশেষ করে 'ঢেউ'—'দ্য ওয়েভ্‌স' উপন্যাসে। ছ'টি অন্তর্গত স্বগতোক্তি, সপ্তম চরিত্রে পারসিভালের কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই না। এরই ফাঁকে ন'টি ছোট-ছোট তৃতীয় পুরুষের কথন, সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমুদ্রতীরের বর্ণনা। কণ্ঠস্বর আর সমুদ্র-ঢেউ। সেইসব কুয়াশা-কণ্ঠস্বরের কেন্দ্রে কি এক নিঃশব্দ চেতনা? আমি ঘুমের মধ্যে দেখছি, নিচু হয়ে একমনে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের 'দ্য ওয়েভ্‌স্' অনুবাদ করছেন ফরাসি উপন্যাসের এক বিস্ময়-নারী মার্গরিৎ য়্যুরসনার।

কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর ককার স্প্যানিয়েল কুকুরটিকে নিয়ে, তাঁর দৃষ্টিতে, ১৯৩৩ সালে যুগান্তকারী উপন্যাস 'ফ্লাশ'-এর শেষে, কুকুরটির মৃত্যুর পর, ভার্জিনিয়া লেখেন: 'কুকুরটি বেঁচেছিল। এখন মৃত। ব্যস্।' কুকুরটির আত্মজীবনী হয়ে উঠেছে সমকালীন ইতিহাস।

১৯১৭ সালে স্বামী লেনার্ড-এর সঙ্গে হগার্থ প্রেস করলেন যখন, তখনও স্বভাবসুলভ স্বাতন্ত্র্যই ছিল ভার্জিনিয়ার মূলমন্ত্র। ব্লুমসবেরি গ্রুপের স্বাধীন পরিমণ্ডলে তাঁদের পক্ষে টি এস এলিয়টের লেখা আধুনিক সভ্যতার মহাকাব্য 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' (১৯২২) প্রকাশ করা যেন অনিবার্য ছিল।

১৯১২ সালে বিয়ের পর থেকে লেনার্ড ভয় পেতেন ভার্জিনিয়া আবার না অবসাদে ভেঙে চুরমার হয়ে যান। তাই আশ্চর্য হতে হয় যে লেনার্ডই ১৯৪০ সালে এক নাৎসি-আক্রান্ত ইওরোপে যৌথ আত্মহত্যার প্রস্তাব দেন। 'There is no point in waiting. We would shut the garage door and commit suicide.' তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁরা দম বন্ধ হয়ে মরবেন। তারপর জুন মাসে ভার্জিনিয়ার ভাই অ্যাড্রিয়ানের মাধ্যমে 'Protective poison' (মারাত্মক ডোজের মরফিয়া) জোগাড় করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভার্জিনিয়া এই আত্মহত্যার চুক্তির সম্পর্কে লিখেছিলেন: 'একটি গ্যারেজের ভিতর আমার পরিসমাপ্তি আমি চাই না।' তাঁর মতে, লেনার্ড-এর মৃত্যু-পরিকল্পনা 'খুব সাধারণ এক মৃত্যু—এমন মৃত্যু নয় যা ফায়ার-প্লেসের পাশে আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়ার মতো।' আশ্চর্য, লেনার্ড ভার্জিনিয়াকে মৃত্যুর প্রস্তাব দিচ্ছেন, আর ভার্জিনিয়া বলছেন, না। তিনি যে একটি বই লেখায় ব্যস্ত ('বিটউইন দ্য অ্যাক্টস')। আরও দশ বছর বাঁচতে চান!

বোবো মেয়র নামে এক বন্ধুকে বলেছিলেন ভার্জিনিয়া, জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত হল নিজের বাগানে হাঁটা, কখনও কয়েকটি মৃত ফুল কুড়িয়ে নেওয়া।

জীবনের ঢেউ মিশে যায় জলস্রোতের সঙ্গে।

What is this terror? What is this ecstasy? (মিসেস ড্যালওয়ে)

২৮ মার্চ ১৯৪১। ওভারকোটের পকেটে ভারি-ভারি পাথর ভরে নিঃশব্দে ডুবে গেলেন তিনি বাড়ির কাছে আউজ নদীতে।

জল ঢুকে পড়ছে তাঁর স্নায়ুকোটরে।

আর আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক দূরে একটা ঝাপসা সাদা-কালো ফোটো। পর্দার আড়াল থেকে বালিকা ভার্জিনিয়া দেখছে, ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তার জানলার নীচে, এক দুই, এক দুই...

৮ নভেম্বর ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৯

অন্ধকার এক করিডর দিয়ে হাঁটছি। সামনে একটি ঘর, সামনে না বহু দূরে? অলীক এক টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে, টেবিলে পা তুলে কাজ করছেন সত্যজিৎ রায়। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। পাশে ট্রানজিস্টারে কি কোনও সুর বাজছিল? আলমারিতে তাঁর সামনে অসংখ্য বই। আধো-অন্ধকারে তারা রাজহাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে সেই বিস্ময়কর ছবি দেখছে।

দেবাশীষ দেব ফিসফিস করে বললেন— যান, দেখুন।

আমি এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছি, তিনি স্কেচ করছেন। এত গভীর মনঃসংযোগ মানুষের হয়?

তারপর সেই স্কেচের নারী জাদুদণ্ডে জীবন্ত হয়ে উঠছে। আলোছায়ায় হুবহু সেই মুখ। আমি বলে উঠছি, 'দেবী!' দয়াময়ীর বড়-বড় চোখ দু'টি আমার ওপর এসে স্থির হল। একটি চোখ অন্ধকারে, অন্যটি আলোয়। এ কম্পোজিশন তো অবিস্মরণীয়!

কিন্তু সত্যজিৎ আমাকে দেখতে পাননি। মগ্নতা এখন ভাস্কর্য।

তিনি আঁকছেন 'দেবী'-র পোস্টার। যেটি জাদুবলে হয়ে উঠছে দেবীমূর্তির পিছনের চালচিত্র! 'ব'-এর '্ী'-র বাঁকানো অংশটিকে আরও বেঁকিয়ে-চুরিয়ে অলংকত করে তুলছেন। দীর্ঘ 'ঈ'-র শুঁড়টি হয়ে উঠছে ঠাকুর-দালানের মাথার ওপরকার খিলান। 'দেবী'-র জমিদারবাড়ি আর তাদের আরাধ্য মাতৃভূমির ছবি একবিন্দু অশ্রুর মতো ওই লোগোতে ভরে দিচ্ছেন। লেখার বাইরের অংশের ছুঁচলো অবয়ব থেকে একটি আলোর উদ্ভাস নিঃসৃত হচ্ছে, যা ডাকের সাজের মতো ঝলমলে। একটি নামাঙ্কনকে সত্যজিৎ করে তুলছেন একটি ছবি অন্তর্মানচিত্র।

কাট্।

দয়াময়ীর চোখ [illegible] মুখ তুলে বলছে, 'আমি যদি দেবী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হই! আমি যদি দেবী হই!' সে দৌড়ে চলে যাচ্ছে মৃত্যুহিম এক অন্ধকারে!

আমরা সময়ের ঢেউয়ে পিছিয়ে গিয়েছি কখন। ১৯৫৫ সালের ২১ অগাস্ট, 'পথের পাঁচালী' মুক্তিলাভের পাঁচ দিন আগে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় বিজ্ঞাপনের নীচে অপু-দুর্গার হাত ধরে দৌড়নোর ক্ষুদ্র সিল্যুয়েট। দেবাশীষ বললেন, 'ওপরের বিজ্ঞাপনের কথাগুলি যেন বিশাল খোলা আকাশ যেখানে শব্দগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে।' ২৪ অগাস্টের একফালি বিজ্ঞাপনে অপুর একটি উন্মুখ চোখ। তার মুখটিকে ইচ্ছে করেই বড় করে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে তার মুখের অংশ বিশেষটুকু শুধু দেখা যায় আর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মূলত তার চোখের ওপর।

রবিশংকরের সেতারের সেই অবিস্মরণীয় অশ্রুমুখর আর্তি শুনে বুঝেছি 'পথের পাঁচালী' শুরু হয়েছে। ঘুমন্ত অপুর চাদরের ছেঁড়া ফোকরে আঙুল দিয়ে তার চোখ খুলে দিচ্ছে দুর্গা। হঠাৎ খুলে গিয়ে বাইরে তাকানো চোখটিই ছবির মূল প্রতিমা, লিখেছেন রবিন উড। 'পথের পাঁচালী'-র অপু 'চরিত্র' হিসেবে যতটা স্পষ্ট তার চেয়েও স্পষ্ট একটি ক্রমবিকাশমান চৈতন্য হিসেবে।' তাই 'পথের পাঁচালী'-র মুক্তির আগে বিজ্ঞাপনে শুধু একটি চোখ, নীচে লেখা: শুক্রবার 'পথের পাঁচালী'। আর কিছু নেই, সত্যজিৎ রায়ের নামও না! পূর্ণেন্দু পত্রীর ভাষায়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের মলিন মানচিত্র বদলে গেল সর্বতোভাবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখছি, সত্যজিৎ রায় ছবির সম্পাদনার কাজ শেষ করে এখন একটি মোটা-নিব কলম দিয়ে পোস্টারের জন্য একটি শিরোনাম আঁকতে বসেছেন। দেবাশীষ আমার কানে কানে বলছেন, দেখছেন ১৯৫৬ সালের 'অপরাজিত' আর ১৯৬৬ সালের 'নায়ক'— দুটি ছবির নামাঙ্কনের মিল? দু'টি শব্দের শুরুতে 'অ' আর 'না', যা নঞর্থক কারণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নামের শুরুতেই দুটি আদ্যক্ষরকে বাকি অক্ষর থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। ছবিতে অপু ও অরিন্দম ভিন্ন-ভিন্ন স্থানাঙ্কে যে-জটিল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে যেতে চায়, তার আভাস ওই দু'টি সুচিন্তিত অক্ষররেখায় আঁকা। সেখানে মূর্ত এক কষ্টার্জিত আত্মবিশ্বাস। 'নায়ক'-এর নামাঙ্কনে 'না'-এর অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত শুঁড়ের সঙ্গে 'য়'-কে চওড়া আর শেষের 'ক'-কে চেপে সরু করে, তাতে এক সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা এনেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্যজিৎ রায়। 'না' শব্দটি যেন একটানে লেখা, কোনও তারকার অটোগ্রাফের মতো। ছবিতে 'সই'-এর প্রশ্ন এসেছে তিনবার। 'প্রথম শো-র পর কত সই দিতে হয়েছিল জানেন?' সত্যজিৎ রায়ের শেষ মাস্টারস্ট্রোকটি হল 'য়'-র নীচে ফুটকিটি, যা এখন তারা হয়ে গিয়েছে। চিত্রতারকার প্রতীক-চিহ্নের মতো!

ওঁর পাশে এককাপ চা। কখন জুড়িয়ে গিয়েছে দৃকপাত করেননি।

আমার সামনে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে দার্জিলিং-এর অবজারভেটারি হিল রোড নর্থ, মনীষা আর অশোক হাঁটছে। কুয়াশা সরতে আরম্ভ করছে।

অশোক: আপনার বাবাকে বোধহয় কেউ অমান্য করে না—তাই না?

মনীষা: আপনি করেছেন বুঝি?

অশোক: ঠিক তা নয়, তবে উনি আমাকে প্রায় একটি চাকরি দিয়েই ফেলেছিলেন— আমি বললাম আমার চাকরির দরকার নেই।

মনীষা: সে আপনার যা খুশি তাই বলবেন আপনি।

অশোক: এগ্‌জ্যাক্টলি—ঠিক বলেছেন! আমার খুশি—তাই নিইনি। অবিশ্যি এখন আবার একটু আফসোসই হচ্ছে। আবার সেই অ্যাপ্লিকেশন, সেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, সেই ধার করা প্যান্ট পরে ইন্টারভিউ... আমার এই প্যান্টটাও নিজের না, জানেন?

মনীষা মৃদু হাসে।

অশোক: চাকরিটা বোধহয় নেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু... হঠাৎ কী যে হয়ে গেল। এই জায়গা বলেই বোধহয়, জানেন। এরকম দৃশ্য তো এর আগে দেখিনি কখনও। এই বিরাট হিমালয়... এই থমথমে ঝাউ গাছ... এই রোদ, এই মেঘ, এই কুয়াশা... কেমন যেন অবাস্তব, স্বপ্নরাজ্যের মতো। মাথাটাথা সব কীরকম গোলমাল হয়ে গেল। আমি যেন আর আমি নই। একটা কেউকেটা... একটা hero... একটা Giant!

আমি এবার শিল্পের সমস্ত রং ও সুর, আধুনিকতার সমস্ত অভিজ্ঞান সম্পূর্ণ এককভাবে স্বতন্ত্র যে-মহাশিল্পীর স্নায়ু ও মস্তিষ্কে এসে জমা হয়েছে, তাঁর দিকে তাকাই। ১৯৬২ সাল। তিনি এখন তৈরি করছেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লোগো। কাঞ্চনজঙ্ঘা কথাটিকে এমনভাবে লিখছেন যাতে সেটি একটি পাহাড়ের ত্রিকোণ-বিন্যাস বলে মনে হয়। দেবাশীষ ফিসফিস করে বললেন, দেখুন, উনি ওখানে পাঁচটি টাইপকে ডিসটার্ব করে, 'কাঞ্চন' আর 'জঙ্ঘা' দুটি অংশকে সমান স্পেসে ভাগ করে 'ন' আর 'জ' বর্ণকে পাহাড়ের মতো উঁচু করে তুলে ধরেছেন। যেন ছবির শেষ দৃশ্যে দেখানো কাঞ্চনজঙ্ঘার রেঞ্জ! পড়ন্ত বিকেলের হলুদ আলো বরফের ওপর ঠিকরে পড়ছে। পোস্টারের পুরো পশ্চাৎপটটিকে গাঢ় নীল রঙে এঁকে ছবির মতোই 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' শব্দটির বাঁদিকে 'কাঞ্চন' কথাটিতে হলুদ রং দিয়েছেন সূর্যের আলো পড়েছে বোঝানোর জন্য, আর 'জঙ্ঘা' শব্দটিকে রেখেছেন সাদায়, অর্থাৎ যেদিকটায় বরফের ওপর সরাসরি কোনও আলো পড়েনি। একই সঙ্গে নীচের দু'-সারির লেখার মধ্যে (ছোট দুটি পাহাড়ের রেঞ্জ) বাঁদিকটিতে সেই হলুদ রং পড়েছে আর ডান দিকেরটা রয়েছে সাদাতেই, সেই একই আলোর সোর্স অনুযায়ী। এইরকম ছবিবিহীন ভিস্যুয়ালে শুধুমাত্র টাইপ ডিজাইনের মধ্যে দিয়ে একটি গোটা বক্তব্যকে এতখানি স্পষ্ট করে তোলা বোধহয় একমাত্র সত্যজিতের পক্ষেই সম্ভব। আর বাংলা হরফের তির্যক ভঙ্গির মায়া। দু'-ধরনের টাইপফেসের গবেষণার ফল! সন্তর্পণে ছবির ক্রেডিট টাইটেলে ভরে দিয়েছিলেন আঞ্চলিক নানা রূপরস!

দেবাশীষ তাঁর 'রং তুলির সত্যজিৎ' হাতে নিয়ে আমাকে ইশারা করছেন, ওদিকে দেখুন। দেখি জানলার ওপারে কলকাতার স্কাইলাইন। ভাল করে দেখুন! বিস্মিত হয়ে দেখছি সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ছবির বিজ্ঞাপনের অক্ষর-বিন্যাসে কী করে যেন শহরের স্কাইলাইন তৈরি করেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রর 'অবতরণিকা' গল্পের নাম পালটে কলকাতার রেফারেন্স স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তিনি। প্রতিটি টাইপের মধ্যে একটি চৌখুপি প্যাটার্ন আনার চেষ্টা করেছেন এবং এর জন্য সমস্ত ভার্টিকাল ও হরাইজেন্টাল লাইনগুলোকে জুড়েছেন নব্বই ডিগ্রি কোণে। এমনকী 'হ' টাইপটির বাঁকা নীচের অংশটিকে হরাইজেন্টাল করে শব্দটির মাঝখানে নীচের দিকে একটি বেসলাইন মতো করেছেন। টাইপগুলো ইচ্ছে করেই পরপর একটি ছোট, একটি লম্বা করেছেন, যাতে গোটা লেটারিং-এর অভিব্যক্তিতে একটি শহরের সারিবদ্ধ উঁচু-নিচু বাড়ির স্কাইলাইন তৈরি হয়।

স্বপ্নের ভিতরে এত কানাগলি! আমি মহানগরেরই একটি বাড়িতে ঢুকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়ে দেখি একটি মারমুখী যুবক কাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করছে। আমি বিড়বিড় করে বলি, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'! বোনের 'বস' মি. সান্যালের অ্যাঙ্গুলার মিড-শট। তাঁর গুলিবিদ্ধ বুক থেকে রক্ত চুঁয়ে পড়ে। ক্লোজ-শট সিদ্ধার্থর, সে আবার গুলি করে। গুলিবর্ষণের মুখে মি. সান্যাল। একটি সিলিং ফ্যানের ক্লোজ শট। পাখাটি চলতে শুরু করে। মি. সান্যাল: 'দাঁড়িয়ে কেন! বোসো!'

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র পোস্টার।

লো-অ্যাঙ্গেলে সিদ্ধার্থর গুলি-চালানোর শটটি ক্যারিকেচারের ভঙ্গিতে ফিরিয়ে এনেছেন সত্যজিৎ। হাতে প্রাচীন যুগের লম্বা নলওয়ালা বিরাট রিভলবার। দেবাশীষ নিচু গলায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যুবকের হাতে মান্ধাতার আমলের আগ্নেয়াস্ত্র হয়ে উঠছে গোটা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফ্যান্টাসি। আমি দেখছি, সত্যজিতের আঁকা এই ছবিতে সিদ্ধার্থর সামনের পা'টি দীর্ঘ হয়ে পোস্টারের পরিধি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এরকম তো আরেকবারও হয়েছিল! পরের ছবিতেই। মনে আছে? ঘুমের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমি বলি, ওই দেখুন 'সীমাবদ্ধ' ছবির পোস্টার। নীচে মাথা চেপে ধরে ছবির শেষ শটের বিপন্ন, বিদীর্ণ শ্যামলেন্দু! ওপরে লেখা: 'সীমাবদ্ধ'। 'দীর্ঘ-ঈ'-র শুঁড়টি পোস্টারের বাইরে চলে গিয়েছে। মূল ছবিতে সত্যজিৎ রায় সিলিং ফ্যান-সহ শ্যামলেন্দুকে দেখিয়ে পরিবর্তমান পৃথিবীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার যে-সীমাবদ্ধতার দিকে আঙুল তুলেছিলেন, পোস্টারে কি আনলেন এক ব্যাপকতর মানবিক সত্যের ছবি, যা তাঁর চলচ্চিত্রের অন্তস্তলে মর্মরিত হয়েছে? ওই হারিয়ে যাওয়া অক্ষরের মাঝে কি মিলছে অসীমের আভাস? যা তাঁর সব ছবির স্নায়ুতে মন্দ্রিত হয়, কেবলই মন্দ্রিত হয়!

সত্যজিৎ আধো-অন্ধকারে মাথায় হাত দিয়ে বসে। এমন দৃশ্য দেখেছি তো আমি! এ-ছবিটি কি মারি সিটনের 'পোর্ট্রেট অফ এ ডিরেক্টর'-এর প্রথম ডেনিস ডবসন সংস্করণের প্রচ্ছদ?

সামনে এক অপরূপ রূপকথার দৃশ্য!

বাঘা: কী নাম তোমার?

গুপী: আমার নাম?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাঘা: তোমার না তো কার?

গুপী: আমার নাম শ্রী গোপীনাথ গাইন।

বাঘা: নিবাস?

গুপী: আমলকি। তোমার?

বাঘা: হরতুকি।

গুপী: তা, তুমি এখানে যে?

বাঘা: তাড়ায়ে দেছে! গাধার পিঠে তুইলে 'দূর হ' করে দেছে!

গুপী: রাজামশাই?

বাঘা: তুমি জানলে কী কইরা?

গুপী: আমারেও যে—

শুধু রূপকথার চরিত্র নিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পর্দায় সম্ভবত শ্রেষ্ঠ বুননটিতে নয়, শুধু অভিনব সুরের জাদুময়তায় নয়, সাজসজ্জায় নয়, তাঁর সমস্ত অভিনিবেশ তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন ছবি-আঁকার কলম আর তুলিতেও। দেবাশীষ দেব আমায় বলছেন, ওঁর গোটা চলচ্চিত্র-জীবনে যদি বিশেষ একটি ছবিকে বাছতে হয় তাঁর শিল্প-সংক্রান্ত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা আর প্রয়োগ-কৌশলের দিক থেকে বিচার করে, তো সেটা বোধহয় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন।'

টাইটেল-কার্ডে রূপের এ এক আশ্চর্য আবাহন! ইলাসট্রেশনে সিদ্ধহস্ত সত্যজিৎ অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে আঁকছেন পুরো ছবিটির কাহিনি। ছবি শুরুর আগেই সম্পূর্ণ গল্পটি বলা হল। হাঁড়িমুখো আমলকির রাজা, গাধার পিঠে গুপী, হাল্লার মন্ত্রী,জাদুকর, তিন আঙুল তুলে ভূতের রাজা...

শুধু চলচ্চিত্রের ভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দ আর ত্রিমাত্রিকতা নয়, ছবির ভাস্কর্যের গায়ে তাঁর রং-তুলির অভিজ্ঞান ছুঁতে না-পারলে কি কোনওদিন সম্পূর্ণ করে বোঝা যাবে তাঁকে?

ঋণ: রং তুলির সত্যজিৎ
দেবাশীষ দেব।

২২ নভেম্বর ২০১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬০

ভাঙা-ঘরে, মস্ত একটা হাওয়ায়
মানুষ কাঁপছে,
একটা হাত পাশের মানুষীকে
ধরে আছে, আরেকটা হাত
কোথায় রাখবে—বুঝতে পারছে না,
পায়রা এসে বসেছে নিমগাছে।

সামনে শুধু রুদ্র এক পাহাড়
সামনে এক প্রচণ্ড ঝামরানো
সমুদ্রের ক্লান্ত অন্ধকার।

আড়াল করে দেখে নেবার মতো
কোথাও আর গোপন দৃশ্য নেই;

মস্ত একটা হাওয়ায়, ভাঙা-ঘরে
মানুষ কাঁপছে।

(মানুষ, ১৯৬১)

পাঁচ শতক পর আজ মাঝরাতে কবিতাটি শীত ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে, সময়-বর্ষার ফলা বুকে নিয়ে আমার ঘরের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। 'Caught in the form of limitation/Between un-being and being'. ('Burnt Norton', T. S. Eliot)

প্রণবেন্দু (১৯৩৭-২০০৭) বললেন, এসেছ? এলিয়ট আর বেনদার লেখাটা নিয়ে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি যে-রাস্তাতেই যাই, দেখি উনি হেঁটে চলেছেন। এত ধীর তাঁর হাঁটা, এত নিজস্ব তাঁর অভিমুখ, আমি তাঁকে অতিক্রম করতে পারিনি। যাদবপুরের নর্থ রোড থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল রোড পেরিয়ে এক স্বপ্নের রিকশায় তিনি চলে যাচ্ছেন কোথায়? যেন তিনি স্পর্শ করছেন নিজের জীবন একা-একা, 'যেভাবে স্পর্শ করে পুরুষ নারীকে'।

যে-গলিতেই যাই, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

কখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের করিডরে। কখনও 'সুদূরান্ত মেঘের দুয়ারে'। মগ্নতা তাঁর ধমনী বেয়ে উঠে এসে কবিতার অক্ষর হয়ে যায়। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ে অক্ষরের জানুতে, এত সূক্ষ্ম যে প্রায় কেউই দেখতে পায় না, শুধু তিনি আর কবিতার ঈশ্বর ছাড়া।

এইভাবে হবে, এইভাবে—
একদিন শাশ্বত ইঁদুর এসে সমস্ত জ্যোৎস্না কুরে খাবে।
ততদিন, এসো, বেঁচে থাকি...

চকিতে বিদ্যুতের মতো কি তাঁর পাশে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অঞ্জলিতে নক্ষত্রবারুদ নিয়ে প্রণবেন্দুকে দিচ্ছেন? প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের চোখে মৃদু আলো, হেমন্তের অরণ্যে তিনি পোস্টম্যান।

একটি প্রেমের কবিতা

দেখা হল, কিন্তু যেন জলের ভেতরে
দেখা হল; তুমি স্থির ভাসলে অকূলে;
আমি স্পর্শপ্রিয়, তাই আস্তে ধরে... ধরে... ধরে
বুঝতে চাইলাম প্রেম ওষ্ঠে, স্তনে, ব্যগ্র বাহুমূলে।

তবু কি স্পষ্ট কিছু দেখা গেল! কখনও এভাবে
তোমাকে আলাদা করে দেখা যায়? শুধু 'চলো, চলো'
শব্দ হল; বিদ্যুৎবাহিনী জল ছড়াল স্বভাবে;
শুধু জোনাকির ফুল ফুটে ঝরে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধদেব বসুর কনিষ্ঠা কন্যা দময়ন্তী (রুমি) তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন বাবার কাছে, যাতে ওই লাজুক তরুণের কবিতা 'কবিতা' পত্রিকায় ছাপা হয়!

প্রণবেন্দুকে দেখতে পাচ্ছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ক্লাসে ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮, স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর মুখোমুখি। পাশে নবনীতা, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব এঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন রুপোর চাবি, পৃথিবীর সাহিত্যের দরজা যা দিয়ে খোলা যাবে। ১৯৫৭ সালে বেরলো প্রণবেন্দুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এক ঋতু'।

দেখতে পাচ্ছি দুই সহপাঠী নবনীতা আর প্রণবেন্দু বম্বে পর্যন্ত চলেছেন একই ট্রেনে। সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁদের বাবা নরেন দেব আর নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত। এবং পরে একই জাহাজে পাশ্চাত্যে পাড়ি দিচ্ছেন। লন্ডন হয়ে মার্কিন মুলুকে। তাঁকে দেখছি, যেন জলের ভিতরে, এম এ পড়ছেন আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিএইচডি করছেন মিনেসোটা-য়। গবেষণার বিষয় কবি ই.ই.কামিংস। একটি কালো-সাদা ছবিতে, শিকাগোয়, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে।

এক মেধাবিনী শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে তিনি। যাঁর নাম মেরি-অ্যান। পাশে নরেশ গুহ। প্রণবেন্দুকে নিয়ে চিন্তা করছেন বুদ্ধদেব বসু কনিষ্ঠা কন্যা রুমিকে লেখা চিঠিতে, ২১ অক্টোবর ১৯৬২। ১৯৬৩ সালে মেরি-অ্যান হয়ে উঠছেন মেরি-অ্যান দাশগুপ্ত।

এতদিন পর আমি ঘুমের ভিতর ক্রমশ ভুলে যাওয়া এক কবির কবিতা আওড়ে চলেছি 'সদর স্ট্রীটের বারান্দা' থেকে:

মরিয়ম

ঘুমন্ত ঘণ্টা, মরিয়ম,
তোমার দেহ ছিল।
টানাপোড়েন সুজনি-মশারিতে
নকশা কি উড়ছিল।

বরফ ছিল বাইরে, মরিয়ম,
তুমি আমার ছিলে—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাত কাটাতে এল আমার দেহ,
হৃদয় কেন এল।

কাঁদল কে! শব্দ, মরিয়ম,
আমার ভয় করে;
ঝরল রঙ, আহা, তোমার রঙ
হৃদয় কেন এল।

ধ্বনির এমন মধুর শুদ্ধতা এটিকে আধুনিক বাংলায় অন্যতম সেরা প্রেমের কবিতা করে তুলেছে। জানতেন কি তিনি?

১৯৬৬ সালের শুরুতে কলকাতায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে।

কলকাতার জন্য চার লাইন

কলকাতা, স্নায়ুর ঈশ্বর,
ভেঙে দিতে চাও কেন সমস্ত আমাকে?
আমার রয়েছে কিন্তু ঘোড়া, আর অনন্ত প্রবাস,
যাই আমি আমার শহরে।

মোটা ফ্রেমের চশমা। তিনি কবিতা নির্বাচন করছেন 'অলিন্দ'-র জন্য। প্রচ্ছদ মেরি-অ্যানের। ২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে বুদ্ধদেব তাঁর এক প্রিয় ছাত্রের দিকে তাকিয়ে। সে-চোখে গভীর প্রত্যয় ছিল। 'অলিন্দ'-র জন্য বন্ধু সুনীলের 'প্রতিধ্বনি, তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে/কেন ফিরে এলে/এই আমূল নশ্বর, শূন্যমাঘ, শরীরের কাছে'-র পৃষ্ঠাটি নিয়ে বসে। সেখানেই বেরিয়েছিল শঙ্খ ঘোষের 'নিহিত পাতালছায়া'-র অনেক কবিতা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কথায় জীবনে একবারই কবিতার একটি শব্দ বর্জন করেছিলেন তিনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমাকে আমি

তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম
জীবন নয় নদীর কোনও নাম
জীবন নয় পাহাড় থেকে এসে
দুঃখ পাওয়া আঘাতে-আশ্লেষে,
জীবন মানে আরও—

কয়েকটি পিঁপড়ে সারি দিয়ে হাঁটছে ওর সামনের দেয়ালে। সেদিকে নিবদ্ধ তাঁর চোখ। না কি তিনি তাঁর প্রিয় খরগোশদের একটির চোখের মণি অতলের দিকে তাকিয়ে?

শুধু মুখ নড়ে ওঠে,
কোন্ ভাষা খেয়াল তাকে না।

আমার কলেজের শিক্ষক-কক্ষে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করে কখন কোথা চলে গেলেন তিনি। কেউ তাঁকে খোঁজেনি। লোভী পাঠকের লালা গড়িয়ে পড়েনি তাঁর পায়ে। যেতে যেতে কোনও তেলরঙের ছবি কি তাঁর মাথায় ঘুরছিল, যে-ছবির প্রদর্শনীতে তিনি দাঁড়িয়ে থেকেছেন একা।

তোমরা বলে দাও

এখন আর তেমন অন্ধকার নেই
আকাশে একটু একটু তারা ফুটে উঠছে—
বাদামি রঙের ঘোড়া নিমগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে;
আমাকে এখন কোথায় যেতে হবে

তোমরা বলে দাও। আমি এখন প্রস্তুত, একাগ্র
অনেকদিন ধরে এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম,
যখন আমার সামনে কোনও বাধা নেই, পেছনে
ঢেউয়ের-দাঁত-তোলা সমুদ্র সরে গেছে—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুধু হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি ছাড়া আশেপাশে কোথাও শব্দ নেই,
একটা ভেজা পালক ফেলে গেছে কাক, সেও বলছে:
যাও, চলে যাও—
আকাশে একটু একটু তারা ফুটে উঠছে।

আমি প্রস্তুত। তোমরা আমার গন্তব্য বলে দাও।

এ যেন 'একটানা গুঞ্জনের মতো'।

শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, 'তুমি যে সবসময় একা থাক তা নয়, হয়তো অনেক সময়ে সকলের সামনেই এসে বসে থাক, অন্য যে-কোনও সামাজিকের মতো। কথা চলতে থাকে, সেই কথার মধ্যে জুড়ে থাকে তোমারও কিছু সংলাপ।... তোমার সেই নির্ভার কথার অন্তরালে হয়তো বয়ে চলেছে আরেকটা কোনও নিঃশব্দ স্রোত, তুমি ছুঁয়ে আছ সেই স্রোত'। ('এই শহরের রাখাল')

তখন কি ১৯৯৪ সাল? দেখছি তাঁর সারা গায়ে কাদা, চশমার ডাঁটি ভাঙা, কেউ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরে অপমান করছে। বলছে, একে বের করে দাও। তিনি কথা না-বলে বেরিয়ে যাচ্ছেন একা। একটু কালচে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে তৈরি করেছে ছোট একটা রক্তনদী, যা সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তা পেরিয়ে রিকশায় উঠল।

সেই সাদা-কালো ছবিটি কাঁপছে বুদ্ধদেবের সঙ্গে। শিকাগো'তে। তাঁর এগারোটি কাব্যগ্রন্থের পৃষ্ঠা, যার মধ্যে আছে 'এক ঋতু', 'সদর স্ট্রিটের বারান্দা', 'নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি', 'শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়' থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত হাওয়ায় উড়ে নর্দমার ধারে গিয়ে পড়ল।

প্রণবেন্দু, আপনার মৃতদেহ নামানো হচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বন্ধু অমিয়, শঙ্খ ঘোষ। মরিয়মও এসেছেন। আরও দু'-পাঁচ জন। আর কুয়াশা।

চারপাশে খরগোশদের দৌড়াদৌড়ি। ঘুম, জেগে ওঠা। নির্জনতা গুঁড়ি মেরে দাঁড়িয়ে। জলে নীরবতা।

লাল কাঁকড়া লণ্ঠন জ্বালিয়ে জেগে আছে।

অলিগলি দিয়ে হেঁটে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত আসবেন আমার বাড়ির দাওয়ায়। আসবেন। কারণ এখানে হাঙরেরা নেই।

ততদিন জল যদি দুলে উঠতে চায়, তাকে দুলতে দাও।

৬ ডিসেম্বর ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬১

এখন সে কত রাত!

প্যারিসে স্যাঁ-মিশেলের ফোয়ারার কাছে স্যাঁতাঁদ্রে-দে-জ়ার নামে গলিতে এক ভদ্রলোক বৃষ্টিতে ভিজছেন। হাতে একটি কবিতার বই— 'রাত নড়ে'। জলের দেয়াল পার হয়ে আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারছি না। অক্ষরের পালক কখন কাঁটা হয়ে গিয়েছে?

তিনি বিড়বিড় করে কবিতা বলছেন, এত তীব্র আর আণবিক তাঁর কণ্ঠস্বর যে মহাপৃথিবীর পাতালজল কেঁপে উঠছে।

তিনি আমার দিকে একবার তাকালেন, কতদিন মানুষের এত বিষণ্ণ মুখ আমি দেখিনি। বললেন, লোকনাথ ভট্টাচার্য? আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, না তো! মিশরের নীল নদে পড়ে আছে তাঁর শব।

> যে দৈত্যদের প্রত্যাখ্যান করেছে, সে দেবদূতেদের দিয়ে আমাদের উত্যক্ত করেছে।

তাঁকে চিনতে আমার অসুবিধে হয়নি। আঁরি মিশো (১৮৯৯-১৯৮৪)। ফরাসি কবিদের মধ্যেও যে তিনি সম্পূর্ণ একক! কবিতাকে সমস্ত দেয়াল ভেঙে কোথায় নিয়ে যাবেন তিনি? যেখানে সমস্ত চিৎকার বালি আর কাঁকর হয়ে গিয়েছে? সমস্ত শীৎকার যেখানে কৃষ্ণসমুদ্রের নুন?

> আবরণের নীচে আর লাজলজ্জা নেই। উন্নতির চুড়োগুলো বেচে দেওয়া হয়েছে।

এটা কি প্যারিস, ভারতবর্ষ, না ইকুয়েডর, না অন্য কোনও দূরতর দ্বীপ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মহাদেশ ভাসছে, মৃত পশু, জানলার কপাট, মাস্তুল, ঝাড়-লণ্ঠনের শ্যাওলা। আ—

মিশোর জন্ম বেলজিয়ামের নাম্যুরে। ২৪ মে ১৮৯৯, জীবনানন্দের তিন মাস পরে। তার কোনও শিরস্ত্রাণ নেই। আট বছর বয়সেই গাছ-হয়ে-ওঠার অসহায় স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। ডাক্তারি পড়ায় ছেদ টেনে নাবিক হিসেবে পাড়ি দেন। এভাবেই ১৯২১ সালে একদিন ফ্রান্সের মার্সেই বন্দরে এসে উপস্থিত হন তিনি। বাসভূমি ছেড়ে ফ্রান্সে চলে আসার মধ্যেই নিহিত আছে আঁরি মিশো-র জীবনদৃষ্টি: সংকীর্ণ ভূগোলকে অস্বীকার করে এক শেকড়হীন বিহ্বলতায় পৌঁছনো, যেখানে সব উপস্থিতি অনুপস্থিতি পর্যবসিত হয়।

১৯২২ সালে এক অভিনব লিখনক্রিয়া শুরু। স্যুররেয়ালিস্ত চিত্রকরদের সঙ্গে মিশতে-মিশতে ত্বকহীন এক বাস্তবকে আবিষ্কার করছেন ওই বেলজিয়ান। ছবি আর অক্ষর মিলেমিশে যাচ্ছে। সাদা পৃষ্ঠা আর সাদা নেই, শূন্যতা খুঁড়ে কেউ সেখানে প্রবেশ করছে, প্রশ্ন করছে, আক্রমণ করছে, আর সাদা পৃষ্ঠা হয়ে উঠছে আর্ত চিৎকার, ঢেউ, শিহরন।

এই কবিতার জগৎ মিশো'কে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে, এ এমন এক এলাকা যেখানে শব্দেরা দানা বাঁধতে পারে না, তারা দানা বাঁধতে অক্ষম ('incrystallisable')। এ এমন এক অসম্ভবের জগৎ যা এত কথা বলে যে তা বোবা। যা এত নড়ে যে তা অনড়। তার অস্তিত্ব দিয়ে সে-কবিতা তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

মিশো কোনও দলে ভিড়লেন না। খুঁজলেন নিজের ভেতরে, যেখানে 'রাত নড়ে', যা 'গহ্বরের ভেতর অভিজ্ঞান' ('connaissances par les gouffres'), আমাদের 'জটে জড়ানো বিষাদকে অতিক্রম করে'। এ যেন অক্ষরকে ওলটপালট করে এক নতুন বাস্তবের অবয়বকে টেনে বের করে আনার যুদ্ধ।

যাবতীয় কাপট্যের প্রতি ঘৃণা তাঁকে ঠেলে দেয় স্নায়ুপ্রশাখার এক স্বর্ণগুহায়, যা হয়ে ওঠে তাঁর 'সত্যিকারের মা', তাঁর 'দিগন্ত'। শূন্যের অন্তঃস্থ বাক্যকে খোঁজা, মেলে ধরা। অন্ধকার হয়ে ওঠে তাঁর স্ফটিক।

পরিচিতির পর্দা ছিঁড়ে এ এক অপরিলিখিত অনন্তে (মিশো-র ভাষায়, 'আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে') মিশে যাওয়া।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি পৃথিবীর শেষ সীমা থেকে তোমায় লিখছি। তোমার তা জানা দরকার। গাছেরা প্রায়ই কাঁপে। পাতাগুলো লোকে কুড়িয়ে নেয়। তাদের কত যে শিরা তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাতে কী লাভ? গাছের সঙ্গে তাদের আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না, ফলে আমরা বিব্রত হয়ে সরে পড়ি।

পৃথিবীর জীবনযাত্রা কি হাওয়া ছাড়া চলে না? না কি সব কিছুকে কাঁপতেই হবে সব সময়, সব সময়?
মাটির নীচেও নড়াচড়া আছে, আর বাড়ির মধ্যে আছে বুঝি
ক্রোধ, যা তোমার সামনে এগিয়ে আসে, যেন কড়া মেজাজের
কেউ তোমার স্বীকারোক্তি আদায় করতে চায়।
যা না দেখলেও চলে তা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।
কিছুই না। তবু সবাই কাঁপে। কেন?

(অনু: অরুণ মিত্র)

শান্ত ও উষর দৃশ্যপট।
পৃথিবীর উপরিতলের চেয়ে বেশি,
জীবনভূমির দৃশ্যপট।
ধীরে বয়ে যাওয়া সময়ের দৃশ্যপট, প্রায় স্থবির, পেছনে ফেলে যাওয়া।
ফালাফালা হয়ে যাওয়া ছিন্ন স্নায়ুর দৃশ্যপট।
ক্ষতচিহ্ন, ইস্পাত, চোখধাঁধানি, যন্ত্রণা, যুগ, ফাঁসি
আর যুদ্ধের প্রস্তুতিকে ঢেকে ফেলার
দৃশ্য
চিৎকারকে মুছে ফেলার দৃশ্যপট।

(অনু: লেখক)

যখন পিঁপড়েরা মাটির ওপর পেট দিয়ে ধুলো ঠেলে আমার ভয় করে, মিশো।

আমার ভয় করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভয়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়, এ কি র‍্যাঁবোর 'নরকে এক ঋতু'-র নতুন রূপ? এ কি ১৮১৯ থেকে ১৮২৩ সালে আঁকা গোইয়া'র 'কালো ছবি'-র মৃত্যুপৃথিবীর হাড়? না কি এ-জগৎ লোত্রোয়ামঁ-র (১৮৪৬-১৮৭০)? কাফকা-র? আলফ্রেদ জারি-র? কেউ-কেউ মনে করেন, স্যুররেয়ালিস্ত আন্দোলনকে একমাত্র মিশো-ই গভীর প্রত্যয়ে অনুভবের শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

মিশোর আঁকা ছবিও রবীন্দ্রনাথের ছবির মতো আলোছায়ার রাগিণী। আর কবিতা যেন অবচেতনের টুকরো-টুকরো পাঠ, যাকে তিনি আরও গভীরভাবে দেখতে চেয়েছিলেন। এমনকী মারাত্মক মেসকালিন ড্রাগের সাহায্যও নিয়েছিলেন কিছুদিন।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের বন্ধুতা কি তাঁকে শিখিয়েছিল অন্ধকারের স্নায়ুকোটরে আলোর মর্মর? জানি না। শুধু জানি 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ'-এর লেখকের কবিতা 'ঘর' মোহিত করেছে তাঁকে।

আমরা এখন শামুকের খোলা-ছাড়ানো এক অপরূপ চিহ্নমালার সামনে দাঁড়িয়ে। চিহ্ন উড়ছে, আর তার ফুলকি অভ্রময় করে দিচ্ছে আমার ক্ষতমুখ।

সেখানে বিস্তারের কণ্ঠ নখ আর হাড়ের সঙ্গে কথা বলে।

ঘুমোনো

ঘুমিয়ে পড়া খুব শক্ত। প্রথমত সর্বক্ষণ লেপগুলোর ভয়াবহ ওজন এবং কেবলমাত্র বিছানায় চাদরগুলোর কথা বললে, সেগুলো যেন লোহার পাতের মতো।

নিজেকে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করার পর, কী ঘটে সেটা সকলেরই জানা। বিশেষত অনস্বীকার্য এই কয়েক মুহূর্তের বিশ্রামের পর, আমরা শূন্যে প্রতিভাত হই। অতঃপর নেমে আসা আর এই নেমে আসাটা সর্বদাই এত আকস্মিক যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

অথবা, পিঠের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে, হাঁটুগুলো তুলে ধরা। এটা ঠিক নয়, কারণ পেটের ভেতরকার জল নড়ে ওঠে আর ক্রমশ জোরে জোরে ঘুরপাক খায়। এইরকম একটা লাট্টুর সঙ্গে ঘুমানো যায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই কারণেই অনেক ভেবেচিন্তে উপুড় হয়ে শোয়— কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে— ওরা সেটা জানে, কিন্তু কী করব, ওরা বলে— ওরা গড়িয়ে পড়ে, ওরা গড়িয়ে পড়ে গভীর খাদের মধ্যে, আর যত নীচেই ওরা যাক কেউ না কেউ ওদের পাছায় পা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দেয়, আরও নীচে... আরও। তাই ঘুমোতে যাওয়ার সময়টা বেশিরভাগ লোকের কাছে এক অতুলনীয় দুর্ভোগ।

(অনু: লেখক)

সমুদ্র

যা আমি জানি, যা আমার, তা হল এক অনির্দিষ্ট সমুদ্র।
একুশ বছর বয়সে আমি পালিয়ে এসেছিলাম শহরের জীবন থেকে। হয়েছিলাম নাবিক। জাহাজে কাজ থাকত। আমি অবাক হতাম। আমি ভেবেছিলাম, জাহাজে লোকে কেবল সমুদ্র দেখে। অনন্তকাল সমুদ্র দেখে।
জাহাজগুলোকে নিরস্ত্র করা হল। শুরু হল সমুদ্রের মানুষদের বেকার দশা। আমি পেছন ফিরে চলে গেলাম, কিছু বললাম না, আমার ভেতরে সমুদ্র, আমার চারদিকে চিরন্তন সমুদ্র।
কোন সমুদ্র? সে কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে পারব না।

(অনু: সুদেষ্ণা চক্রবর্তী)

হে শতভিষা, হে রাতপরি, আজ এই হেমন্ত-নিশীথে ওই দুঃসাহসিক স্নায়ু-অভিযান আমাকে তছনছ করে দিচ্ছে।

২০ ডিসেম্বর ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬২

আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি, আমার অন্তর প্রসারিত হয়ে নিজেকে মেলে দিচ্ছে আকাঙ্ক্ষায়, মনে হচ্ছে আমার এই চুপ করে চেয়ে থাকার অর্থ আর কিছু নয়। শুধু একটা 'এসো', 'এসো' ডাক, একটা অবিরল আহ্বান। কখনও আসবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি যে অপেক্ষা করে ছিলাম, এইটুকুতেই আমার পরিচয় লেখা হয়ে যাক— যতদিন না সব লেখা ধুলোয় মিশে যায়।

('সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতা')

বুদ্ধদেব বসুর 'রাত তিনটের সনেট' পড়েছিলাম কোন রক্তক্ষরণের রাতে মনে পড়ছে না। শুধু জানি আজ, ১৮ মার্চ ১৯৭৪, সন্ধ্যায় সহসা সংজ্ঞালোপের পর হাসপাতালে রাত তিনটের কিছু আগে চলে যাবেন তিনি। অজ্ঞান হওয়ার আগে বাথরুমের বাঁপাশের দেয়ালে বইয়ের তাকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দৃষ্টিহীন। মৃত্যুর পরদিন ভোরে তাঁর ঘরে চারদিকে ছড়ানো আছে প্রুফ। রচনাবলির প্রুফ, তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি।

মৃতদেহ শোয়ানো হয়েছে কেওড়াতলার শ্মশানচত্বরে। ফাদার আঁতোয়ান পাঠ করছেন উপনিষদের শ্লোক। তারপর কি তিনি নিজেই গান ধরলেন 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'?

বৈদ্যুতিক চুল্লি যখন বুদ্ধদেবকে ডেকে নিল তখন কি সেই হাঁ-মুখ জ্যোৎস্নায় ইস্পাতের মতো নীলাভ, আধো-অন্ধকারে স্বপ্নিল? আমার চোখের সামনে একটি বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে যাচ্ছে, জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (ডিসেম্বর ১৯৩৬), বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গীকৃত।

আমি তাঁর কবিতার আগ্রাসী উদ্ভাসিত জীবনবাদিতাকে ছুঁতে চাই, তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রজ্ঞা এত স্বর্ণদীপ জ্বালিয়ে দেয় আমার স্নায়ুতটে যে ঘুমের দরজার সব কপাট খুলে যায়।

আমি বুঝতে পারি না কোথা থেকে শুরু করব। সমস্ত শব্দই যেন কখন নিঃশব্দে জোনাকি হয়ে গিয়েছে। যেন আমি বুদ্ধদেবের প্রথম গল্প (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) 'রজনী হল উতলা' পড়ছি আট দশক পরে:

> মনে হলো প্রকৃতি চলতে-চলতে যেন হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে— যেন উৎসুক আগ্রহে কার প্রতীক্ষা করছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উঠবার আগ-মুহূর্তে দর্শকরা কেমন হঠাৎ স্থির, নিঃশব্দ হ'য়ে যায়, সমস্ত প্রকৃতিও যেন এক নিমেষে সেইরূপ নিঃসাড় হয়ে গেছে। তারাগুলো আর ঝিকিমিকি খেলছে না, গাছের পাতা আর কাঁপছে না, রাতে যে-সমস্ত অদ্ভুত, অকারণ শব্দ চারদিক থেকে আসতে থাকে, তা যেন কার ইঙ্গিতে মৌন হ'য়ে গেছে, নীল আকাশের বুকে জোছনা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে— এমনকি বাতাসও যেন আর চলতে না-পেরে ক্লান্ত পশুর মতো নিঃশব্দ হয়ে গেছে— অমন সুন্দর, অমন মধুর, অমন ভীষণ নীরবতা, অমন উৎকট শান্তি আর আমি দেখিনি। আমি নিজের অজান্তে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলুম— কেউ আসবে বুঝি?

বুদ্ধদেবের গদ্যের এই ছন্দিত মাধুর্য, এই জীবন্ত মাদকতা, সর্বনাশা চুম্বনের মতো আমার রাত, আমার দিনকে শিহরিত করে রাখে।

তাঁর 'বাসরঘর' (১৯৩৫) উপন্যাস পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (২৫ অক্টোবর ১৯৩৫):

> এ কবির লেখা গল্প। আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেছে। একটি নারী এবং একটি পুরুষ এই দুই তটের মাঝখানে এর আবেগের ধারা। ধারার মধ্যে থেকে থেকে আবর্ত পাক খেয়ে উঠছে, কিন্তু তার কারণগত আঘাত বাইরের দিক থেকে নয়, গভীর তলার দিক থেকে।... তুমি দেখালে বান ডেকে আসছে, তারপর বললে, বাস, আর দরকার নেই, ভাঙচুর শুরু হবে সে তো ধরা কথা,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অলমতি বিস্তারেণ।... এই তোমার না-বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন দাঁড় করাতে পেরেছ সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে।

এখন এই মৃত্যুদীর্ণ সময়ে, যেখানে মাদারির খেলায় সভামুখ্য এক অন্ধ— বুদ্ধদেব বসুর শরীর থেকে আলো এসে পড়ে আমার এই একরত্তি ঘরে। মৃত্যু নিয়ে 'তিথিডোর' (১৯৪৯)-এ স্বাতীর কথা মনে হল আমার।

> কোনও এক প্রমথেশ চৌধুরী পৃথিবীতে আর নেই...। (স্বাতী) বারবার ভাবল তাঁর লম্বা, ঠান্ডা, নিঃসাড় শুয়ে থাকা— মরা! কেমন দেখাচ্ছিল? সব সময় হাসি-হাসি সেই মুখে একটুও হাসির ভাব ছিল কি? না কি যন্ত্রণায় মোচড়ানো মুখ? না কি কিছুই না— শূন্য? কিছু না, শুধু শূন্যতা— স্বাতী ভাবল—জামাইবাবুকে, না... মৃত্যুকেই ভাবল স্বাতী— তাহলে এই? অদৃশ্য তীরন্দাজ অব্যর্থ তীর নিয়ে ঠিক তৈরি? যেমন ছিল তার ছেলেবেলায়, তেমনি? তখন তেমনি, এখন তেমনি। আমরা ভুলে যাই, আমরা ভুলে থাকি। সে কখনও ভোলে না। সে আছেই, সে আছে। তাক করে আছে পিঠের দিকে, আমার দিকে, যা কিছু আমার আর যা কিছু আমি সেই সমান্তর দিকে। যত আমার ইচ্ছা, চিন্তা, চেষ্টা সবার ওপরে সে। আর যত আমার ভালবাসা, তার ওপরেও সে। কেমন করে এতদিন ভুলে ছিলাম! মৃত্যুকে এতদিন ভুলে ছিল বলে স্বাতীর অবাক লাগল, আরও অবাক লাগল অন্যদের এখন ভুলে থাকতে দেখে।... মনে পড়ল না যে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কাছে বিক্রি হয়ে গেছে তারা নিজেরাই। সেই নিশ্চিত, ভীষণ তীরন্দাজকে কখনো তারা দ্যাখেনি, এখনো তারা দেখল না।... গান আরম্ভ হওয়ার আগে যেমন তানপুরা বাজে, তেমনি একটা ঝিমোনো, গম্ভীর, একটানা সুর স্বাতীর মনের মধ্যে বাজতে লাগল সবসময়। দুঃখের সুর, সব জড়ানো দুঃখের। গম্ভীর, মন্থর, নিশ্চিত দুঃখের স্রোত বয়ে চলল একটানা। থামে না, কমে না, বাড়ে না, ছাড়ে না... সবসময় একরকম।

সর্বমুখিতায় বুদ্ধদেব বসুর মতো কে আছেন শুধু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া? চ্যাপলিন সম্পর্কিত প্রবন্ধে যে 'আশ্চর্য আকস্মিক সংকেতের' কথা বলেছেন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কবিতার পঙক্তির মতো যা অবিস্মরণীয়', তা তাঁর গদ্যকে— ব্যক্তিগত রচনা থেকে সমালোচনা— সুরের স্বাদুতায় স্বর্ণিল করে রাখে। আমি বুঝতে পারি না কী করে কারও সৃষ্টির এমন সব আশ্চর্য নাম হতে পারে! 'রজনী হল উতলা', 'আয়নার মধ্যে একা', 'গোলাপ কেন কালো', 'শোণপাংশু', 'ভাসো, আমার ভেলা'।

কোমল ও ঋজু, আচ্ছন্ন ও সজীব সর্পিল তটিনীর মতো ওই ভাষা পিয়ানোর ওপর আঙুলের মতো খেলা করে। পিয়ানো মানে শোপ্যাঁর 'নকটার্ন'? ভাবতে-ভাবতে কখন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঢেউয়ের মতো উঠে এসেছে 'তিথিডোর'-এর পৃষ্ঠায়:

> আসছে... আসছে... গুনগুন রব উঠল ভিড়ের মধ্যে।
>
> স্বাতী মনে মনে ভাবছিল লম্বা, গম্ভীর, আনত, আচ্ছন্ন, স্তব্ধ, মন্থর মিছিল, কিন্তু মাত্রই কয়েকজন যেন অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে নিয়ে এল কাঁধে করে— নিয়ে এল উত্তর থেকে দক্ষিণে— পিছনে এলোমেলো অল্প লোক— বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল স্বাতীর চোখের সামনে দিয়ে— রোদ্দুরে ঝিলিক দিল লম্বা সাদা চুল আর মস্ত সাদা শান্ত, তন্ময় কপাল। ঐটুকু দেখল স্বাতী, আর দেখতে পেল না। সত্যেন দেখল, স্বাতী দাঁড়িয়ে আছে শক্ত সোজা হয়ে, হাত মুঠো করে, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, দেখল তার কণ্ঠের কাঁপুনি, ঠোঁটের কাঁপুনি, গালের ঘন রঙ... দেখল তার তরল কালো উজ্জ্বল চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল হল, ঝকঝকে দুটি আয়না হয়ে উঠল, তারপর ভাঙল আয়না, আবার তরল হল, উপচোল, মাথা নিচু হল। আর তাই দেখে সত্যেনেরও নতুন করে গলা আটকাল, চোখ ঝাপসাল, আর সেজন্য লজ্জা করল নিজের কাছেই। এ মৃত্যু তো কান্না চায় না। এই দুঃখ, এই মহান, মহামূল্য দুঃখ, আশি বছরের পরম পরিশ্রমের এই সবশেষের রত্ন—এ কি চোখের জলে বাজে খরচ করবার?

রেমব্রান্ট প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, তিনি ইউরোপীয় চিত্রকলায় বিষাদের আবিষ্কারক, প্রধানত দুঃখের পথ ধরেই মানবাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব নিজেও কি তাই? দুঃখের দীর্ঘাকার সিঁড়ি পার হয়ে তাঁর পর্ব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও পর্বাঙ্গে বিভক্ত শব্দ ও বাক্যের গহন বিস্ময়! যেখানে সুরের পর্দা ওঠে ও নামে, হয়ে ওঠে সাতরঙা এক কনসার্ট।

> আকাশ নুয়ে পড়েছে জলের উপর— তাকিয়ে আছি সেই ঝাপসা-ধোঁয়াটে অগ্নিকোণের দিকে, সেখান থেকে অগ্নিবর্ণ সূর্যের উদয় শীতের ভোরে অনেকবার আমি দেখেছি, আর যেখান থেকে, একটু পরেই, যে-কোনো মুহূর্তে, সমুদ্রের ঢেউ ছুটে আসবে আমাদের চোখের সামনে। ঐ আসছে।
>
> দুধের মতো সাদা একটি ফেনিল রেখা প্রথমে, তারপর শোঁ-শোঁ শব্দে সমুদ্র এলো ঝাঁপিয়ে— মস্ত বড়ো নদীটা যেন দুলে, ফুলে, গর্জে উঠে আরও অনেক প্রকাণ্ড হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো— তার বিস্তার জুড়ে হাজার ঘোড়ার দাপাদাপি, হাজার স্টিমারের এঞ্জিন যেন পাকে-পাকে ছিটিয়ে দিচ্ছে তার ফেনা, তার ঘূর্ণি, তার সব নীল কালো বেগুনি বাদামি সাদা রঙের ঝলক—দুপুরবেলার রোদ্দুরে আরও উজ্জ্বল— এক বিপুল রঙ্গ ঢেউ তুলে-তুলে পশ্চিম দিকে ছুটে চ'লে গেলো।
>
> ('আমার ছেলেবেলা')

তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যনাটক পর্যন্ত বিস্তৃত বুদ্ধদেবের গদ্যের মায়াজাল মার্সেল প্রুস্ত, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ অথবা কমলকুমারের থেকে আলাদা এক 'অন্তর্লীন অন্বয়' তৈরি করছে, যা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতে, কাঁথার বুননশিল্পের মতো। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্য, যেখানে ভারী শব্দের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল প্রাত্যহিক, ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, বিস্তৃত করে স্বতঃশ্চল করে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব? বাংলা গদ্যের আরেক ভাস্কর অলোকরঞ্জনের মনে হয়েছিল, টাঙ্গাইলের শাড়ির মতো তাঁর অপরূপ গদ্যের বয়ন।

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুরণনময় মৃদুতা অতিক্রম করে এক সুস্থির আত্মপ্রস্তুতিদীপ্ত তিমিরবিনাশী প্রজ্ঞায় অগ্রসর হয়েছে বুদ্ধদেবের গদ্য: এলিয়টের ভাষায়, দান্তের অব্যর্থ তীরের মতো, 'the arrow that goes straight into the target'!

আর তাঁর অলীক সোমরসের [illegible] স্বাদু [illegible]দের [illegible]চেতনায় সমুদ্রের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নীচে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকেন রবীন্দ্রনাথ—'এক দৈব আবির্ভাব—অপর্যাপ্ত, চেষ্টাহীন, ভাস্বর, পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম' ('রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বকবি ও বাঙালি'), যিনি গদ্য লেখেন 'কবির মতো: তাঁর গদ্যের গুণ কবিতারই গুণ: যা কবিতা আমাদের দিতে পারে, তা-ই তাঁর গদ্যের উপঢৌকন।'

('রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প')

আমরা, যাদের 'রক্তের বিবর্ণ পাণ্ডুরতা ধূসর হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের মুখে; হৃদয় যাদের শুকিয়ে গেছে, ঝ'রে গেছে ধুলো হয়ে—', 'অবান্তরতায়, তুচ্ছতায় সংকীর্ণ জীবন যখন নিজের বিনাশে নিজেই উদ্যত— এমন সময় একদিন চাঁদ ওঠে আকাশে, মনে করিয়ে দেয় আরও-কিছু আছে।' ('ক্লাইভ স্ট্রিটের চাঁদ')

আরও কিছু? এর মধ্যে মিশে থাকে রুসোর সেই অব্যক্ত 'জানি না কী' (Je ne sais quoi): যেমন 'তিথিডোর' উপন্যাসের সেই স্তব্ধতা-উৎকীর্ণ সমাপ্তিতে!

> চুপ... সারা বাড়ি চুপ...পৃথিবী চুপ... কুলোর প্রদীপের ছায়া-ছায়া আলো...লুকোনো, লাজুক... বলতে-না-পারা কথা, ভুলতে-না-পারা... দরজা খুলে গেল...অন্ধকার। কেউ বলল না... কেউ ভুলল না... অন্ধকার ঘরে দুজনে। অন্ধকারে দুজনে, পাশাপাশি, কুঁকড়োনো, টান... বলল না... ভুলল না। শ্বেতা দাঁড়াল...রাজেনবাবু দেয়ালে হাত তুলে... টান, দুটো প্রাণ... জীব... হৃৎপিণ্ড...স্পন্দনের পিণ্ড... চোখ নেই, চোখ খোলা, খোলা জানলা কালো... বাইরে কালো, কালো আকাশে তারা... দূরে... পারে... পরপারে... হয়ে-যাওয়া... না-হওয়া... হতে থাকা... চিরকালের... আকাশ-ভরা স্তব্ধ তারা তাকিয়ে থাকল।

১০ জানুয়ারি ২০১৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬৩

বিনু লিখেছিল, মানুষের জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা আপনাকে পাওয়া। লেখকের জীবনে এর একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। লেখক আপনাকে পায় আপনাকে বিলিয়ে। বিনু জানত, সাধনার শেষ কথা মোক্ষ। তার সাধনা রসমোক্ষণের। তাই তার অন্তিম সোপান রসমোক্ষ। সেই তার পথ, নান্যঃ পন্থাঃ। পরবর্তী বয়সে আবার সে সংশয়ে পড়েছে, আলো হারিয়েছে, আলেয়ার দিকে চলেছে, কিন্তু মার্গভ্রষ্ট হয়নি।

সে 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১) লিখে ভ্রমণসাহিত্যে বাজিমাত করেছে, 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-১৯৪২) আর 'রত্ন ও শ্রীমতী' (১৯৫৬-১৯৭২) লিখে দেখিয়েছে ভলতের আর রুসো-কে একই আধারে ধরা যায়। প্রবন্ধ লিখেছে তরোয়াল আর বীণাকে দুই হাতে ধরে। একমুহূর্তের জন্যও ভোলেনি, সে রূপমুগ্ধ। সে প্রেমবদ্ধ।

সে আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল, কিন্তু একদিন আনমনে অনেক পায়চারি করে, সাতচল্লিশ বছর বয়সে বিনু সেই সিদ্ধান্তটি নেয়, যেটি তাকে আর শিল্পী-সত্তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে। 'কোনও উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে হয় না। কোনও নীচেওয়ালাকে চালনা করতে হয় না। সে তার ইচ্ছামতো বাঁচে। তার সৃষ্টিশক্তি বাঁচিয়ে রাখে। সৃষ্টিশক্তিও একপ্রকার আগুন। যে আগুন নক্ষত্র নীহারিকায় জ্বলছে সে আগুন বিনুর অন্তরেও।'

ছড়া লিখতে গিয়ে সে বুঝেছিল, কবিতার মতো ছড়া লেখাও একটা সাধনা। মহাকবিরাও শব্দের মায়ায় পড়ে মায়ামৃগের পিছনে ছোটেন। সীতাকে ভুলে যান। ছোট-ছোট ছড়াকাররা কিন্তু তেমন নন। 'খুকুমণির ছড়া'-কে বিনু শনাক্ত করল তার আদর্শ বলে। সে লিখেছিল, 'শব্দ ছড়াকারদের কাছে মুখ্য নয়। তাঁরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। অনেকেই মেয়েমানুষ। সহজে যা মুখে আসে, সহজে যা মনে থাকে, সেই সামান্য পুঁজি নিয়ে তাঁদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারবার। জীবনে একটি কি দু'টি ছড়া কেটেছেন। কবির লড়াইয়ের মতো ছড়ার লড়াইও হয়তো চলত। কথা কাটাকাটির মতো ছড়া কাটাকাটি। তার থেকে কিছু টিকে আছে। আর সব হারিয়ে গেছে।'

বিনুর জীবন বড় অদ্ভুত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিন রেলপথে নিভৃত ভ্রমণ। তিনি বলেন, 'আমি আজকাল ছড়া লিখছি। তুমিও লেখ না কেন?' আমি সবিনয়ে নিবেদন করি, 'ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না'। তিনি কলকাতায় ফিরে গিয়ে কী মনে করে আমাকে তাঁর 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন। সেই একটি উপহারই আমি কবিগুরুর কাছ থেকে পেয়েছি। তাতে তার নিজের অনেকগুলো ছড়া ছিল। তিনি কি চেয়েছিলেন যে আমিও সেরকম কিছু লিখি? তেমন ক্ষমতা বা অভিলাষ আমার ছিল না।'

কিন্তু পরে বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের জন্য লিখতে গিয়ে বিনুর হাত খুলে যায়। সে ইংরেজি ক্লেরিহিউ, লিমেরিক, রাথ্‌লেস রাইম, ব্যালাড পড়েছিল; এবার ছড়া লিখতে গিয়ে আজ তার মনে হল— সেসব বড়দের জন্য লেখা, ছোটদের জন্য নয়।

বিনুর এক ভক্ত এক সাক্ষাৎকারে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, অনেক আগেই কিন্তু সে ছড়া লিখেছিল ('লন্ডন ফগ', 'লন্ডনের শীত', 'লন্ডনের গ্রীষ্ম', 'উইপোকাদের গান') যা 'মৌচাক'-এর মতো কাগজে বেরিয়েছিল। তবু তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয়নি। তা ছাড়া, সেগুলো তো পদ্যের মতো করে লেখা। ছোটদের জন্য লিখবে যখন সে ঠিক করল, তার আদর্শ হল যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া', রবীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের নয়।

বিনু তো কারুশিল্পী। তার গদ্যে সে রসের ময়ান দিতে জানে। ছড়া লিখতে গিয়ে বুঝেছিল সে বড়দের জন্য লিখতে পারে, ছোটদেরও। কিন্তু ননসেন্স তার পথ নয়। তার বড়দের ছড়ার উপকরণ আসে সমসাময়িক ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে। কিন্তু চিরভাবুক বিনু তো আগে জীবনশিল্পী হতে চেয়েছে। কার জন্য লিখব, কী লিখব এবং কীভাবে লিখব—সারা জীবন সে এই তিনটি প্রশ্নেরই জবাব খুঁজেছে। বিনু বুঝেছিল 'শব্দ জুড়ে জুড়ে ছড়া লেখা শিক্ষিত জনের পক্ষে তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু শিক্ষাভিমান ত্যাগ করে প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃতজনের মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সুর-মিলিয়ে নেওয়া সাধনা-সাপেক্ষ কাজ।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ' তাকে ছুঁল, তার অন্তরকে আলোড়িত করল। সে চাইল, সে-ও ছড়া দিয়ে জনগণের অন্তরে পৌঁছবে, উপরন্তু যা মুখে-মুখে ঘুরবে। সে ভাবল ব্যালাড লিখবে, যা সাধারণ লোকে আওড়াবে। যেমন মজলিশি গান— একজন গাইলে পাঁচজনে লুফে নেয়। বিনু জানত, এর সম্ভাব্যতা অনেকে জানে না। যা পোশাকি নয়, তার দিকে আমাদের মন যায় না।

১৯৮৪ সালেও সে লিখেছে, 'রবীন্দ্রনাথ যা-ই লেখেন তা সাহিত্য হয়। কিন্তু লোকসাহিত্য? চাষি, তাঁতি, জেলে, জোলার মুখে ছড়িয়ে পড়ার মতো রসাত্মক বাক্য? না বোধ হয়।'

'বিনুর ছন্দ' শিরোনামে অনেক কাল আগে সে লিখেছিল তার প্রিয়া মনে করে সে দ্বন্দ্বকাতর বলে ছন্দের আড়ালে মুখ ঢাকছে। তার তলোয়ার নেই, আছে শুধু ঢাল। দুই আদর্শের ঠোকাঠুকি তাকে বিনিদ্র করেছে, সে নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারেনি, বোঝাবে কাকে। বিনু জানত, কবিতার ছন্দের জন্য যেমন কান তৈরি করতে হয়, তেমনই জীবনের ছন্দের জন্য অন্তঃকরণ।

এই দুই ছন্দকে সে মেলাবে বলে মাঠে নামল। 'যেমন হালকা ভাব, তেমনি লঘু ছন্দ।' এর সমকক্ষ হতে পারে, এমন কোনও জিনিস এখনও পর্যন্ত হয়নি।

বিনু আবারও লিখল, 'ছড়া একপ্রকার আর্টলেস আর্ট, শিশুরা সহজে পারে, বয়স্করা সহজে পারে না। মেয়েরা সহজে পারে, পুরুষেরা সহজে পারে না। অশিক্ষিতেরা সহজে পারে, শিক্ষিতরা সহজে পারেন না। মুর্খেতে বুঝিতে পারে, পণ্ডিতে লাগে ধন্দ।'

বিনু বুঝেছিল, সে সব সময় পারেনি। শান্তিনিকেতন থেকে ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ সে সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখেছিল, যা চেয়েছিল তা হচ্ছে না, হয়ে উঠছে সমসাময়িক রাজনীতির critique, ঝাঁঝের সঙ্গে ব্যঙ্গমিশ্রিত।

ব্যঙ্গের চেয়ে তার আদর্শ ছিল 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো', 'হাট্টিমা টিম টিম', 'কমলাপুলির টিয়েটা/ সূর্যিমামার বিয়েটা'। যা খাঁটি লোকসংস্কৃতি, যার মধ্যে থাকবে বহু যুগের ফোক উইসডম।

তার হিরের ছুরির মতো ধারালো ছড়াকে লোকপ্রিয়তায় ছাড়িয়ে যাওয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছড়ার বইগুলো: 'রাঙা ধানের খই' (১৯৫০), 'ডালিম গাছে মৌ' (১৯৫৮), 'আতা গাছে তোতা' (১৯৭৪), হৈ রে বাবুই হৈ (১৯৭৭), 'রাঙা মাথায় চিরুনি' (১৯৮০), 'বিন্নি ধানের খই' (১৯৮৯), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৯৪), 'দোলদোল দুলুনি' (১৯৯৮), 'রাঙা ঘোড়ার সওয়ার' (২০০২)...। বড়দের জন্য সব ছড়া যুক্ত হয়েছে 'উড়কি ধানের মুড়কি' (১৯৪২), 'শালি ধানের চিঁড়ে' (১৯৭২) বা 'যাদু, এ তো বড় রঙ্গ'(১৯৯৪)-তে।

'ছড়াসমগ্র' নিবেদিত হয়েছিল 'খুকুমণির ছড়া'-র নাম-না-জানা ছড়াকারদের উদ্দেশে।

কাঁদুনি

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়!
বাঘ নয় ভালুক নয়
নয়কো জাপানী
বোমা নয় কামান নয়
পিলে কাঁপানী।
মশা!
ক্ষুদ্র মশা!
মশার কামড় খেয়ে আমার স্বর্গে যাবার দশা।...

খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করে!
তার বেলা?...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এইসব ছড়া লিখে সে আমাদের গালে চপেটাঘাত করেছিল, কিন্তু রসমোক্ষণের সাধনার শপথ ভোলেনি।

নাগা খাঁ

আগরতলার
আগা খাঁ
সোদরবনের
বাঘা খাঁ।
এদের সঙ্গে
মারামারি
করতে যাবে
এই পাড়ারই
দেড় বছরের
নাগা খাঁ।

ময়নার মা ময়নামতী

ময়নার মা ময়নামতী
ময়না তোমার কই?
ময়না গেছে কুটুমবাড়ি
গাছের ডালে ওই।
কুটুম কুটুম কুটুম
নামটি তার ভুতুম
আঁধার রাতের চৌকিদার
দিনে বলে শুতুম।
ময়না গেছে কুটুমবাড়ি
আনতে গেছে কী?
চোখগুলো তার [illegible]
চৌকি[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেড়ালছানার হিমালয় ভ্রমণ

ঘণ্টি পড়ে ঠং ঠং
বেড়াল যাবেন কালিম্পং।...
ঝকর ঝকর দুড় দুড়
ট্রেন ছেড়েছে বোলপুর।

পূরণ করো

খেলেও বলে, খাইনি
পেলেও বলে, পাইনি
গেলেও বলে, যাইনি
        এমন মেয়ে দেখি যদি
        তাকেই বলি—
রেখেও বলে, রাখিনি
ঢেকেও বলে, ঢাকিনি
থেকেও বলে, থাকিনি
        এমন মেয়ে দেখি যদি
        তাকেই বলি—

সুকুমারী

ও আমার সুকুমা
ছিলি কতটুকু, মা।
পা পা চলি চলি
কবে রে তুই বড় হলি।
বড় হওয়া কী যে দায়
বর এসে নিয়ে যায়।...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাল টুক টুক

লাল টুক টুক ছাতাটি
কালো কুচ কুচ মাথাটি
কে যায়? কে যায়?
সোনা রায়।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপ
পথ চলতে মজা খুব
কে পায়? কে পায়?
সোনা রায়।

ওদিকেতে পা দুটি যে
জলের ছাঁটে গেল ভিজে
ফিরে আয়! ফিরে আয়!
সোনা রায়।

কাকতালীয়

গাছ ছিল ডাল ছিল
কাক ছিল তাল ছিল
কাক বলে, কা কা
পড়ে যা। পড়ে যা।
টিপ করে তাল গেল পড়ে।
কাকের কী কেরামতি
সবাই অবাক অতি
ডাক ছেড়ে কাকটাই
তালটাকে ধরাশায়ী
করল কী মন্ত্রের জোরে।
তাল ছিল লাল ছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফোলা ছিল গাল ছিল
তাল বলে, হা হা
উড়ে যা। উড়ে যা।
ফস করে কাক গেল উড়ে।...

কাজী থেকে পাজি

কাজী
সকল কথায় হাঁ-জী।
হাঁ-জী! হাঁ-জী! হাঁ-জী!
দরদালানে থাকেন তিনি
বাদশা বেজায় রাজী।
একদিন সেই কাজী
বলে বসলেন, না-জী।
যাবেন কোথা, এক নিমেষে
অমনি হলেন পাজি।
পাজি! পাজি! পাজি!
মনের দুঃখ বনে গেলেন
কাজী!

ধৌত তুলসীপত্র

মশাই,
বলতে পারেন কোথায় পাব
ধৌত তুলসীপত্র?
রোমে গিয়ে এলেম দেখে
নেইকো সেটা তত্র।
টোকিওতে এলেম দেখে
নেইকো সেটা তত্র।
কলকাতায় দেখছি এসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেইকো সেটা অত্র।
জানতে চাই সেই ঠিকানা
মিলবে সেটা যত্র।
ধৌত তুলসীপত্র।

কাক মজলিস

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?
ভাবেন নবাব।
যেমন ওদের হ্যাংলা স্বভাব
ভাবেন নবাব।

ছড়াও ভাত, ভাত ছড়াও
দলগুলোকে হাত করাও
বলেন নবাব।
নিজের জন্যে সরিয়ে রাখেন
কোর্মা কাবাব।

খিলাড়িকা খেল

আয়ারামের খেল, ও ভাই
গয়ারামের খেল কী!
চকিতে ঘটিয়ে দিল
ভোজবাজি ভেল্‌কি।

বাঘসওয়ার

বাঘের পিঠে চড়নদার
ও যে তোমার মরণদ্বার।
মরণ তো নয়, নির্বাচন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাতে হেরে নির্বাসন
বাঘের সঙ্গে চালাকি
বোঝ এখন জ্বালা কি।

বিনুর লেখা প্রথম বইয়ের নাম ছিল 'তারুণ্য' (১৯২৮)। দেখি গভীর রাতে সেই হারিয়ে যাওয়া বইটি জ্যোৎস্নায় দীপশিখার মতো জ্বলছে। 'তারুণ্য ধর্ম'-তে সে লিখেছিল, 'কাঁচা চুলকে উপড়ে দিলে বাজে কিন্তু বাধে না, কাঁচা চুলকে পাকিয়ে দিলে সর্বনাশ।' বিনু বুঝেছিল, মরার বাড়া দুর্গতি আছে, সে-দুর্গতি জরা। এ-দুর্গতির অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ছদ্মনাম, অনেক ছদ্ম-লক্ষণ।

আমাদের জরার বিরুদ্ধে বিনুর সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল তার ছড়া।

৩১ জানুয়ারি ২০১৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬৪

Caught in that sensual magic all neglect
Monuments of unageing intellect.
(Sailing to Byzantium)

অতলান্তিকের তীরে ভেসে এসেছে একটি ভাঁজ-করা, কচ্ছপের খোলসের সূক্ষ্ম ফ্রেমের চশমা, কালো রিবন জড়ানো।

ওপরে অনন্ত আকাশ, নীচে বালুকাবেলা জুড়ে একটি নির্জন চশমা! সামনে সমুদ্রের নীল মরুভূমি।

দূরে বসে আছেন একা, ভেলভেটের কোটের বোতাম খোলা। ডাবলিউ বি ইয়েট্স (১৮৬৫-১৯৩৯)। মহাকাল, চারপাশের এই ক্লান্তিহীন গোধূলিসন্ধির নৃত্যের মধ্যে তুমি ওঁকে চিনতে পারোনি! পশ্চিমের এক অস্থির, একাকী, নিরাপত্তাহীন মুহূর্তে তিনি দুই তালুতে আগলে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন প্রেমের প্রদীপ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘূর্ণিঝড় যা নেভাতে পারেনি।

ইয়েট্স কি ইংরেজি সাহিত্যের শেষ রোমান্টিক? তিনি কি প্রথম আধুনিক? এক অনির্বচনীয় মিস্টিক? তিনি কি বিশ শতকের কবি, না উনিশ শতকের? আশ্চর্য এক ধোঁয়ার মানুষ, কোনও পূর্বনির্ধারিত বৃত্তে যাঁকে ধরা যায় না!

টি এস এলিয়ট যখন সারাজীবনে একটিও প্রেমের কবিতা লেখেননি, সাতাশ বছর বয়সে রচিত আইরনিদষ্ট 'জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেম-সংগীত' ছাড়া, তাঁর 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' তো প্রেমের ধ্বংস স্তূপ, সেখানে ইয়েট্স কী করে ভালবাসায় অনুরণিত, মন্দ্রিত হয়ে রইলেন সারাজীবন!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Wine comes in at the mouth
And love comes in at the eye:
That's all we shall know for truth
Before we grow old and die.
I lift the glass to my mouth,
I look at you, and I sigh.

(A Drinking Song)

সমুদ্রতীরে একটি ক্যালেন্ডারের পাতা খুলে যাচ্ছে। যা ১৮৬৫ অবধি পিছিয়ে স্থির মোমবাতির মতো জ্বলতে লাগল। অর্থাৎ তিনি ইংরেজি কবিতায় আধুনিকতার অন্য দুই পুরোহিত এজ্‌রা পাউন্ড আর টি এস এলিয়টের চেয়ে কুড়ি আর তেইশ বছরের বড়! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তিনি রম্যাঁ রলাঁর চেয়ে কয়েক মাসের বড়, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র চার বছরের ছোট! এক বছরের মধ্যে জন্ম নেবেন তুলুজ-লোত্রেক, মাক্স ওয়েবার আর কামিই ক্লোদেল। ছাপা হবে বোদল্যের-এর নিষিদ্ধ কবিতাগুচ্ছ 'লে জেপাভ'। মালার্মের চেয়ে তেইশ বছরের ছোট, আর রিলকের চেয়ে দশ বছরের বড়। তাঁর জন্মের সময় র‍্যাঁবোর বয়স মাত্র ছয়। গভীর রাতে আমি আশ্চর্য বিস্ময়ে ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠার দিকে চেয়ে থাকি!

রূপবান এই আইরিশ তরুণ আয়ারল্যান্ডের স্যান্টিমাউন্টে লেখাপড়া করে চলে আসেন লন্ডনে। আর্ট স্কুলের ছাত্র ছবির তুলি নামিয়ে হাতে তুলে নিলেন কলম। কবিতাই তাঁর ক্যানভাস। স্বদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শামিল হওয়ার পাশাপাশি মাটি থেকে রস শুষে এক নতুন সাহিত্যভাষা, বিশেষত নাট্যভাষ্য গড়তে চাইলেন তিনি। আইরিশ পুরাণ ও উপকথা তাঁকে দিশা দেখাল। তাঁর প্রিয় কবি ব্লেক, স্পেন্সার আর শেলি, আর কয়েকজন চিত্রশিল্পী-কবি, যাঁরা 'প্রি-র‍্যাফেলাইট' নামে খ্যাত। তাঁর পাঠচর্চা থেকে আমি ইয়েট্‌স-কে বুঝতে চাইছি আজ এই মাঘসংক্রান্তির রাতে।

ব্লেক, স্পেন্সার আর শেলি-র কবিতার শিশিরশরীর ছুঁয়ে আমি এক পথদ্রষ্টা আধুনিক কবির প্রথম পর্বের সূক্ষ্ম ভঙ্গুর সৌন্দর্যকে ডানা মেলতে দেখি। 'I would that we were, my beloved, white birds on the foam of the sea!/We tire of the flame of the meteor, before it can fade

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

and flee...' ফরাসি দেশে 'সিম্বলিস্ট'-দের হাতে যখন কবিতা অন্তর্মুখী হল, তখন ১৮৯৪ সালে আমি দেখতে পাচ্ছি প্যারিসের লেফ্‌ট ব্যাঙ্কে রু্য স্যাঁ-জ্যাক-এর এক চিলেকোঠায় ভের্লেন-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন উনতিরিশ বছর বয়সি ইয়েট্‌স! প্রতীকবাদী কবিতার সেরা সুরস্রষ্টার কাছে কী মন্তর নিচ্ছেন তিনি? না, মালার্মের সঙ্গে ইয়েট্‌সের দেখা হয়নি। তিনি তখন লন্ডনে।

কবিতার আন্দোলনের শহর প্যারিসে যেতে গিয়ে চশমা হারিয়ে ফেলেছিলেন ইয়েট্‌স। মডার্নিজ্‌মের রাজধানীতে সাংস্কৃতিক ফসিলের ওপর প্রথম আঘাত হেনেছে যে-দেশ, সেখানে তিনি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন নতুন সৃষ্টির পথরেখা। আমি অবাক হয়ে দেখছি এক স্বপ্নিল ব্লেক ও স্পেন্সারপন্থী প্রি-র‍্যাফেলাইটের ক্রমশ 'মর্ডানিস্ট' হয়ে ওঠার ছবি।

এক বিস্ফোরণের সন্ধে।

প্রতীকবাদের বিখ্যাত নাটক 'আক্সেল'-এর রচয়িতা ভিলিয়ে দ্য লিল-আদাম-এর সঙ্গে প্যারিসের 'তেয়াত্র দ্য লা গেতে'-তে আলফ্রেদ জারির লাগামছাড়া উদ্ভট নাটক 'উ্যব্যু রোয়া'-র (রাজা উ্যব্যু) প্রথম শো দেখতে এসেছেন ইয়েট্‌স। সেই নাটক বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে অ্যাবসার্ড থিয়েটারের প্রধান পূর্বসূরি বলে গণ্য হবে। ইয়েট্‌সের রক্তমোক্ষণ হল সেই আবিষ্কারের সামনে।

তিনি এঁদের অপূর্ব দুঃসাহসিকতায় আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। ১৯০৮ সালে ফরাসি সিম্বলিস্টদের সঙ্গে পরিচয় যেমন টি এস এলিয়ট নামে কুড়ি বছর বয়সি এক মার্কিন তরুণের জীবন বদলে দেবে দেড় দশক পরে তেমন বারবার প্যারিস-যাত্রা আশিরনখ বদলে দিচ্ছে এক আইরিশ গীতিকবিকে।

কবিতা ও কাব্যনাট্য দিয়ে মৃত্যু-অন্ধকারেও অনন্তকে ছোঁয়া যায়! আর 'ইশারা' ('la suggestion'), যেমন বলেছেন নতুন কাব্যভাষার দার্শনিক স্তেফান মালার্মে। ১৮৯০-এর দশকে শতাব্দী-শেষের অবসাদের মধ্যে এক আইরিশ জাতীয়তাবাদী নতুন পথ খুঁজছেন দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য। জন মিলিংটন সিঙ্গ নামে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের এক বিদগ্ধ তরুণকে পাঠালেন অ্যারান আইল্যান্ডে স্বদেশের শিকড়সন্ধানে। এদিকে মড গন নামে এক জাতীয়তাবাদী আইরিশ নারীর প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছেন, যে-মুগ্ধতা দুই দশকের বেশি তাঁকে মোহিত করে রাখবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮৮৯ সালে জাতীয়তাবাদী কর্মী মড গনের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন ইয়েট্সের বয়স চব্বিশ, মড গন আঠেরো মাসের ছোট। এই আশ্চর্য প্রেম সারাজীবন তাঁর জীবন ও কবিতাকে প্রভাবিত করবে। ১৮৯১ সালে ইয়েট্স বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং প্রত্যাখ্যাত হন। ১৮৯৯, ১৯০০ এবং ১৯০১ সালেও মড গন আবার ইয়েট্সের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এবং ইয়েট্স-কে আঘাত দিয়ে ১৯০৩ সালে বিয়ে করেন আরেক আইরিশ জাতীয়তাবাদীকে, যদিও তা অচিরে ভেঙে যায়। অলিভিয়া শেক্সপিয়রের সঙ্গে নব্বইয়ের দশকে তিন বছর প্রেমের সম্পর্ক ছাড়া ইয়েট্স মডকেই সঁপেছিলেন তাঁর জীবন। পরে একান্ন বছর বয়সে তিনি জর্জি হাইড লিস নামে অর্ধেক বয়সের এক তরুণীকে বিয়ে করেন। মড গনের সঙ্গে ইয়েট্সের ক্ষণিক মিলন হয় ১৯০৮ সালে। মড মনে করেছেন, তাঁর প্রত্যাখ্যানের জন্য ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে!

ব্লেক ও স্পেন্সার তাঁর শিল্পীমন তৈরিতে সাহায্য করেন, যেমন আইরিশ পুরাণ আর উপকথা। 'প্রতীকবাদী কবিতা' তাঁকে বহুকৌণিক করে তুলল, আধুনিকতার সমুদ্রঢেউ তাঁকে বাস্তবের কাছে টেনে আনল। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আয়োজন এবং কবিতা ও নাটকে ধারাবাহিক আত্মনির্মাণ ইয়েট্স-কে করে তুলেছিল স্বতন্ত্র। ১৮৯৯ সালে আইরিশ নাট্য আন্দোলনের পীঠস্থান অ্যাবে থিয়েটারক প্রতিষ্ঠা করলেন ইয়েট্স লেডি গ্রেগোরি ও অন্যান্যদের সঙ্গে।

তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল। ব্লেক তাঁকে দিয়েছিলেন তন্ময় ভাবুকতা আর প্রফেট-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। এবার নতুন প্রজন্মের হিউম আর এজরা পাউন্ডদের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনলেন তিনি। নতুন কবিদের মতো তিনিও চাইলেন চূর্ণ্যমান পৃথিবীর কথা লিখবেন নতুন এক ভাষায়। পুরনো জগৎ মুখ থুবড়ে পড়ছে, সামনে নতুন এক ধূসর পৃথিবী। সরলরৈখিক সেকেলে কাব্যকে বিদায় করার সময় হয়েছে। কথন-কাঠামো চুরমার করা হচ্ছে। ফ্রয়েডের প্রভাবে মনের অতল থেকে এক অজানা উপমহাদেশ উঠে আসছে ওপরে। ইয়েট্স তাঁর কবিতা-জীবনের তৃতীয় পর্বে পৌঁছলেন। আধুনিক যুবকরা প্রথমে তাঁকে গ্রাহ্যই করেননি ('He didn't fit into the scheme.' এলিয়ট), এবার স্তম্ভিত হলেন।

ইয়েট্সের নতুন কবিতা প্রবলভাবে রণায়িত নাটকে। 'In the Seven

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Woods' (১৯০৪) থেকেই তাঁর কবিতা বদলে যাচ্ছিল। 'The Green Helmet' (১৯১০) ও 'Responsibilities' (১৯১৪)-এ তা আরও স্পষ্ট হল। পরবর্তী পর্যায়ে তা পৌঁছল এক ছুরির ফলার মতো ধারালো অথচ রূপবিভাময় কাব্যভাষায়। সংক্ষিপ্ততায়, গভীরতায়, আত্মখননে তা তাঁকে এক মুহূর্তে সকলের আগে বসিয়ে দিল।

কোথায় তাঁর শক্তির উৎস? পাত্রিক রাফ্রোয়াদি লিখেছেন, 'He did not see anything... he wanted to see 'through' things.' একদিকে ঈগল-চোখ, অন্যদিকে এক মুক্ত মন, যা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়:

> Rabindranath Tagore, like Chaucer's forerunners, writes music for his words, and one understands at every moment that he is so abundant, so spontaneous, so daring in his passion, so full of surprise... As the generations pass, travellers will hum them on the highway and men rowing upon rivers. Lovers, while they await one another, shall find, in murmuring them, this love of God a magic gulf wherein their own more bitter passion may bathe and renew its youth.

তিনি মোহিনীমোহন চ্যাটার্জির প্রভাবে পুরাণ ও উপনিষদ পড়েছেন, যতই তার ভারত-প্রেম অডেনের মতো তরুণেরা পাগলামি মনে করুন।

শেষ কবিতাগুলোতে জ্বলছে বরফের আগুন। 'What is this flesh I purchased with my pains... আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতালাভের পরই ১৯২৩ সালে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁকে দিল অর্থ। ঈশ্বর জানেন, টাকার কতটা প্রয়োজন ছিল তাঁর।

তিনি আধুনিকতার এক পুরোধা হয়েও আরও কিছু। রবীন্দ্রনাথের মতো? উনিশ শতকে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন। সেই শতাব্দীর আবিষ্কার ও বিহ্বলতা তাঁর শিকড় ছুঁয়েছিল। তিনি যখন গভীর প্রজ্ঞায় লেখেন: 'All changed, changed utterly:/A terrible beauty is born' (Easter 1916), অথবা 'What is past, or passing, or to come' (Sailing to Byzantium)—জীবনানন্দের ভাষায়, 'যা হয়েছে, যা হতেছে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যা হওয়ার নয়'— তখন তা এক মহাসময়ে বোধিবৃক্ষের নীচে কবিতাকে প্রোথিত করে।

তাঁর কবিতার ওই অপরূপ প্রবাল রঙের আলো তো আসলে বিশ শতকের এক হিংস্র ও বিপন্ন সময়ে সুন্দরের অভ্যর্থনা।

সমুদ্রের জলে ভেসে আসা তাঁর চশমার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি, বালিতে লেখা আছে:

How can I, that girl standing there,
My attention fix
On Roman or on Russian
Or on Spanish politics?
Yet he is a travelled man that knows
What he talks about,
And there's a politician
That has read and thought
And maybe what they say is true.
Of war and war's alarms,
But O that I were young again
And held her in my arms.!
(Politics)

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্দেশিকা

অড্রি হেপবার্ন (১৯২৯-১৯৯৩) ১৫৮
অনরে দ্য বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০) ২৬, ২৪৬
অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) ৮০, ১১১, ১২৮-১৩৩, ২৮৪, **৩৬৪-৩৭৩**
ছড়া ৩৬৪-৩৭৩
'বিনুর বই' ১২৮, ১৩০, ১৩৩
'সত্যাসত্য' ১২৮, ১২৯, ১৩০, ৩৬৪
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) ৮০, **২০৯-২১৬**
অজন্তার শিল্প ২০৯
কুটুম-কাটাম ২১০
'ক্ষীরের পুতুল' ৮০, ২০৯
বাগেশ্বরী বক্তৃতা ২০৯
'বুড়ো আংলা' ২০৯
অজু দত্ত (১৮৫১-১৮৬৫) ৯৭
অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) ২৬৪, ২৬৮
অমিয় দেব (১৯৩৪-) ৩৪৯
অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০) ৮, ১১, **১২১-১২৭**, ১৩৯, ১৯০, ১৯২, ২০০, ৩২০, ৩২২, ৩২৩, ৩৩০, ৩৫৫
অরুণেন্দু নন্দী ১১০
অরু দত্ত (১৮৫৪-১৮৭৪) **৯৭-১০০**
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-) ২৮, ৩৪৭
অলডাস হাক্সলি (১৮৯৪-১৯৬৩) ১৯৯, ২০৪
অশোক বসু (১৯৩৬-২০০৪) ২৯৫
অসকার ওয়াইল্ড (১৮৫৪-১৯০০) ২৪৬, ২৫২
অ্যাডল্‌ফ্ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) ২৯৯
অ্যানি প্লেডেন (১৮৮০-১৯৬৭) ২২৩
অ্যান্ড্রু এলিয়ট (১৭১৮-১৭৭৮) ২০৩
অ্যালগেরনন চার্লস সুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯) ২৪৭
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) ৬২
অ্যালবার্ট সোয়াইৎসার (১৮৭৫-১৯৬৫) ৬২
অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ (১৯২৬-১৯৯৭) ২৩৮

আঁতোন্যাঁ আর্তো (১৮৯৬-১৯৪৮) ৭৬
আঁদ্রে জিদ (১৮৬৯-১৯৫১) ২১, ২৭, ৬২, ১৪৪, ২০৪, ২৩১, ৩০০, ৩০১
আঁদ্রে ফ্রেনো (১৯০৭-১৯৯৩) ৭০
আঁদ্রে বিলি (১৮৮২-১৯৭১) ২১৯
আঁদ্রে ব্রতঁ (১৮৯৬-১৯৬৬) ৭৬, ২১৯, ২২২
আঁদ্রে মালরো (১৯০১-১৯৭৬) ৬২
আঁদ্রে শেনিয়ে (১৭৬২-১৭৯৪) ৯৯
আঁরি (আল্যাঁ) ফুর্নিয়ে (১৮৮৬-১৯১৪) ২০৪
আঁরি বের্গসন (১৮৫৯-১৯৪১) ২০৩, ২০৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আঁরি মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪) ২১৮
আঁরি মিশো (১৮৯৯-১৯৮৪) ১৬৭, ১৯৩, ৩২৫, **৩৫৩-৩৫৭**
আঁরি 'দুয়ানিয়ে' রুসো (১৮৪৪-১৯১০) ২১৮
আকিরা কুরোসাওয়া (১৯১০-১৯৯৮) ১৫৮, ১৬০
আদলফো বিওই কাসারেস (১৯১৪-১৯৯৯) ৫
আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪) ২৯০
আন্তন চেখভ (১৮৬০-১৯০৪) ২৮৩, ২৮৫
আন্তনিও উবের ১১১
আপোলোনি সাবাতিয়ে (১৮২২-১৮৯০) ৩১৭
আমেদেও মদিল্লিয়ানি (১৮৮৪-১৯২০) ১০৩, ১০৬
আরিস্ততল (৩৮৪ খ্রি.পূ.-৩২২ খ্রি.পূ.) ২৪
আর্তুর শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) ১৭৫, ২৩৯, ২৪২, ২৫৩, **২৬০-২৬৩**, ৩৩৪
'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল অ্যান্ড আইডিয়া' ২৪১, ২৬১
আর্তুর র‍্যাঁবো (১৮৫৪-১৮৯১) ৩৭, ৭৭, ৮৬, ৮৯, ১২৪, ১২৫, ১৪৪, ১৮৯, ২২২, ৩১০, ৩১৪, ৩২০, ৩৫৬
'নরকে এক ঋতু' ৮৬, ৩৫৬
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১) ১০৬, ২৩৭
আর্লেৎ এলকাইম-সার্ত্র (১৯৩৫-) ২৭৭
আলফঁস দোদে (১৮৪০-১৮৯৭) ৬৩
আলফঁস দ্য লামার্তিন (১৭৯০-১৮৬৯) ৯৯, ৩২৫
আলফ্রেদ জারি (১৮৭৩-১৯০৭) ২১, ৬৮, ৭৬, ৭৭, ৩৫৬, ৩৭৬
আলফ্রেদ দ্য পোয়াতভ্যাঁ (১৮১৬-১৮৪৮) ২৪৮
আলফ্রেদ দ্য ভিন্যি (১৭৯৭-১৮৬৩) ৬৩, ১৪৫
আলফ্রেদ দ্য ম্যুসে (১৮১০-১৮৫৭) ২৪৬
আলবের্তো জাকোমেত্তি (১৯০১-১৯৬৬) ২০৪
আলব্যের কাম্যু (১৯১৩-১৯৬০) ২, ২৪, ২৭, ৬২, ১৬৭, ৩২৫
আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) ২৫
আলেকসাঁদ্র্ দ্যুমা (১৮০২-১৮৭০) ২৭, ১৪৫
আলেকসান্দ্র পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭) ৩২৯
আলোয়াজিয়্যুস বেরত্রাঁ (১৮০৭-১৮৪১) ১২৪
আল্যাঁ রব-গ্রিয়ে (১৯২২-২০০৮) ২, ৩, ৪, ৫
'ভোয়াইয়র' ৪
আল্যাঁ রেনে (১৯২২-২০১৪) ২, ৫

ই ই কামিংস (১৮৯৪-১৯৬২) ৩৪৯
ইগর স্ত্রাভিনস্কি (১৮৮২-১৯৭১) ২৯১
ইঙ্গগ্রাম ফ্রিজার (?-১৬২৭) ৪৬, ৫০
ইঙ্গমার বার্গম্যান (১৯১৮-২০০৭) ২৪
ইতালো কালভিনো (১৯২৩-১৯৮৫) ২৪, ১৬০
ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩-১৯৬০) ৮০
ইভ তাঁগি (১৯০০-১৯৫৫) ১৯৪
ইভ বন্‌ফোয়া (১৯২৩-) ২৭
ইভান সের্গেইভিচ তুর্গেনিভ (১৮১৮-১৮৮৩) ৬২, ২৪৮
ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) ৩৮, ১৩৬, ২৪২, ২৬১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উইলিয়াম উইলসন হান্টার (১৮৪০-১৯০০) ১০০, ১০১
উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৯০
উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস (১৮৮৩-১৯৬৩) ২৩৫
উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) ৭৯, ৮০, ৯৭
উইলিয়াম গডউইন (১৭৫৬-১৮৩৬) ৩৬, ৯১
উইলিয়াম গ্যালাচার (১৮৮১-১৯৬৫) ৩০৯
উইলিয়াম জেম্‌স্ (১৮৪২-১৯১০) ৩৩৬
উইলিয়াম জোন্‌স্ (১৭৪৬-১৭৯৪) ২৯৯
উইলিয়াম ফক্‌নার (১৮৯৭-১৯৬২) ৩
উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭) ৯০, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭
উইলিয়াম হ্যাজলিট (১৭৭৮-১৮৩০) ৩৯
উইলিয়ম শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬) ৭, ২৪, ২৭, **৩০-৩৪**, ৩৫, ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৯, ৬০, ৬১, ৯৫, ১১৬, ১৩৪, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৪, ১৬০, ১৭৪, ১৮৯, ২৩৬, ২৫৮, ৩৭৭
'কিং লিয়ার' ২৫৮
'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ৩২
'ম্যাকবেথ' ২৮
'রিচার্ড দ্য থার্ড' ৩৩, ২৫৮
'হেনরি দ্য ফোর্থ' ৩২
'হ্যামলেট' ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৬০, ৬১, ২৬১, ৩১১
উনা ওনিল চ্যাপলিন (১৯২৫-১৯৯১) ১৭৯
উপনিষদ ২০৭, ৩৭৮
উরুৎচেনিচ ৩২৮

এউরিপিদেস (আনুমানিক ৪৮০ খ্রি.পূ.-আনুমানিক ৪০৬ খ্রি.পূ.) ১৩৫
এক্‌তর বেরলিওজ় (১৮০৩-১৮৬৯) ১৪৫
এজ়রা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২) ১০৬, ২০৫, ২২৯, **২৩৩-২৩৮**, ৩০১, ৩৭৫, ৩৭৭
'দে জ়িমাজিস্ত' ২৩৬
'দ্য স্পিরিট অফ রোম্যান্স' ২৩৬
'হিউ সেলউইন মবারলি' ২৩৭
এডওয়ার্ড টমসন (১৯২৪-১৯৯৩) ২৫
এডওয়ার্ড রায়ান (১৭৯৩-১৮৮৫) ৯৯
এডওয়ার্ড হল (১৪৯৭-১৫৪৭) ৩১
এডগার অ্যাল্যান পো (১৮০৯-১৮৪৯) ২১, ৪০, ৮৯, **১১৫-১২০**
'দ্য পারলয়েন্ড লেটার' ১১৯
'দ্য র‍্যাভেল' ১১৬, ১১৮
'দ্য ফল অফ দ্য হাউস অফ আশার' ১১৯
এডমান্ড গস্ (১৮৪৯-১৯২৮) ২২, ১০১
এডমান্ড স্পেন্সর (১৫৫২/৩-১৫৯৯) ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭
এদগার দ্যগা (১৮৩৪-১৯১৭) ২১, ৫২, ১৮৯
এদমঁ দ্য গঁকুর (১৮২২-১৮৯৬) ২৪৮
এদুয়ার মানে (১৮৩২-১৮৮৩) ২১, ১১৫, ৩১০, ৩১৩
এফ আর লিভিস (১৮৯৫-১৯৭৮) ৩৩৪
এফ এস ফ্লিন্ট (১৮৮৫-১৯৬০) ২৩৬
এমিল জ়োলা (১৮৪০-১৯০২) ২৪৮, ৩৬৬
এমিল দুর্কহাইম (১৮৫৮-১৯১৭) ২৪৬
এমি লোয়েল (১৮৭৪-১৯২৫) ২৩৬
এরিক রোমের (১৯২৯-২০১০) ২
এরিক [illegible] (১৮৮৬-১৯২৫) ২১৮-২১৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর্নস্ট হফ্‌মান (১৭৭৬-১৮২২) ২৩৯
এলসা ত্রিয়োলে (১৮৯৬-১৯৭০) ৩৩০
এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (১৮০৬-১৮৬১) ৩৩৯

ওগ্যুস্ত কঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) ৪৩, ২৪৯
'কোর্স অন পজিটিভ ফিলজফি' ৪৩
ওগ্যুস্ত দোজঁ (১৮২২-১৮৯০) ৩১১
ওগ্যুস্ত পুলে-মালাসি (১৮২৫-১৮৭৮) ৩১৩
ওগ্যুস্ত রদ্যাঁ (১৮৪০-১৯১৭) ২৯৬
ওগ্যুস্ত র‍্যানোয়ার (১৮৪১-১৯১৯) ২১
ওটো ফন বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) ২৪৪
ওতার দ্য ব্রাগার (১৮০৮-১৮৭৬) ৩১৬
ওভিদ (৪৩ খ্রি.পূ.-১৭/৮ খ্রি.) ৪৮
ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯-১৮৯২) ২২৯, ৩২০
ওরাস ফিনালি (১৮৭১-১৯৪৫) ২৯০

কঁৎ দ্য লোত্রেয়ামঁ (১৮৪৬-১৮৭০) ৩৫৬
কনফুশিয়াস (৫৫১ খ্রি.পূ.-৪৭৯ খ্রি.পূ.) ২৫৬, ২৫৯, ২৮৩
কনস্তাঁত্যাঁ ব্রাঁকুসি (১৮৭৬-১৯৫৭) ২৪৬
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০১) ৩০৯
কসিমা ভাগ্‌নার (১৮৩৭-১৯৩০) ২৪৩
কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ১২৩, ১৯৩
কামিই ক্লোদেল (১৮৬৪-১৯৪৩) ৩৭৫
কামিই পিসারো (১৮৩০-১৯০৩) ২১, ৬৪
কারাভাজ্জো (১৫৭১-১৬১০) ৫২
কার্দিনাল দ্য রেৎস (১৬১৩-১৬৭৯) ১৭৬
কার্দিনাল রিশলিও (১৫৮৫-১৬৪২) ১৭৫
কার্ল ফন গেরসডর্ফ (১৭৬৫-১৮২৯) ২৪০
কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ২৪
কার্ল শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯) ২৬
কার্ল স্পিটলার (১৮৪৫-১৯২৪) ৬২
কার্ল স্যান্ডবার্গ (১৮৭৮-১৯৬৭) ১৫৯, ২২৫-২৩২
কার্লোস ফুয়েন্তেস (১৯২৮-২০১২) ২৪৬
কালদেরন (১৬০০-১৬৮১) ৯৩
কালিদাস ৩১
'মেঘদূত' ৮০
'শকুন্তলা' ৮০, ১১১
কালিদাস নাগ (১৮৯২-১৯৬৬) ৬৬, ২৩৭, ২৯৮, ২৯৯
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ৪২
ক্যারল চ্যাপেক (১৮৯০-১৯৩৮) ৩০৯
ক্রিস্টফ ভিলিবাল্ট গ্লুক (১৭১৪-১৭৮৭) ৬৪
ক্রিস্টোফার মার্লো (১৫৬৪-১৫৯৩) ৪৬-৫১, ১৪৯, ১৫০
'ট্যাম্বারলেন' ৪৮, ৪৯
'ডক্টর ফসটাস' ৪৮, ৫০-৫১
'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড' ৪৮
'দ্য জু অফ মালটা' ৪৮, ৪৯
'দ্য ট্র্যাজেডি অফ ডিডো, কুইন অফ কার্থেজ' ৪৮
'ম্যাসাকার ইন প্যারিস' ৫০
'হিরো অ্যান্ড লিয়েন্ডার' ৪৬, ৪৮
ক্লারিস বাদের (১৮৪০-১৯০২) ৯৭, ৯৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্লোতিল্‌দ ব্রেয়াল (১৮৭০-১৯৪৭) ৬৪, ২৯৮
ক্লোদ দ্যব্যুসি (১৮৬২-১৯১৮) ২১, ২৭৭, ২৮৭
ক্লোদ পিশোয়া (১৯২৫-২০০৪) ৩১১, ৩১৩
ক্লোদ মনে (১৮৪০-১৯২৬) ২১
ক্লোদ শাব্‌রল (১৯৩০-২০১০) ২
ক্লোদ সিমঁ (১৯১৩-২০০৫) ২, ৪
ক্ষিতীশ রায় (১৯১১-১৯৯৫) ৮০

গটফ্রিড ভিলহেল্‌ম্‌ লাইব্‌নিৎস (১৬৪৬-১৭১৬) ১০, ১১
গায়েতাঁ পিকঁ (১৯১৫-১৯৭৬) ৩, ১৯৫, ৩২৫
গাস্তঁ মোগ্রা (১৮৫০-১৯২৭) ১০
গিয়োম আপোলিনের (১৮৮০-১৯১৮) ৭৬, ৭৭, ১০৩, ১৯৩, ২০৪, **২১৭-২২৪**, ২৪৬, ২৫৯
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২০-১৮৫৮) ২০৯
গীতা সেন (১৯৩০-) ৩০৯
গী দ্য মপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩) ৬৩, ২১৯, **২৪৬-২৫০**
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২০-১৮৫৪) ২০৯
গেয়র্গ ভিলহেল্‌ম্‌ ফ্রিডরিশ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) ১৩৬, ২৪৩, ২৬১, ২৬২
গোবিন চন্দ্র দত্ত (১৮২৮-১৮৮৪) ৯৬, ৯৭, ৯৯
গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস (১৯২৭-২০১৪) ২৪, ২৫
গ্যস্তাভ কুর্‌বে (১৮১৯-১৮৭৭) ৮৯
গ্যস্তাভ ফ্লবের (১৮২১-১৮৮০) ৬৩, ৮৯, ১৩৭, ১৩৮, ২৪৮, ২৪৯, ২[illegible]২, [illegible]
'মাদাম বোভারি' ২৪৭
গ্যস্তাভ্‌ কান (১৮৫৯-১৯৩৬) ২১
গ্রেগরি রাবাসা (১৯২২-) ২৫

চতুর্দশ লুই (১৬৩৮-১৭১৫)
চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) ২৪৪
চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০) ৬৩, ২৫৮
'অলিভার টুইস্ট' ২৫৮
চার্লস ল্যাম্ব (১৭৭৫-১৮৩৪) ৩৬, ৪০
চার্লি চ্যাপলিন (১৮৮৯-১৯৭৭) **১৭৯-১৮৫**, ১৮৬, ১৮৯, ২৫৪, ২৫৫, ৩০৯, ৩৬০

জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) ২৯৮
জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) ২৯৯
জন কীট্‌স (১৭৯৫-১৮২১) ৩৫, ৯০, ৯২, ৯৩, ১১৬, ১৫৫
জন ফেরার ৩৩৪
জন ফোর্ড (১৮৯৪-১৯৭৩) ১৫৮
জন মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪) ৩৯, ১৭৪
জন মিলিংটন সিঙ্গ (১৮৭১-১৯০৯) ৩৭৬
জন রাসকিন (১৮১৯-১৯০০) ২৮৬
'দ্য সেভেন ল্যাম্প্‌স্‌ অফ আর্কিটেকচার' ২৮৬
জন লক (১৬৩২-১৭০৪) ৩৩৩
'অ্যান এসে কনসারনিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং' ৩৩৩
জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ৪৩
জনাথন সুইফ্‌ট্‌ (১৬৬৭-১৭৪৫) ১০, ৩৩৪
'গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স্‌' ১০
'ব্যাট্‌ল্‌ অফ [illegible]কস্‌' ৩৩৪
[illegible] গোস্বামী ([illegible]৪-) ৫৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জরথুস্ত্র (খ্রি.পূ. দশম শতাব্দী) ২৪৪
জর্জ এলিয়ট (১৮১৯-১৮৮০) ২৮৬
জর্জ দে কিরিকো (১৮৮৮-১৯৭৮) ৭৭
জর্জ পিল (১৫৫৬-১৫৯৬) ৪৭
জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০) ১৩৩
'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' ১৩৩
জর্জ ব্রাক (১৮৮২-১৯৬৩) ১০৬, ২১৮
জর্জ সাঁদ (১৮০৪-১৮৭৬) ৩১৮
জাঁ-ইভ তাদিয়ে (১৯৩৬-) ২৮৭
জাঁ-ওগ্যুস্ত-দমিনিক অ্যাঁগ্র (১৭৮০-১৮৬৭) ২৪৬
জাঁ-জাক রুসো (১৭১২-১৭৭৮) ১০৫, ১২৮, ১৭৫, ২৮২, ৩৬৩, ৩৬৪
জাঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০) ২, ৪, ৭, ৬৭, **১৩৪-১৩৯**, ১৬৬, ২৪৫, ২৪৬, ২৫৮, **২৭৬-২৭৯**, ৩২৫
'বিবমিষা' ৪, ১৩৬
সংগীত ২৭৬-২৭৯
'সত্তা ও শূন্যতা' ১৩৬
জাঁ-ফিলিপ রামো (১৬৮৩-১৭৬৪) ৬৪
জাঁ-ফ্রাঁসোয়া দ্যুসি (১৭৩৩-১৮১৬) ২৭
জাঁ-ফ্রাঁসোয়া মিয়ে (১৮১৪-১৮৭৫) ৬৪
জাঁ-বাতিস্ত-সিমেয়ঁ শার্দ্যাঁ (১৬৯৯-১৭৭৯) ৫২
জাঁ-বেরত্রাঁ ল্যফেব্র পঁতালিস (১৯২৪-২০১৩) ১৩৭
জাঁ-ল্যুক গদার (১৯৩০-) ২, ১০৫
জাঁ আনুই (১৯১০-১৯৮৭) ২৫৪
জাঁ কক্তো (১৮৮৯-১৯৬৩) ১০৬, ৩০১, ৩৩০
জাঁ তারদিয়ো (১৯০৩-১৯৯৫) ৭০
জাঁ পলাঁ (১৮৮৪-১৯৬৮) ৩২১
জাঁ ফল্যাঁ (১৯০৩-১৯৭১) ৭০
জাঁ ভেরদ্যনাল (১৮৯০-১৯১৫) ২০৩
জাঁ মেৎসিঙ্গার (১৮৮৩-১৯৫৬) ২১৮
জাঁ রনোয়ার (১৮৯৪-১৯৭৯) ৬৪, ১৫৮, ১৯৪
জাঁ রাসিন (১৬৩৯-১৬৯৯) ১৭৪
জাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪) ২০, ২৪, ২৭, ১১৯, ১৬৭
জাক প্রেভের (১৯০০-১৯৭৭) ১৬৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, **১৯৩-২০২**
জাক লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১) ১১৯
জান দ্যুভাল (আনুমানিক ১৮২০-১৮৬২) ৩১৪, **৩১৫-৩১৮**
জি উইলসন নাইট (১৮৯৭-১৯৮৫) ৩৫
জিওফ্রি চসার (আনুমানিক ১৩৪৩-১৪০০) ১৬০
জিওভান্নি পেরগোলেসি (১৭১০-১৭৩৬) ২৭৭
জিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০) ৭
জিসকার দেস্ত্যাঁ (১৯২৬-) ২৭৯
জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ১৯, ২৪, ৫২, ৫৪, ১৩১, ১৫৪, ১৬৭, ১৯৩, ২৬৯, ২৯৪, ৩৫৮
'বনলতা সেন' ১২০
'বিলাস' ১৮
'মাল্যবান' ৫৪
জুভেনাল (প্রথম শতাব্দী-দ্বিতীয় শতাব্দী) ১৭
জুসেপ্পে গারিবালদি (১৮০৭-১৮৮২) ৬৪
জুসেপ্পে মাৎসিনি (১৮০৫-১৮৭২) ৬৪
জে এম ডব্লু টার্নার (১৭৭৫-১৮৫১) ৫২, ৮৫
জে ডি অ্যান্ডারসন (১৮৫২-১৯২০) ৮০
জেকব এপ্স্টাইন (১৮৮০-১৯৫৯) ২৭২
জেন অস্টেন (১৭৭৫-১৮১৭) ২৫৮, ৩৩৭
'এমা' ২৫৮
জেমস রাসেল লোয়েল (১৮১৯-১৮৯১) ৩৩৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জেমস হুইসলার (১৮৩৪-১৯০৩) ২১, ৬৪
জেম্‌স্‌ জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) ৩, ৪, ৭৬, ১৬০, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৫২, ২৯১, ৩৩৩
'ইউলিসিস' ২৫২, ৩৩৩
'পোর্ট্রেট অফ দা আর্টিস্ট অ্যাজ় আ ইয়ংম্যান' ২৩৫
'ফিনেগান্‌স ওয়েক' ২৫২
জেরার দ্য নেরভাল (১৮০৮-১৮৫৫) ৯৯, ১৪৫, ৩২০
জেরি পিয়েরে ২১৭
জোকোন্দা ১৮৯
জোভান্নি বোক্কাচ্চো (১৩১৩-১৩৭৫) ৩১
'দেকামেরন' ৩১
জোসেফ ওয়াকার ১১৫
জোসেফ কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪) ৮১
জোসেফ স্তালিন (১৮৭৮-১৯৫৩) ৩২২, ৩২৮
জোসেফ হাইড্‌ন (১৭৩২-১৮০৯) ৬৪
জোহান ভোল্‌ফ্‌গাং ফন গ্যোয়েটে (১৭৪৯-১৮৩২) ২৪, ৯৩, ১৩২, ১৭৫, ২৬০, ২৬১, ৩৩৪
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২?-১৯৩৯) ১১০
জ্যুল দ্য গঁকুর (১৮৩০-১৮৭০) ২৪৮
জ্যুল লাফর্গ (১৮৬০-১৮৮৭) ২১, ২০৩, ২০৪
জ্যুল স্যুপেরভিয়েল (১৮৮৪-১৯৬০) ১২৫
জ্যুলিয়্যাঁ গ্রাক্‌ (১৯১০-২০০৭) ১৬৭
জ্যোতিভূষণ চাকী (১৯২৫-২০০৮) ১৯, **১০৯-১১৪**, ২৬৪
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭) ১১১
টম পেন (১৭৩৭-১৮০৯) ৯১, ২৫৯
টম স্টপার্ড (১৯৩৭-) ৭৬
টমাস ওয়ালসিংহ্যাম (আনুমানিক ১৫৬১-১৬৩০) ৪৬, ৫০
টমাস কিড (১৫৫৮-১৫৯৪) ৪৮, ৫০
টমাস কোল (১৮০১-১৮৪৮) ৫২
'দ্য ভয়েজ অফ লাইফ' ৫২
টমাস ডি কুইন্‌সি (১৭৮৫-১৮৫৯) ৪২
'কনফেশন্‌স্‌ অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম-ইটার' ৪২
টমাস নর্থ (১৫৩৫-১৬০৪) ৩১
টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫) ২৮২
টমাস স্টার্নস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) ৮৬, ১০৫, ১২৪, ১৭৫, ১৯৩, **২০৩-২০৮**, ২২৬, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৫২, ২৮৬, ৩২৮, ৩৩৯, ৩৪৭, ৩৬২, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭
'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' ৩৭, ২০৫, ২৩৫, ২৩৭, ৩৩৯, ৩৭৪
'দ্য লাভ সং অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক' ৩২৮
'প্রুফ্রক অ্যান্ড আদার অবজারভেশনস' ২০৪
'বার্নট্‌ নর্টন' ৩৪৭
'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' ২০৭
টি ই হিউম (১৮৮৩-১৯১৭) ২২৯, ২৩৬, ৩৭৭
টিশিয়ান (আনুমানিক ১৪৮৮-১৫৭৬) ৫২

ড. স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-১৭৮৪) ৩৩৪
ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭১-১৮৫৫) ৩৭
ডরোথি শেকস্পিয়র পাউন্ড (১৮৮৬-১৯৭৩) ২৩৬, ২৩৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডাব্লিউ বি ইয়েট্স (১৮৬৫-১৯৩৯) ২৩৬, ৩০১, **৩৭৪-৩৭৯**
'দ্য গ্রীন হেলমেট্' ৩৭৮
'রেস্পন্সিবিলিটিস্' ৩৭৮
'সেইলিং টু বাইজানটিয়াম' ৩৭৪
ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০) ২৩৮
ডেভিড রবিনসন (১৯৩০-) ১৮২
ডেভিড রিচার্ডসন (১৮০১-১৮৬৫) ৯৭

তরুণ মিত্র (১৯২৯-২০১২) ৩৪৯
তরুণ ঘটক (১৯৪০-) ২৭
তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭) **৯৬-১০২**
'আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি' ৯৯
'আ শিফ গ্লিন্ড ইন ফ্রেঞ্চ ফিল্ড্স্' ৯৭, ৯৯
'ল্য জুর্নাল দ্য মাদমোয়াজেল দারভের' ৯৮
তাতিয়ানা তলস্তয় (১৮৬৪-১৯৫০) ২৫৭
তুলসীদাস (আনুমানিক ১৫৩২-১৬২৩) ১১১
'রামচরিতমানস' ১১১
তুলুজ-লোত্রেক (১৮৬৪-১৯০১) ৩৭৫
তেওদোর দ্য বাঁভিল (১৮২৩-১৮৯১) ৩১৩, ৩১৬, ৩১৭
তেওফিল গোতিয়ে (১৮১১-১৮৭২) ৯৯
ত্রিস্তাঁ করবিয়ের (১৮৪৫-১৮৭৫) ২০৪
ত্রিস্তাঁ ৎসারা (১৮৯৬-১৯৬৩) ৭৫, ২৪৬

দমিনিক (ওদেৎ ল্যমর) এল্যুয়ার (১৯১৪-২০০০) ৩২২
দানিয়েল আর্লেৎ ২৯০
দান্তে আলিগিয়েরি (আনুমানিক ১২৬৫-১৩২১) ২৪, ৩১, ৩৫, ৪৯, ৮৬, ৯৩, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২৫৪, ৩১৪, ৩৬২
'দিভিনা কম্মেদিয়া' ২০৪, ২৫৪, ৩১৪
দিয়েগো বেলাসকেস (১৫৯৯-১৬৬০) ৫২, ১৭৪
দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) ২৯৮, ২৯৯
দেবব্রত বিশ্বাস (১৯১১-১৯৮০) ১১১
দেবাশীষ দেব (১৯৫৫-) ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৬
দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ২০৯
দ্যু বেলে (১৫২২-১৫৬০) ৯৯

'ধম্মপদ' ২০৭

নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-) ৩৪৯
নরেন দেব (১৮৮৮-১৯৭১) ৩৪৯
নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) ৩৪৪
নরেশ গুহ (১৯২৪-২০০৯) ৩৪৯
নাতালি সারোৎ (১৯০০-১৯৯৯) ২-৫, ৭
নাদার (১৮২০-১৯১০) ৩১১, ৩১২, ৩১৫
নাসিরুদ্দিন শাহ্ (১৯৪৯/৫০-) ৩০৮
নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-১৮৫২) ৬৩, ২৫৮
নিক্কোলো মাকিয়াভেল্লি (১৪৬৯-১৫২৭) ৪৯
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-) ১৯৮
নীলমণি দত্ত (১৭৫৭-) ৯৭
নোভালিস (১৭৭২-১৮০১) ২৩৯
ন্যাথ্যানিয়েল হথর্ন (১৮০৪-১৮৬৪) ৩৩৭
ন্যুশ এল্যুয়ার (১৯০৬-১৯৪৬) ৩২২

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) (১৮৮০-১৯৬০) ৮০
পল এল্যুয়ার (১৮৯৫-১৯৫২) ৬২, ৭০, ৭২, ৭৬, ৭৮, ১২৪, ১২৫, ১৯৩, ১৯৫, ২৪৬, ২৬৯, **৩১৯-৩২৫**, ৩২৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পল ক্লোদেল (১৮৬৮-১৯৫৫) ১৯, ৬১, ৬৫, ১৪৪, ১৯৩, ২০৪
পল গগ্যাঁ (১৮৪৮-১৯০৩) ২১
পল ভালেরি (১৮৭১-১৯৪৫) ২১, ১১৫, ১১৬, ১৪৪
পল ভের্লেন (১৮৪৪-১৮৯৬) ২১, ২২, ৩৭, ১১৫, ১১৬, ১৪৪, ১৮৮, ১৮৯, ৩১২, ৩৭৬
পল মরিস ৩১৩
পল সেজান (১৮৩৯-১৯০৬) ৫২
পল স্কার্রঁ (১৬১০-১৬৬০) ৯৯
পাওলো ভেরোনেজে (১৫২৮-১৫৮৮) ১৪৯, ১৫০
পাবলো নেরুদা (১৯০৪-১৯৭৩) ৩২৫
পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) ৩১, ১০৩, ১০৬, ২০৪, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২৩, ২২৪, ২৬৪, ২৯১, ৩২০, ৩২৫
'গের্নিকা' ২৬৪
পার্সি বিসে শেলি (১৭৯২-১৮২২) ৩৫, ৮৭, ৯০-৯৫, ১১৬, ৩৭৫
'অ্যাডোনেস' ৯৩
'ওজিম্যান্ডিয়াস' ৯২
'জুলিয়ান অ্যান্ড ম্যাডালো' ৯৩
'টু নেপল্‌স' ৯৩
'টু লিবার্টি' ৯৩
'ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি' ৯৩
'দ্য ক্লাউড' ৯৩
'প্রমেথিউস আনবাউন্ড' ৯০, ৯৩
'স্ট্যান্ডাজ রিট্‌ন্ ইন ডিজেকশন' ৯৩
'হেলাস' ৯৩
পিওতর আলেক্সেইভিচ ক্রপৎকিন (১৮৪২-১৯২১) ২৮৩
পিকো দেল্লা মিরানদোলা (১৪৬৩-১৪৯৪) ৪৯
পিয়ের কর্নেই (১৬০৬-১৬৮৪) ৯৯, ১৭৪
পিয়ের দ্য রঁসার (১৫২৪-১৫৮৫) ১৪৪
পিয়ের রভের্দি (১৮৮৯-১৯৬০) ৭৩, ৭৪, ৭৭, ১২৫, ১৯৩
পুষ্কর দাশগুপ্ত (১৯৪২-) ১০৭, ১৬৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৪
পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩৩-১৯৯৭) ৩৪২
পেগি গুগেনহাইম (১৮৯৮-১৯৭৯) ২৫২
পেট্রুস ফন শেনডেন ৫২
পেনেলোপি ডেভারো (১৫৬৩-১৬০৭) ১৫০
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৭-২০০৭) ৩৪৭-৩৫২
প্রতিমা ঠাকুর (১৮৯৩-১৯৬৯) ৩০৩
প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬) ৮০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ৮০
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) ৩০৩
প্লাতো (৪২৮/৪২৭ অথবা ৪২৪/৪২৩ খ্রি. পূ.-৩৪৮/৩৪৭ খ্রি. পূ.) ২৪, ৯৩, ১৫১
প্লুটার্ক (আনুমানিক ৪৬-আনুমানিক ১২৭) ৩১

ফাদার রবের আঁতোয়ান (১৯১৪-১৯৮১) ৩৫৮
ফাদার দ্যতিয়েন (১৯২৪-) ৭৯-৮৪
ফাল্‌কে গ্রেভিল (১৫৫৪-১৬২৮) ১৫২
ফিওদর দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১) ২৪, ৬৩, ১৬০, ২৪৫, ২৮২, ২৮৫, ২৮৬
ফিলিপ সুপো (১৮৯৭-১৯৯০) ৭৩, ৭৪, ৩০১, ৩২০, ৩২১
ফের্দিনা দা সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৯) ২০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফেলিক্স মেনডেলসন (১৮০৯-১৮৪৭) ৭৬, ২২২
ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড (১৮৭৩-১৯৩৯) ২৩৬
ফ্রাঁসিস পঁজ (১৮৯৯-১৯৮৮) ৬৮, **১৬৭-১৭২**, ১৯৩, ৩২৫
ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো (১৯৩২-১৯৮৪) ২
ফ্রাঁসোয়া দ্য বেলফরে (১৫৩০-১৫৮৩) ৩৩
ফ্রাঁসোয়া ফেনেলঁ (১৫৬১-১৭১৫) ১০
ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁ (১৯১৬-১৯৯৬) ২৫৭
ফ্রাঁসোয়া রাব্‌লে (১৪৮৩ থেকে ১৪৯৪-এর মধ্যে—১৫৫৩) ২২২, ৩৩৪
ফ্রাঁসোয়া রেনে দ্য শাতোব্রিয়াঁ (১৭৬৮-১৮৪৮) ১৪৪
ফ্রান্সিস ওয়ালসিংহ্যাম (আনুমানিক ১৫৩২-১৫৯০) ৪৬
ফ্রান্সিসকো গোইয়া (১৭৪৬-১৮২৮) ৫২, ৩৫৬
ফ্রান্সেসকো পেত্রার্কা (১৩০৪-১৩৭৪) ৪৯
ফ্রানৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) ২৪, ৩৮, ৮১, ২৫২, ৩৫৬
ফ্রানৎস শ্যুবার্ট (১৭৯৭-১৮২৮) ২৬০, ২৭৭
ফ্রিডরিশ নীৎশে (১৮৪৪-১৯০০) ২৪, ২৬, ৬৪, ১৭৫, **২৩৯-২৪৫**, ২৬১, ২৬৩
'ট্র্যাজেডির জন্ম' ২৪২, ২৪৩
'দাস্ স্পেক জরথুস্ট্র' ২৩৯, ২৪৩
ফ্রিডরিশ ভিলহেল্‌ম্ য়োসেফ শেলিং (১৭৭৫-১৮৫৪) ৩৮
ফ্রিডরিশ শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) ৩৮, ২৩৯
ফ্রিৎস মাউটনার (১৮৪৯-১৯২৩) ২৫২
ফ্রেড কার্নো (১৮৬৬-১৯৪১) ১৮১
ফ্রেদেরিক-ফ্রাঁসোয়া শোপ্যাঁ (১৮১০-১৮৪৯) ২৪৬, ২৭৬, ৩৬১
ফ্র্যাঙ্ক কাপ্‌রা (১৮৯৭-১৯৯১) ১৫৮, ১৬০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ২৪, **৪১-৪৫**, ১২৯, ১৬০, ১৭৫
'কমলাকান্ত' ৪১-৪৫
'কৃষ্ণকান্তের উইল' ৪২
'দেবী চৌধুরাণী' ৪২
'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ৪২, ৪৪, ১৭৫
'লোকরহস্য' ৪২, ৪৩
বাঁজাঁম্যাঁ পেরে (১৮৯৯-১৯৫৯) ৭৩
বারুখ স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) ৬০, ১৩৮, ১৭৪
'ট্র্যাক্টেটাস থিওলজিকো পলিটিকাস' ১৭৪
বার্ট হান্সট্রা (১৯১৬-১৯৯৭) ১৬০
বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ৬২, ২৯৬, ৩৩৭
বাল্মীকি ২৪
বাস্টার কিট্‌ন্ (১৮৯৫-১৯৬৬) ২৫৫
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ২৪, ১৩১
বিমল কর (১৯২১-২০০৩) ২৬৬
বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) ১২৩
বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) (১৮৬৮-১৯৪৬) ১৩২
বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ৪০, ৫৪, ১২৩, ৩১৭, ৩৪৯, **৩৫৮-৩৬৩**, ৩৬৫
বেদব্যাস ২৪
'ভগবদগীতা' ৮০, ১১০, ২০৭
[illegible]ন জনসন (১৫৭২-১৬৩৭) ৩০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেনিতো মুস্‌সোলিনি (১৮৮৩-১৯৪৫) ২৯৮, ৩০৩
বেনি লেভি (১৯৪৫-২০০৩) ১৩৮
বেরনার গ্রাসে (১৮৮১-১৯৫৫) ২৮৭
বের্টোল্ট ব্রেশট (১৮৯৮-১৯৫৬) ৩০৮
বোবো মেয়র ৩৪০
ব্রুনো বেটেল্‌হাইম (১৯০৩-১৯৯০) ২৭
ব্লেজ় পাসকাল (১৬২৩-১৬৬২) ১, ১৭৪, ১৭৫, ১৮৮, ২০৭
'পাঁসে' ১৭৪, ১৮৮
ব্লেজ় সাঁদ্রারস (১৮৮৭-১৯৬১) ১০৩-১০৮
'লা প্রোজ দ্যু ত্রাঁসিবেরিয়াঁ এ লা প্যাতিত জেয়ান দ্য ফ্রাঁস' (ট্রান্সসাইবেরিয়ান গদ্য আর ফ্রান্সের ছোট্ট জেয়ান) ১০৫, ১০৬

ভলতের (১৬৯৪-১৭৭৮) ৬-১৭, ২৪, ৭৫, ৯৯, ১২৮, ১৩৮, ১৪৬, ১৭৫, ২৫৮, ৩৬৪
'কাঁদিদ' ৬-১৭
'জাদিগ' ৯
ভারবি ১১১
ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ (১৮৮২-১৯৪১) ৩৩৬-৩৪০
'অরল্যান্ডো' ৩৩৮
'টু দ্য লাইটহাউস' ৩৩৮
'দ্য ওয়েভ্‌স্‌' ৩৩৮
'নিজস্ব এক ঘর' ৩৩৮
'মিসেস ড্যালওয়ে' ৩৩৮
ভাসিলি কাঁদিনস্কি (১৮৬৬-১৯৪৪) ২০৪
ভাসিলি বডকিন (১৮১২-১৮৬৯) ২৮৪
ভিক্‌তর য়্যুগো (১৮০২-১৮৮৫) ৭, ২৪, ৩২, ৬০, ৬২, ৮৯, ৯৮, ৯৯, ১৩৯, ১৪৪-১৪৮, ২৫৮, ২৮২
'নত্র-দাম দ্য পারি' (হাঞ্চব্যাক অফ নত্র-দাম) ১৪৮
'লা লেজাঁদ দ্যু সিয়েক্‌ল্‌' (শতাব্দীর উপাখ্যান) ১৪৮
'লে মিজ়েরাব্‌ল্‌' (দুর্গতেরা) ১৪৭, ১৪৮, ২৫৮, ২৮২
ভিটা স্যাকভিল-ওয়েস্ট (১৮৯২-১৯৬২) ৩৩৮
ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ (১৮৫৩-১৮৯০) ২৩৯
ভিভিয়েন হে-উড এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৪৭) ২০৫
ভিলিয়ে দ্য লিল-আদাম (১৮৩৮-১৮৮৯) ৩৭৬
ভেরমের (১৬৩২-১৬৭৫) ২৯০
ভেলিমির খ্‌লেবনিকভ (১৮৮৫-১৯২২) ৩২৮
ভোল্‌ফ্‌গাং আমাদেউস মোৎসার্ট (১৭৫৬-১৭৯১) ৬৪, ২৭৭
ভ্যানেসা স্টিফেন (১৮৭৯-১৯৬১) ৩৩৭
ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) ২৪, ৭৬, ২৯৬, ৩২৮
ভ্লাদিমির বুরলিউক (১৮৮৬-১৯১৭) ৩২৮
ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি (১৮৯৩-১৯৩০) ৩২৬-৩৩০
'জনরুচির গালে একটি থাপ্পড়' ৩২৮
'পাৎলুন-পরা মেঘ' ৩২৮, ৩৩০

মড গন (১৮৬৬-১৯৫৩) ৩৭৬, ৩৭৭
মরিস ব্লাঁশো (১৯০৭-২০০৩) ৬৮, ২৯১
মরিস মেতেরল্যাঁক (১৮৬২-১৯৪৯) ২১
মরিস রাভেল (১৮৭৫-১৯৩৭) ২৭৭
মলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩) ৮, ১৭৪, ২৪৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাইকেল ড্রেটন (১৫৬৩-১৬৩১) ৪৭
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ৯৭
'মেঘনাদবধ কাব্য' ৮০
মাক্স এর্নস্ট (১৮৯১-১৯৭৬) ৩২০
মাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) ৩৭৫
মাক্স জাকব (১৮৭৬-১৯৪৪) ৭৬, ১২৪, ২১৮
মাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) ৬২, ২৭২, ২৮৩, ২৮৫, ২৯৬
মাক্সিমিলিয়াঁ রবেসপিয়ের (১৭৫৮-১৭৯৪) ৩৬
মাজারিন প্যাঁজো (১৯৭৪-) ২৫৭, ২৫৮
মাদলেন পাজেস (১৮৯২-১৯৬৫) ২২৩
মাদলেন রলাঁ (১৮৭২-১৯৬০) ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০২, ৩০৩
মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ (১৬৩৪-১৬৯৩) ১৭৬, ৩৩৩
মাদাম দ্য সাব্‌লে (১৫৯৯-১৬৭৮) ১৭৬
মাদাম দ্য সেভিন্যে (১৬২৬-১৬৯৬) ২৫, ১৭৬
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৮-) ৩৪৯
মান রে (১৮৯০-১৯৭৬) ৩২৬
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) ১৩১
মারিও সেরভিয়াব্‌ল (১৯৪৯-) ৮৮
মারিয়া কুদাশেভা (মারি রম্যাঁ রলাঁ) (১৮৯৫-১৯৮৫) ২৯৮
মারি লোরাস্যাঁ (১৮৮৩-১৯৫৬) ২১৯
মারি সিটন (১৯১০-১৯৮৫) ৩৪৫
মার্ক শাগাল (১৮৮৭-১৯৮৫) ১০৩
মার্কি দ্য কঁদরসে (১৭৪৩-১৭৯৪) ৯১
মার্কি দ্য সাদ (১৭৪০-১৮১৪) ৭৭, ২১৯
মার্গরিৎ য়্যুরসনার (১৯০৩-১৯৮৭) ৩৩৯
মার্গ্যরিৎ দ্যুরাস (১৯১৪-১৯৯৬) ২, ৫
মার্টিন লুথার কিং (১৯২৯-১৯৬৮) ২৮৫
মার্টিন স্করসিজ় (১৯৪২-) ১৫৮
মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) ১৩৬
'সত্তা ও সময়' ১৩৬
মার্সেল কার্নে (১৯০৬-১৯৯৬) ১৯৪, ১৯৫
মার্সেল দ্যুয়ামেল (১৯০০-১৯৭৭) ১৯৪
মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২) ৩, ৪, ২০৪, ২৪৬, ২৫২, ২৮২, ২৮৬-২৯১, ৩৩৩, ৩৩৮, ৩৬২
'হারিয়ে যাওয়া সময়ের সন্ধানে' ২৮৭
মার্সেল রেমঁ (১৮৯৭-১৯৮১) ৪
মালভিদা ফন মেজেনবুগ (১৮১৬-১৯০৩) ৬৪
মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) ৩১, ৪৯
মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনি (১৯১২-২০০৭) ১৬০
মিগেল দ্য সেরভানতেস (১৫৪৭-১৬১৬) ২৪, ১৬০, ৩৩৪
'দন কিহোতে' ২৭, ৩৩৪
মিলান কুন্দেরা (১৯২৯-) ৮১
মিশেল কঁতা (১৯৩৮-) ১৩৮, ২৭৭
মিশেল দ্য মঁতেন (১৫৩৩-১৫৯২) ৪৯, ১৮৯, ৩৩৪
মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) ২৪
মিশেল ব্যুতর (১৯২৬-) ২
মিশেল লেরিস (১৯০১-১৯৯০) ৭৬
মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) ৮০
'বিষাদ-সিন্ধু' ৮০
মৃণাল সেন (১৯২৩-) ১৮৫, ৩০৬-৩০৯
'আমার চ্যাপলিন' ১৮৫
'একদিন প্রতিদিন' ৩০৯
'পদাতিক' ৩০৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বাইশে শ্রাবণ' ৩০৭
'ভুবন সোম' ৩০৮
মেরি-অ্যান দাশগুপ্ত (১৯৩৭-) ৩৪৯
মেরি ভোলস্টনক্রাফ্‌ট্ (১৭৫৯-১৭৯৭) ৯১
মেরি মার্টিন (১৯১৩-১৯৯০) ৯৬, ৯৯, ১০২
মেরি শেলি (১৭৯৭-১৮৫১) ৯১, ৯২, ৯৪
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ২৮৫, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯
ম্যাক সেনেট (১৮৮০-১৯৬০) ১৮১
ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০০) ২৯৯
ম্যাথু আর্নল্ড (১৮২২-১৮৮৮) ৯১

যামিনী গাঙ্গুলি ১১০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) ৩৬৫
যোহান্নেস ব্রাহ্‌ম্‌স্ (১৮৩৩-১৮৯৭) ২৭৭
য়োয়াকিম ফন সান্ড্রার্ট (১৬০৬-১৬৮৮) ৫২
'রাত্রির অ্যালেগরি' ৫২
য়োহান সেবাস্তিয়ান বাখ (১৬৮৫-১৭৫০) ৬৪, ১৫৯, ২৭৭
য়্যাজেন ইওনেস্কো (১৯০৯-১৯৯৪) ২, ২৪৬
য়্যাজেন গিলভিক (১৯০৭-১৯৯৭) ৫৬, **৬৭-৭১**, ২৬৯
য়্যাজেন দ্যলাক্রোয়া (১৭৯৮-১৮৬৩) ৮৮, ৮৯
য়্যুইসমাঁস (১৮৪৮-১৯০৭) ২১, ৬৮
য়্যুবের লাঁগে (১৫১৮-১৫৮১) ১৫০

রজে কাইওয়া (১৯১৩-১৯৭৮) ২৪৬
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) ৩০৩
রনে শার (১৯০৭-১৯৮৮) ৬৮, ১২৪, ১৯৩, ৩২০
রবার্ট গ্রেভ্‌স্ (১৮৯৫-১৯৮৫) ২৬৮
রবার্ট পলি (১৫৬৮-১৬০২) ৪৬
রবার্ট ফ্রস্ট (১৮৭৪-১৯৬৩) ২৩৫, ২৩৮
রবার্ট বার্টন (১৫৭৭-১৬৪০) ৩৩৪
'দ্য অ্যানাটমি অফ মেল্যাংকোলি' ৩৩৪
রবার্ট শ্যুমান (১৮১০-১৮৫৬) ২৬০, ২৭৭
রবার্ট সাদি (১৭৭৪-১৮৪৩) ৩৬, ৯১
রবিন উড (১৯৩১-২০০৯) ১৫৭, ১৬১, ৩৪২
'অপু ট্রিলজি' ১৫৭, ১৬১
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত (১৯১৫-২০০৯) ১০৯, ২৬৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ২৪, ২৫, ২৮, ২০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৫২, ৬২, ৬৬, ৮০, ১২৯, ১৩২, ১৪৪, ১৪৫, ১৭৩, ২০৯, ২১০, ২৩৭, ২৬৪, **২৭১-২৭৫**, ২৯৬, ২৯৮, ২৯৯, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৭, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭৫, ৩৭৮
'চতুরঙ্গ' ২৯৭
'চিত্রাঙ্গদা' ২০৯
'নৌকাডুবি' ৮০
'বৈকুণ্ঠের খাতা' ২১৪
'লিপিকা' ৮০, ২১৪, ২৭৫
'সোনার তরী' ২৭৫
রবের দেসনস (১৯০০-১৯৪৫) ৭৬
রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ৯৭
রম্যাঁ রলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪) ৭, **৫৮-৬১**, **৬২-৬৬**, ১২৮, ১৩২, ১৪৪, ১৭৯, ২৮৫, **২৯৬-৩০০**, ৩০১-৩০৫, ৩৭৫
'জাঁ-ক্রিস্তফ' ২৮২, ২৯৯
'ডামাডোলের ঊর্দ্ধে' ৬৫
'বিমুগ্ধ আত্মা' ২৯৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রলাঁ বার্ত (১৯১৫-১৯৮০) ২, ২০
রাধিকানাথ বোস ১১০
রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশ (১৯০০-১৯৮১) ২৭৪, ২৭৫, ৩০৩
রানী চন্দ (১৯১২-১৯৬৭) ২০৯, ২১০, ২১৫, ২৭১, ২৭২
রাফায়েল হলিনশেড (১৫২৯-১৫৮০) ৩১
রামকিঙ্কর বেজ (১৯০৬-১৯৮০) ২৭২
রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) ২৯৭, ২৯৯
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) ২৯৮
রামানুজ ৮০
রিশার্ড ভাগ্‌নার (১৮১৩-১৮৮৩) ২১, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৮৯, ২৪২, ২৪৩, ২৬৩, ২৭৭, ২৮৭, ৩১৩
রেমঁ ক্যানো (১৯০৩-১৯৭৬) ৭০
রেমব্রান্ট (১৬০৬-১৬৬৯) ৩১, ৫২, ১৭৪, ৩৬১
রেমি দ্য গুরমঁ (১৮৫৮-১৯১৫) ৩০১

লরেন্স স্টার্ন (১৭১৩-১৭৬৮) **৩৩১-৩৩৫**
'দ্য লাইফ অ্যান্ড ওপিনিয়ন্‌স্‌ অফ ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডি, জেন্টল্‌ম্যান' ৩৩১-৩৩৫
লর্ড বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪) ৩৫, ৩৯, ৯০, ৯৪, ২৯৬
লর্ড রবার্ট বুলওয়ার-লিটন (১৮৩১-১৮৯১) ৯৮
লর্ড রিচ ১৫০
লা ফঁতেন (১৬২১-১৬৯৫) ৬৮, ১৭৫, ২৪৬
লা রোশফুকো (১৬১৩-১৬৮০) **১৭৩-১৭৮**
'মাক্সিম' ১৭৪, ১৭৬-১৭৮
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) ৩১, ৪৯, ১৮৯, ২১৭, ২৫৯
'মোনালিসা' ১৮৯
লিলিয়া ইউরিয়েভনা ব্রিক (১৮৯১-১৯৭৮) ৩২৯
লিলিয়ান স্যান্ডবার্গ (১৮৮৩-১৯৭৬) ২২৬
লি হান্ট (১৭৮৪-১৮৫৯) ৩৬, ৯০, ৯২, ৯৪
লীলা রায় (১৯১০-১৯৯২) ৮০
লুই আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২) ৬২, ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ১৯৩, ২২২, ২৫৮, ২৯৬, ৩২৫, ৩২৯
লুইজ দ্য কোলিন্‌ই-শাতিয়ঁ (১৮৮১-১৯৬৩) ২২৩
লুই নাপোলেয়ঁ (১৮০৮-১৮৭৩) ১৪৬
লুই ফরেস্তিয়ে (১৮৯২-১৯৫৪) ২৪৭
লুই বুইলে (১৮২২-১৮৬৯) ২৪৭
লুডভিগ ফান বেঠোফেন (১৭৭০-১৮২৭) ২৯, ৩১, ৩৫, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ২৬০, ২৭৭, ২৭৮, ৩০০, ৩০৩
লু সালোমে (১৮৬১-১৯৩৭) ২৪৫
লুসিয়া জয়েস (১৯০৭-১৯৮২) ২৫২
লেনার্ড উল্‌ফ্‌ (১৮৮০-১৯৬৯) ৩৩৮, ৩৩৯
লেভ তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) ২৪, ৩১, ৬৩, ৬৪, ২৪৮, ২৫৭, ২৬৩, **২৮০-২৮৫**, ২৯৬, ৩২৯
'আন্না কারেনিনা' ২৮৩, ২৮৪
'ক্রোয়েটজার সোনাটা' ২৮৪
'যুদ্ধ ও শান্তি' ২৮০
লোকনাথ ভট্টাচার্য (১৯২৭-২০০১) ৩৫৬
ল্যকঁৎ দ্য লিল (১৮১৮-১৮৯৪) ২০, ৮৮, ৯৯
ল্যুসিয়্যাঁ পেরে ১০

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-) ৮, ৩৯, ৪৮, ২৫৮, ২৫৯, ৩৫০, ৩৫২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪২
শর্মিলা ঠাকুর (১৯৪৬-) ১৫৮
শান্তিদেব ঘোষ (১৯১০-১৯৯৯) ৮০
শার্ল আসলিনো (১৮২০-১৮৭৪) ৩১৩
শার্ল-ওগুস্ত্যাঁ স্যাঁৎ-বভ্ (১৮০৪-১৮৬৯) ৯৯
শার্ল গুনো (১৮১৮-১৯৯৩) ২৭৭
শার্ল বোদল্যের (১৮২১-১৮৬৭) ২০, ২১, ২২, ২৪, ৪০, ৫৬, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১৪৪, ১৮৯, ১৯৩, ২০৮, ২২২, ২৬১, ২৭৯, ৩০১, **৩১০-৩১৪**, ৩১৬, ৩১৭, ৩২০, ৩২৫, ৩৭৫
শিলাদিত্য সেন (১৯৬৩-) ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১) ৩৪৯

সক্রাতেস (৪৭০/৪৬৯ খ্রি.পূ.-৩৯৯ খ্রি.পূ.) ৭, ২৪, ৪৩, ৬০, ২৪২
সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯) ৫৪, ২৬৭
সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) ৮০, ১৩১
'জাগরী' ৮০
সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) ১৫৪-১৫৯, ১৬০-১৬৫, **২৯২-২৯৫**, **৩৪১-৩৪৬**
'অপরাজিত' ৩৪২
'অশনি সংকেত' ২৯৫
'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ৩৪৩
'দেবী' ৩৪১
'নায়ক' ৩৪২
'পথের পাঁচালী' ১৫৬, ২৯৩, ৩৪২
'প্রতিদ্বন্দ্বী' ২৯৫, ৩৪৫
সফোক্লেস (৪৯৭/৪৯৬খ্রি.পূ.-৪০৬/৪০৫ খ্রি.পূ.) ২৪
সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) ৫৭, ৮৫, ১৮৬
সারা বের্নহার্ট (১৮৪৪-১৯২৩) ২৪৬
সারা হাচিনসন (১৭৭৫-১৮৩৫) ৩৮
সালভাদর দালি (১৯০৪-১৯৮৯) ৭৭, ৩২১
সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ৬২, ৭৬, ৭৭, ২৬৩, ২৯৬, ২৯৯
সিডনি চ্যাপলিন (১৮৮৫-১৯৬৫) ১৮০
সিমোন দ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬) ১৩৫, ১৩৬, ২৪৬, ২৭৭, ২৭৮
সিলভিয়া প্লাথ (১৯৩২-১৯৬৩) **১৪০-১৪৩**
সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) ২৭, ১৫৪, ১৫৫, ৩৬৫
সুজান বেকেট (১৯০০-১৯৮৯) ২৫৪
সুদেষ্ণা চক্রবর্তী (১৯৪৯-) ৩৫৭
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) ১২৩, ৩৬২
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) ৮১, ১০৯
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) ৮২, ৮৪, ৩৫০
সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫?) ২৯৮-৩০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) ১১১, ১২৬
সুরজিৎ দাশগুপ্ত (১৯৩৪-) ৩৬৬
সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০) ২৮২
সের্গেই আইজেনস্টাইন (১৮৯৮-১৯৪৮) ১৫৮
সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) ৮০
সোফিয়া আন্দ্রেইভনা তলস্তয়া (১৮৪৪-১৯১৯) ২৮৪
সোফিয়া বের্তোলিনি (১৮৭৩-১৯৫১) ৩০২
সোরেন কির্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫) ২৩৬, ২৪[illegible]
[illegible]মিত্র [illegible] (১৯৩৫-) ১৫৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্টিফেন গসন (১৫৫৪-১৬২৪) ১৫১
স্টেফান ৎসোয়াইগ (১৮৮১-১৯৪২) ৬৫, ২৯৬
স্তাঁদাল (১৭৮৩-১৮৪২) ৬৩, ১৩৮, ২৪৭, ২৮৬
স্তেফান মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) **১৮-২৩**, ১১৬, ১১৯, ১৯৩, ৩১২, ৩৭৫, ৩৭৬
স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ২৯৭
স্যর ফিলিপ সিডনি (১৫৫৪-১৫৮৬) ৩১, ৩৩, **১৪৯-১৫৩**
'অ্যান আপোলজি ফর পোয়েট্রি' ৩১
'অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলা' ১৫০
'আর্কেডিয়া' ১৫১
'দ্য ডিফেন্স অফ পোয়েজ়ি'
স্যর লেসলি স্টিফেন (১৮৩২-১৯০৪) ৩৩৬
স্যাঁ-জন পের্স (১৮৮৭-১৯৭৫) ১২৪, ১২৫, ১৯৩, ২৭২, ৩০১
স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪) ৩০, **৩৫-৪০**, ৪৩, ৮৭, ৯০, ১১৯
'কুবলা খাঁ' ৩৫, ৩৭, ৩৮
'ক্রিস্টাবেল' ৩৭
'ফিয়ার্স ইন সলিচ্যুড' ৩৭
'ফ্রস্ট অ্যাট মিডনাইট' ৩৭
'রাইম অফ দ্য এন্সিয়েন্ট মেরিনার' ৩৭, ৩৯, ১১৯
স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯) ২, ৩১, ৬৮, ২৪৬, **২৫১-২৫৫**
'গোদোর জন্য প্রতীক্ষায়' ২৫৩
'ফিল্ম' ২৫৫
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯) ১১০
হরিহর দাস ১০০
হাওয়ার্ড হক্স (১৮৯৬-১৯৭৭) ১৫৮
হানা চ্যাপলিন (১৮৬৫-১৯২৮) ১৮০, ১৮১
হান্স্ য়াকব ক্রিস্টোফেল ফন গ্রিমেলসহাউসেন (১৬২১-১৬৭৬) ১০
হান্স হার্ডার (১৯০৩-১৯৮৭) ২৭
হিল্ডা ডু-লিট্ল্ (১৮৮৬-১৯৬১) ২৩৬
হুয়ান রামোন হিমেনেস (১৮৮১-১৯৫৮) ৩০১
হুলিও কোরতাসার (১৯১৪-১৯৮৪) ২৪৬
হেনরি কেরি (১৫২৬-১৫৯৬) ৩১
হেনরি জেম্স্ (১৮৪৩-১৯১৬) ১১৯, ২৪৮, ৩৩৪, ৩৩৭
হেনরি ফিল্ডিং (১৭০৭-১৭৫৪) ৩৩৩
'টম জোন্স্' ২৫৮, ৩৩৩
হেনরি মিলার (১৮৯১-১৯৮০) ১০৬
হেনরিয়েটা (হেটি) ফ্লোরেন্স কেলি (১৮৯৩-১৯১৮) ১৮২-১৮৫
হেনরি সিডনি (১৫২৯-১৫৮৬) ১৫০
হেরমান হেস্সে (১৮৭৭-১৯৬২) ৬২, ২৯৬
হেলেনা দিয়াকোনোভা (১৮৯৪-১৯৮২) ৩২১
হোমার ২৪, ২৫
হোরেস (৬৫ খ্রি.পূ.-৮ খ্রি.পূ.) ১৭, ১৮৯
হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক (১৭৯৫-১৮১৬) ৯১, ৯২
হ্যারিয়েট মন্রো (১৮৬০-১৯৩৬) ২৩৬, ২৩৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও